চক্রবৎ

চক্রবাল

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপায়ন ভাণ্ডার
৭ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :: ১৫ই আগষ্ট ১৯৫২

দাম চার টাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র

কলিকাতা ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র এম. এ. প্রকাশ
করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে ছেপেছেন

কালোমেয়েকে দিলুম

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন···এই বইখানা ১৩৫৭ সালে লিখেছিলুম।

স্বাধীনতা দিবস,
১৩৫৯

গ্রন্থকার

আশ্বিনে হায় যে শেফালি ঝরে প'ল,
ফাল্গুনে সে কি বকুল হইয়া ফোটে ?
কেতকীর যতো কথা নাহি বলা হ'ল,
আম্রমুকুলে তাই কি আকুলি ওঠে ?
ঘন-যামিনীতে নিশিগন্ধার বাণী
সোনা হয়ে ফোটে কনকচাঁপার ঠোঁটে ?

—এক—

সুশান্ত ও তার স্ত্রী সুলতা হাসি-কান্নার ব্যাপারে প্রায় সমান ওজনের। জীবনে কখনো কখনো ঝড়-ঝাপটার দিনে দাঁড়িপাল্লাটা ডাইনে-বাঁয়ে যে বেশী হেলে পড়েনি সে কথা বলা যায়না, কিন্তু তবু তার জন্যে কি তারা দায়ী? ভালো দাঁড়িপাল্লার হেলে পড়ার ব্যাপারটা তার নিজস্ব অপরাধ নয়, সব সময়েই সেটা বাটখারার দোষ।

তবু ইদানীং কেমন যেন একটু ব্যতিক্রম হয়েছে, সবটা এখন আর তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় না। কোথাও কোথাও যেন একটু কুয়াশা জমে ওঠে সকাল-সন্ধ্যেয়।

দু'জনের মধ্যে হাসির মনটা যেন ওলটপালট খেয়ে গেছে। এ যেন এদেশে সূর্য্য উঠলে আমেরিকায় রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মত। সুশান্তর হাসিটা বেশ বেড়ে গেছে, সুলতার গেছে খুব কমে। স্বামী হাসলে স্ত্রীর মুখ আরও যেন ভারী, অন্ধকার হয়ে আসে।

সুশান্তর প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে; অল্পদিনের মধ্যেই দেনার দায়ে স্ত্রীর গহনা, বাড়ী, গাড়ী সব বিক্রি হয়ে গেছে; এখন একটা ভাড়া বাড়ীতে দিন কাটে। তবু একখানা গাড়ী এতদিন ছিল, সেটাকেও আর রাখা গেল না, আজ দশদিন হ'ল সেখানাও বিক্রি হয়ে গেছে।

সবাই কিন্তু এখনও গাড়ী বিক্রির কথা জানতে পারেনি; দশদিন আগে সবাই দেখেছে সুশান্ত মোটর হাঁকিয়ে চলে। সুলতা পাড়ার সবাইকে ও নিকট-আত্মীয়দের বলেছে গাড়ী মেরামত হতে গেছে। প্রতি শনিবারে শনিপূজো করে সুলতা···রোজ সকাল-সন্ধ্যেয় ঠাকুরের কাছে মাথা খোঁড়ে···ঠাকুর আবার সব ফিরিয়ে দাও, এতগুলো লোক খাচ্ছে দাচ্ছে, আর তুমি এম্‌নি করে চোখ বুজে থাকবে?

পায়ে হেঁটে চলে সুশান্ত, না হাঁটলে ট্রামে বাসে পৌছোনো যায় না। পটলডাঙার কাছে বিপিন বাবুর সঙ্গে দেখা···এই যে পদব্রজে যে? গাড়ী কি হ'ল?

হেসে উত্তর দেয় সুশান্ত, গাড়ী পেছনে আসছে, শরীরটার জন্যে একটু হাঁটতে তো হবে, আজকাল এই সময়টাতে একটু হাঁটি···বেশ বেশ··· এগিয়ে চলেন বিপিন বাবু···কলেজ স্কোয়ারে ঢুকে সুশান্তর খুব হাসি পায়···যাক বাঁচা গেল, অন্ততঃ বিপিন বাবু এখনো জানতে পারেন নি। বিপিন বাবুর মনে আজও রয়ে গেল গাড়ীওয়ালা সুশান্তর জন্যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম।

মনে হ'ল খুব কিন্তু হাসির কথা···মিথ্যে বলে সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখা। মনে হ'ল এর চেয়ে সত্যি কথাটা যদি বিপিন বাবু জানতেন যে গাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে, তাহ'লে মহাভারতটা কি অশুদ্ধ হয়ে যেত? একটা বেঞ্চের ওপর বসে একলাই হাহা করে হেসে ফেললে সুশান্ত। এ যুক্তির উত্তরে কি বলতো সুলতা? শুধু মহাভারত? বলতো মহাভারতের দ্রৌপদী পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যেতো, বিপিন বাবু একথা জানলে। সুলতা বলতো দুঃখের কথা পরকে জানিয়ে লাভ কি? কেউ কি খাওয়াবে? যতদিন না জানতে পারবে লোকে, ততদিনই ভালো। মুখ কালো করে বুকের কাছে এগিয়ে এসে অনেক আশ্বাস দিতো সুলতা···কেন লোকে জানবে? এই দেখনা, কাঠ সাপ্লায়ের কাজটা হয়ে গেলে আর তো দশদিনের মধ্যেই ঝপ্ করে নতুন গাড়ী কিনে ফেলবে।···

পাশের বেঞ্চিতে এক ভদ্রলোকের কাছে একটা নুলো কাটা হাতটাকে নেড়ে নেড়ে ভিক্ষে করছে···কি মশাই, একটা পয়সাও দিতে পারেন না? তাকাচ্ছেন না যে এদিকে? আমার দিকে চাইলে বুঝি চোখে বজ্রাঘাত হবে? এমনি ধারা হাত কি হবে না আপনার? দেখবেন এমনিই হবে···ট্রামের তলায় পড়ে কচ্ করে একদিন কেটে গিয়ে ঠিক এমনই বেরুবে ছিরি।···

আবার হাহা করে হেসে ফেলে সুশান্ত। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্ম্মরমূর্ত্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নুলোর কথাটা আবার

মনে পড়ে যায়, আবার আসে উচ্ছ্বসিত অট্টহাসি•••মনে হয় মুলোর কথা শুনে পাথরের বিদ্যাসাগর মশাইও বুঝি হাহা করে হেসে উঠলেন।

বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলো, কেউ সুশান্তকে ছাড়তে চায়না—কেমন করে ছাড়বে? কোথায় যাবে ওরা? যা দিনকাল পড়েছে, কেমন করে হবে ওদের অন্ন-সংস্থান?

ছোট্ট বাড়ীতে ঠাসাঠাসি করে থাকা···সুলতার তাতে কষ্ট হয়। সে কথাটাকে প্রায়ই ঘুরিয়ে বলে···আর কিছুর জন্যে নয়···নির্জ্জনে যে দু'দণ্ড একটু সুখ-দুঃখের, একটু হিসেবপত্তরের কথা বলবো, তারও উপায় নেই। লোকজনের গোলমালের মধ্যেই আজকাল মাঝে মাঝে সুলতা হিসেবের খাতা হাতে করে সুশান্তর কাছে গিয়ে বসে।

চিরদিনের বেহিসেবী সুশান্ত সেদিন সন্ধ্যেবেলা হিসেব নিয়ে সুলতার কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিল—একটু হিসেবী হও বৌ, একটু হাত টেনে চলো। দেড়মণ ডাল? অতো ডাল খায় কে? মুখ কালো করে সুলতা বলে, তাহ'লে বোধ হয় আমিই খাই। বিধবা ভগ্নী প্রতিমা তাঁর পাঁচ-ছয়টি সন্তান নিয়ে থাকেন; তিনি কাছেই ছিলেন, একলাফে ঘরের মধ্যে এসে ফণা তুলে দাঁড়ান,—তুমি কেন খাবে বৌ, আমরা সব গলগ্রহগুলোই খেয়ে খেয়ে তোমার সব শেষ করে দিচ্ছি।···

আরও চার পাঁচজন নিকট আর দূর আত্মীয় দোরের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একজন জোর-করে-পিসতুতো ভাই, মামার বাড়ীর আদর-কাঁড়িয়ে, সেও হাত মুখ নাড়ে—আমরাও তো খাচ্ছি বৌদি··· তবে এমনি তো খাইনা···মামার বাড়ী বলে খাই। অধিকার আছে বলে খাই···তাছাড়া মুটের মত খেটে খাই; আমার মত অবস্থায় পড়লে তুমিও খেতে বৌদি, বুঝেছ?

সুশান্ত হাত নেড়ে চতুর্দিক সামলে নেয়, তা বেশতো-বেশতো··· তার জন্যে কি হয়েছে, দেড়মণ ডাল তো লাগবেই, ওটা আর এমন বেশী কি! সুলতা ফোঁস করে বলে ফেলে, এ মাস থেকে বিশ মণ ডাল আনিও···বলে হিসেবের খাতা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রতিমার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম নেপাল, সে সুমুখেই ছিল, প্রতিমা

কাঁদ কাঁদ সুরে বলেন, হ্যাপ্লা কালই সকালে গিয়ে কাশীর টিকিট কেটে আনবি···কালই আমরা সবাই কাশী চলে যাব।

বিনিয়ে বিনিয়ে প্রতিমা বলতে লাগলেন, মুখে একটু হাসি নেই? তবু একটু হাসি দেখলেও তো সাহস পাই আমরা? আজকাল একবার হাসি তো দূরের কথা, তাকায়ও না আমাদের দিকে? যেন আমাদের দিকে চাইলেই দু'চক্ষু অন্ধ হয়ে যাবে!···

সবাই রেগে গেছে সুলতার ওপরে, আজকাল সুলতা আর মোটেই হাসতে চায় না। শুধু হাসির জন্যে রাগ, অন্য কোন কারণে নয়। সুশান্ত ব্যাপারটাকে সামলে নেয়···না না তোমরা···মানে ওর শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে কিনা, অর্থাৎ পেটের অসুখে বেশী হাসি আসারতো কথা নয়।···

প্রতিমা চমকে ওঠেন—ও বাবা বেশী হাসি? বাজে বকিস নি খোকা···মুখ একেবারে অষ্টক্ষণ তোলো-হাঁড়ী হয়ে আছে···সুশান্তর হাসি আসে, সুলতা আর হাসতে পারে না। তাই সকলের সুলতার ওপরে রাগ।

তারপর সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে সুলতা যখন ঘরে এলো, দেখে ইজিচেয়ারটাতে হেলান দিয়ে সুশান্ত চোখ বুজে হাসছে।

আজ হঠাৎ সুলতাও হেসে ফেললে···চোখ বুজে হাসছ যে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

সুশান্ত একটু সোজা হয়ে বসে···আচ্ছা লতা, এখন যদি ভগবানের দেখা পাও তাহ'লে বুঝি গাড়ী চেয়ে নেবে? মুখখানা শক্ত করে সুলতা উত্তর দেয়, চাইবোই তো—গাড়ী, বাড়ী সব চেয়ে নেবো··· রোজই তো চাই···ঠাকুরকে রোজ ডাকি, সব ফিরিয়ে দাও, এতগুলো লোক খাচ্ছে দাচ্ছে, ঠাকুরের সেবা হচ্ছে···এ সব চাইবো না কেন? তারপর একেবারে কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে তার ওপরে বসে বলে, কেন এ সব ফিরে চাওয়া কি পাপ?

সুশান্ত ও-দিক দিয়েই হাঁটে না। বলে, আমার কাছে ভগবানকে পেলে আমি কি করি জানো?

সুলতার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে ওঠে···কি কর? সুশান্ত বলে,

ভগবানকে জড়িয়ে ধরে কাতুকুতু দিই,…এতো হাসাই যে কি বলব! পেটে খিল না ধরলে ছাড়ি না।…

তারপর একদণ্ড চুপ করে থেকে আবার বলে, ভাত কাপড় তো তুচ্ছ জিনিস লতা, হাসিটাই বড়ো; দেখছ না সমস্ত পৃথিবীতে আজ সব হাসি নিবে গেছে…হাসি নেই তাই ভাত কাপড়ও নেই, হাসি নেই তাই জগৎ জোড়া হাহাকার!…

তর্ক ঘনিয়ে আসে সুলতার চোখে…হাসি এলেই ভাত কাপড় আসবে কেমন করে? সুশান্ত বলে, আজকে আর তর্ক করবো না… আজকে ভগবানকে কাতুকুতু দেবার কথাতে খুব হাসতে ইচ্ছে করছে …আর একটা কথাও বলবো ভগবানকে, বলবো, ভগবান তুমি সুলতাকে জড়িয়ে ধরে খুব করে কাতুকুতু দিয়ে দাও।…

যা অসভ্য, সুলতা অনেক দিনের পরে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

সত্যি সমস্ত বাড়ীটা থম থম করে…সুলতা আর তেমন করে হাসতে পারে না…অমন করে কেন? কি হয়েছে সুলতার? মাঝে মাঝে একটুও কি হাসতে পারে না?

দুপুর বেলা হাসির মহড়া চলে তিন বছরের মেয়ে সুরমার সঙ্গে।

—ওমা ছুরমা—

—কি বাবা ছুছান্ত—

—একটু খুব ভাল করে, খুব, খুব মিষ্টি করে, সুন্দর করে একটু ছুদা-হাচি হাসোতো মা।…

ছুদা-হাচি? ছুদা-হাচি হাসবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সুরমা। গালটাকে কুঁচকে সবকটা দাঁত বার করে ফেলে… সুশান্তর বারবার পছন্দ হয় না।

—না, না এতো হলো না মা ছুরমা…এতো হাসছো না…এতো মুখ ভ্যাঙাচ্ছ…আবার মেয়ের ঠোঁট টিপে ধরে অনুরোধ করে…এইবার হাসতো মা ছুরমা আবার, একেবারে খুব মিষ্টি করে, খুব মিষ্টি, একেবারে গুড়ের মত মিষ্টি।…

ছুরমা আপত্তি তোলে: না অসগোল্লার মত।…

আচ্ছা বেশ তাই অসগোল্লার মত খুব মিষ্টি একটু হাসি হাসতো মা

ছুরমা। আবার হাসে ছুরমা, আবার সুশান্তর পছন্দ হয় না—না না, এতো ছুদা হাচি হ'ল না—এতো দাঁত খিঁচোচ্ছ…এতো মুখ ভ্যাঙাচ্ছ মা ছুরমা। দাঁত খিঁচোনো ও হাসির মধ্যে তফাৎটা বোঝে না সুরমা; রাগ করে দাপাদাপি করতে আরম্ভ করে দেয়, ঠিক যেন ঝোড়ো-হাওয়া সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছুরমার ছুদা-হাচি সে কি যে সে ? মার কাছে শিখেছে ছুদা-হাচি, মা বসিয়ে কতদিন ধরে শিখিয়েছে সেই ছুদা-হাচি… সেই ছুদা-হাচিকে অবহেলা ? ছুরমা রাগে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে,—আর্ আমি কখ্খনো ছুদা-হাচি-হাচবো না।…

সুশান্ত বলে, দেখবে আমি হাসবো ছুদা-হাচি ?…এই দেখ, বলে মুখখানাকে বিকৃত করে খানিকটা হাহা, খানিকটা হিহি করে জোরে হেসে ওঠে।

সত্যিকারের সুধা হাসি ফুটে ওঠে ছুরমার মুখে…যেন গিরি-গহ্বর থেকে ঝর্ণা বেরুচ্ছে নাচতে নাচতে।

স্বর্গে জয়মঙ্গলার আসন নড়ে ওঠে।—জয়া আমার আসন কেন টলে ? জয়া বলে, ওরা যে ছুদা-হাচি হাসছে, ছুরমা আর ছুছান্ত…

তবু সুলতার হাসি নিবে গেছে, সুলতা আর হাসতে পারে না…যে পরকে সুধা-হাসি শেখায় তার হাসি কেমন করে নেবে ? এ যেন দপ করে নিবে সব অন্ধকার হয়ে গেছে।

—দুই—

জৈব-জীবনের ব্যাপারটা ক্রমশঃ খুব খারাপ হয়ে আসছে…সেদিন টাকার অভাবে র‍্যাশন এলো না…বেলা এগারোটার সময় বাড়ীতে হুলুস্থুল…র‍্যাশন আসেনি, চাল বাড়ন্ত, লোকে খাবে কি ?

পূর্বদিকের শেষ ঘরটায় আত্মীয়দের সভা বসেছে…সবাই বক্তৃতা দিচ্ছে…এরকম করলে আমরা সহ্য করব না, এতটাকা সব খরচ করে ফেললে, কেন ? টাকা যেন খোলামকুচি ! তাছাড়া গিন্নীর হাতে কি

কিছু টাকা নেই ? সামান্য এই র‍্যাশনের পনেরোটা টাকা ? প্রতিমা ফিস ফিস করে বল্লেন, গিন্নীর বাক্সে অনেক টাকা।···

জোর-করে-পিসতুতো ভাই চীৎকার করে বল্লেন, মুটের মত খেটে খাই···সময়ে ভালো খাবার না হলে আমি সহ্য করব না।

দু'জন বাস্তহারা স্ত্রীলোক বাইরে সদর দরজার কাছে চীৎকার করছে : ভাত চাই না মা, শুধু একটু ফ্যান্ দে।···

কতদিনের লক্ষ্মীর কৌটো···শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, আর তাঁর শাশুড়ীর আমলের। ধানের সঙ্গে সিঁদুর মাখানো অনেকগুলো টাকা···সুলতা গহন রাত্রির মত অন্ধকার হয়ে মেঝের ওপর বসে আছে। সুশান্তর হাসি পায়···কতদিনকার এই টাকাগুলো·· অনেকগুলো ভিক্টোরিয়ার আমলের। ধানের ভেতর থেকে এক এক করে পনোরোটা টাকা গুণে গুণে বার করলে সুশান্ত···সুরমা মেঝের ওপর বসা মার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে···অমাবস্যা রাত্রির মত মার চেহারা অন্ধকার, সব হাসি যেন কোথায় পাতালে লুকিয়ে গেছে···মার মুখ কালো হলে সুরমা তার ওষুধ জানে ; কাছে বসে দু'একবার উস্‌খুস্ করে সুরমা, জিজ্ঞেস করে,—মা ছুদা-হাচি হাচবো ? অনেকদিন আগেকার অনেক সিঁদুর মাখা টাকাগুলো সুধা-হাসি হাসছে···সেগুলো নিয়ে সেদিন সুশান্ত অনেক বেলায় র‍্যাশন আনতে গেল নিজেই।

সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে···ছাতা মাথায়, থলি হাতে, র‍্যাশনের দোকানের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ চম্‌কে ওঠে সুশান্ত··· ছাতার মধ্যে একেবারে তার গায়ের ওপরে এসে পড়েছে একজন তরুণী—ঠোঁটে রঙ মাখা, হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ। এ আবার কোথা থেকে এসে পড়লো ! সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললে, রাগ করলেন ?

সুশান্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না রাগ করব কেন ?

তরুণী বল্লে, বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার অধিকার সকলেরই আছে।

ঢোক্ গিলে সুশান্ত বলে—নিশ্চয়ই···ছাতার তলায় কাদা-ভরা পেছল পথে চারটে পা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে, একজনের হাতে র‍্যাশন ব্যাগ, অন্যের হাতে ভ্যানিটী।···

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, কতদূর যাবেন ?

—র‍্যাশনের দোকানে।

তরুণী একবার যেন একটু দ্বিধা করে, পরে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কি ট্যারা চোখ?

—ট্যারা চোখ? প্রবল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সুশান্ত···তার চোখ তো ট্যারা নয়; তবে? তবে ও কথা কেন বলে এই মেয়েটা?···

তরুণী বলে, আমাকে একজন খুব ভালো জ্যোতিষী বলেছে, যার ট্যারা চোখ তার কাছে নাকি আমার ভাগ্যোদয় হবে···আপনার চোখে কি একটুও ট্যারা ভাব নেই?

সুশান্ত অস্থির হয়ে বলে, না, না একেবারেই নেই।

সুমুখের দোকানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তরুণী বলে, দেখছেন ঐটে খাবারের দোকান? জানেন তো কাল রাত্তির থেকে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি, আপনি তো সকালে একগাদা চা খাবার খেয়ে বেরিয়েছেন। চলুন, ঐখানে গিয়ে আমাকে কিছু খাওয়াবেন···

বড় খাবারের দোকান। ভেতরে পর্দা-দেওয়া ছোট ছোট ঘর। একটার মধ্যে গিয়ে মুখোমুখি বসে পড়ে দু'জনে।

সত্যি করেই ক্ষিদের অন্ত নেই, একেবারে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করেছে মেয়েটা; খেতে খেতে গল্প বলে: ঢাকা থেকে বুড়ো বাবা, মা আর ছোট দু'জন ভাইবোন নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি··· আমি সেখানে কলেজে এম, এ পড়তুম,···কই আমার নাম তো আপনি জিজ্ঞেস করলেন না?

সুশান্ত নির্বাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি আবার বলে, আমার নাম বেলা, বেলা মুখার্জ্জি। একজনের বাড়ীর আস্তাবলে, ছোট এক টুকরো জায়গায় দু'মাস ধরে বাস করি আমরা, খুব কাছে অন্য টুকরোটায় থাকে বাবুদের একটা ঘোড়া। আপনি কখনো ঘোড়ার সঙ্গে রাত্তির কাটিয়েছেন?—একটা রসগোল্লার আধখানা কামড়ে মেয়েটা একটা নিঃশ্বাস চাপে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে, বাবার এখন-তখন অবস্থা, মা আজ পঁচিশ দিন হলো মারা গেছেন ···তাঁর হাতে একটু সোনা ছিল, সেটুকু বেচে সেদিন তাঁর সৎকার করেছি, আর কিনেছি এই ভ্যানিটী ব্যাগটা আর একটা লিপ্ ষ্টিক্।···

এক কাপ গরম চা দিয়ে গেল দোকানের বয়টা। তাতে একটা চুমুক দিয়ে বেলা বল্লে, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, এ্যাতো ভালো ভালো খাবার খাওয়ালেন। কিন্তু এতো একদিনের খাওয়া, আর একজনের খাওয়া—বাবার জন্যে ওষুধ কেনা, পথ্যি যোগাড় করা, ছোট ভাই বোনদের খাবার ব্যবস্থা করা, এ সবগুলো তো বাকীই রয়ে গেল।··· তারপর অর্দ্ধনিঃশেষিত পেয়ালায় আর একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বেলা আবার বল্লে, চাকরী, ধার ও ভিক্ষে, এ তিনটের অনেক বিফল চেষ্টা করেছি আমি···এখন আপনি সুন্দর ভদ্রলোক আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

শঙ্কিত হয়ে সুশান্ত বলে, কি বলুন?

আমাকে রক্ষিতা করে রাখতে পারেন···বেশী নয়, মাসে একশো টাকা দিলেই কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারব।···

পকেটে সিঁদুর মাখা টাকাগুলো সুধা-হাসি হাসছে···সেগুলো সব বার করে ফেললে সুশান্ত, দোকানের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বাকীটা দিলে বেলার হাতে। বল্লে, অন্যরকমে আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবো, আপনি আমার সঙ্গে পরে দেখা করবেন, বলে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিলে। পরে বল্লে, ও পাপের পথে পা বাড়াবেন না এই আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি।···

পাপ? খিল খিল করে জোরে অজস্র হাসি হাসলে মেয়েটা···যে খেতে পায় না, বাপ মা ভাই বোনকে খাওয়াতে পারে না, পাপ-পুণ্যের বিচার সে কেন করতে যাবে? টাকাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে মেয়েটা আবার বল্লে, অতি-বড়ো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আমি···তবু আবার বলছি, যদি সত্যি উপকার করতে চান তাহ'লে আমাকে রক্ষিতা করে রাখুন—নয় ঐ রকম একটা ব্যবস্থা করে দিন। ও ছাড়া আর আমাদের মত অভাগাদের কোন উপায় নেই কলকাতায়। যার পেটে ভাত নেই তার আবার নীতিবোধের বালাই কেন? মেয়েটা আবার হি হি করে প্রচুর সুধা-হাসি হাসলে।

অকস্মাৎ রাগে সমস্ত শরীরটা জ্বালা করে ওঠে সুশান্তর,···ওর চেয়ে আত্মহত্যা করতে পারবেন না? বেলা চীৎকার করে ওঠে:

না, না, ও আমি অনেক ভেবেছি, ও আমি করতে পারবো না···আত্মহত্যা করবার জন্যে জন্মগ্রহণ করিনি ; আপনি খেতে না পেলে চুরি করবেন, না আত্মহত্যা করবেন ?—হঠাৎ যেন থিতিয়ে আসে সুশান্ত···বেশ, আত্মহত্যা করতে না পারেন, রক্ষিতা হবার ইচ্ছেটা অত পথে-ঘাটে বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করে বেড়াবেন না···ওতে সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

—সামাজিক স্বাস্থ্য ? আবার হি হি করে জোরে হেসে ওঠে মেয়েটা।···

বাড়ী ফিরে এসে আবার লক্ষ্মীর কৌটো হাতড়ালো সুশান্ত ; আবার খুঁজে পেলে সাতটা টাকা···সেদিন সাতটাকার বেশী র‍্যাশন আনানো গেলনা।

ঘরে ঘরে অন্ধকার যেন তাল পাকিয়ে উঠছে···সব দিকের সব হাসি যেন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একেবারে !···

সুশান্ত সেদিন কাকে যেন লুকিয়ে চিঠি লিখছে···এবার একবার আয়, এখন তোর আসার বিশেষ দরকার, আমাদের সব হারিয়ে গেছে ···সুলতা একমাসের মধ্যে বোধ হয় একবারও হাসেনি।···

যেন টেলিগ্রাম পেয়েছে এমনভাবে চিঠি পাবার পরদিনই ছুটফট করে এসে পড়ে মনো। মনো—অর্থাৎ মনোলতা, সুশান্তর মামাতো ভাইঝি।

কি রে, এত মোটা হয়ে গেছিস্ ?

মনো মুখ নীচু করে হাসে—হ্যাঁ, বড্ডো মোটা হয়ে গিয়েছি··· সত্যিই বড্ডো মোটা হয়ে গেছে···আগেকার দিনের সেই ছিপছিপে মনো যেন চর্বির তালের মধ্যে ডুবে গেছে একেবারে। ইস্, কি রূপ ছিল মনোর ! যেমন গায়ের রঙ ছিল, তেমনই ছিল মুখ চোখ গড়ন-পেটন···এখন শুধু রঙটাই আছে, বাকী সবটা যেন ঢেকে গেছে ফর্সা চর্বিতে।···

অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে···সুশান্ত তখন ম্যাট্রিক পাশ করে মামার বাড়ীতে, অর্থাৎ মনোদের বাড়ীতে আই. এ. পড়তে এসেছে। তখন মনোর বয়স বোধ হয় তেরো বছর···ক্ষীণ শশীকলার

মত তন্বঙ্গী রূপ, এত সুন্দর দেখতে যে কেউ চোখ ফেরাতে পারতো না।
কিশোর সুশান্ত কবিতা লিখতো, সব মুখস্থ করে ফেলতো মনো···
সুকাকাকে ও ভয়ানক ভালবাসতো। সুকাকা গান গাইতো, মনো ও
তারপরের বোন ঢুলি সব গান শিখে ফেলতো। মনো, ঢুলি···খুব ভাব
ছিল সুশান্তর ওদের দু'জনের সঙ্গে···

ঢুলির চোখ খারাপ হয়েছিল, জল পড়তো, পরে চশমা নিয়েছে ও।
তখন চোখ পিট পিট করতো ও গুন গুন করে গান গাইতো বলে
সুশান্ত তাকে "গুনু গুনু পিটু পিটু" বলে রাগাতো। ও কথা বললে
তখন ভীষণ চটে যেত ঢুলি।

অতীতটা যেন রূপ ধরে এসে চোখের সুমুখে দাঁড়ায়···কত বিপদ-
আপদ, কত ঝড়-ঝাপটা, কত হাসি গান, আনন্দ উৎসবের মধ্যে ওদের
সঙ্গে কেটেছিল সুশান্তর প্রথম যৌবনের দিনগুলো।···

তরুণ দিনের আনন্দোৎসবে ফুল যোগাত ওরা,—যোগাত ওদের
স্নেহ, ভালবাসা সেবা ; ওদের উচ্ছলতা, ওদের চোখে মুখে হাসি গানের
প্রাচুর্য্য। মনো, ঢুলি ও ওদের জ্যাঠতুতো বাপ-মা হারা বোন বড়ো
মনো···ওরাই ছিল তখন স্ফুটনোন্মুখী। নিখিলের সমস্ত হাসি, সমস্ত
গানের সঙ্গে ওদের ছিল তখন সুর-বাঁধা ··প্রিয়া হবার, মা হবার জন্যে
ওরা তখন অপর্ণার মত আসনে বসে তপস্যা করছে।

বড়ো মেনোর জীবনে দুঃখের কালো-রাত্রি শেষ হয়ে গেছে, সে নিয়ে
গেছে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় ; ঢুলি ভগবানের দয়ায় ভালই আছে,
সে এখন 'অফিসারিকা', অর্থাৎ মস্ত অফিসারের স্ত্রী···

মাঝে মাঝে বড়ো দুঃখের সঙ্গে সুশান্তর মনে পড়ে সেই সব হারিয়ে
যাওয়া দিনগুলোর কথা···যেন এক এক করে ছায়ার মত দূরে দূরে সব
সরে চলে গেছে, বড়ো মনো, মনো, ঢুলি আরও কত কে···যারা আছে,
তাদের কাছে আর কি আছে সুকাকার সেই পুরোনো জায়গাটা ?···

এখন যদি সুকাকা আবার গান গায়, কবিতা লেখে আর কি মনো-
ঢুলি মুখস্থ করবে সেই গান, সেই কবিতা ? আর কি সুকাকার সঙ্গে
তারা খেলবে তাদের পুতুল খেলা ?···কোথায় যেন কোন ঢেউয়ে
ঢেউয়ে হারিয়ে গেল সেই সুকাকা, সেই বড়ো মনো, মনো, ঢুলি।···

সুকাকা···মনো স্নান সেরে কাছে এসে বসে, দু'চোখে টইটুম্বুর জল। সুকাকা তুমি ভীষণ রোগা হয়ে গেছ, গলায় পুঁটুলি পাকিয়ে ওঠে, ঢোঁক গিলে বলে, কাকীমারও শরীর খুব খারাপ।···

সুশান্ত হেসে উত্তর দেয়, ও কিরে কাঁদছিস্? কান্নার জন্যেই কি ডেকেছি তোকে?···হাস্, সেই আগেকার মত খুব জোরে হাস্ দিকিনি মা···সব অমঙ্গল দূরে পালিয়ে যাবে।

গালের ওপরে বড়ো একটা জলের ফোঁটা চিক চিক করতে করতে নীচের দিকে এগিয়ে আসে—

—হাসতে যে পাচ্ছিনা···হাসব বলেই তো এসেছিলুম।···

সেই অনেক আগের দিনগুলো চোখের সুমুখে যেন নেচে নাচতে থাকে···মনোর হাসি সে ছিল এক অদ্ভুত ব্যাপার! একবার সুরু হ'ল তো থামবার নামটি নেই, পাড়ার আশপাশে সবাই জানতো মনো হাসছে, সবাই বলতো—এইরে এইবার পাগলী আরম্ভ করেছে···

—অসভ্য, বেয়াদপ, বাচাল,—বাড়ীর বর্ষীয়সীরা ধমকাতেন, মনোর মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলতেন,—বুঝবে মা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে. পরের বাড়ীতে ও হাসির কেউ দাম দেবে না···তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলতেন,—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওরকম হাসলেই, তারপর এসো গে যাও।

যখন ভয়ানক কিছু মুস্কিলের কথা বলতে চাইতেন মনোর মা তখন বলতেন, এসো গে যাও।

তবু হাসি থামতো না। অনেক 'এসো গে যাও' ঐ হাসির স্রোতে খড়কুটোর মত ভেসে চলে গেছে।

সে কি যে-সে হাসি?···মনে হ'ত যেন গঙ্গোত্রী থেকে অনর্গল স্রোত ঝরে পড়ছে। একদিনের কথা মনে পড়ে···এক জায়গায় কীর্ত্তন হচ্ছে ···গান সুন্দর জমে উঠেছে···যে যেখানে আছে সবাই ভাব-গভীর মধ্যে আত্মহারা।···

—কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছল পথে শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে শ্রীরাধা চলেছেন অভিসারে, বুকের কাছে প্রদীপকে আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন, মুখ-কমলে ফুটে উঠেছে নিদারুণ শঙ্কা ও উদ্বেগের ছবি। ঝর ঝর করে

জল পড়ছে, হুহু করে বইছে ঝড়ের মত বাতাস…গান খুব জমে উঠেছে।

> হবে কি হবে না দেখা
> কি আছে কপালে লেখা,
> মুখকমলেতে জাগে নিঠুর তৃষ্ণা রেখা ;
> আকাশে, নিবিল ত্রাসে, চাঁদের টীকা…

যিনি শ্রীখোল বাজাচ্ছিলেন, তিনি খোলটাকে কোলে নিয়ে একটা টুলের ওপরে বসেছিলেন, হঠাৎ কি হ'ল, খুব একটা উচ্ছ্বাসিত 'আড়ির মুখে তিনি খোল সুদ্ধু উলটে মাটিতে পড়ে গেলেন। রসভঙ্গ হ'ল বটে, কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ের মত জেগে উঠল মনোর হাসি। হা-হা-হা-হা, যত চাপে তত বেড়ে ওঠে। খোলওয়ালা কাঁচুমাচু মুখে টুলে উঠে বসলেন বটে, কিন্তু নতুন করে গান আরম্ভ করে কার সাধ্যি !…

—কি হচ্ছে কি ? সব বাড়াবাড়ি, শিগ্গীর চুপ কর—সকলে বকতে লাগলেন। মনোর মা এবারে আর 'এসো গে যাও' বললেন না। বড়ো মনোকে বল্লেন, ওর গলাটা টিপে দে তো ভালো করে।

যে হাসি সত্যি হাসি, যে হাসি ষোল আনা হাসি, সে কি গলা টেপবার ভয় করে ?

শেষ পর্য্যন্ত রাঙাকাকী আর ছোটকাকী ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন কলতলায়। মুখে চোখে জল দিয়ে তবে তখনকার মত একটু থামল হাসিটা…তারপর আসরে এসে বসতেই, সেই খোল-ওয়ালার দিকে চোখ পড়তেই, আবার 'এসো গে যাও'।

মনো চুনার থেকে এসেছে, চুনারে ওর শ্বশুরবাড়ী ; সেখানে দুর্গাপূজোয় থিয়েটার হবে, ক্লাব-ঘরে রিহার্সাল হচ্ছে…একদিন রিহার্সাল শুনতে গিয়েছিলুম।

খুব একটা হাসির সিনের মহড়া হচ্ছে…যিনি মোশান মাষ্টার তিনি চোখ বার করে আঙুল তুলে প্লেয়ারদের বলছেন, তোমাদের যে খুব ভালো হচ্ছে মনে কোরো না…অত অহঙ্কার ভাল নয়, বড় বৌদিকে হাসাতে হবে কিন্তু…তাঁকে হাসাতে পারবে তো ?

হাসির জন্যে ঢুনার শুদ্ধু লোক বড়ো বৌদিকে চেনে। ও বাপের-বাড়ীর যেমন বড়ো মেয়ে, শ্বশুরবাড়ীরও তেমনি বড়ো বৌ।

একবার বোধ হয় মাঘ মাসে থিয়েটার হচ্ছে সরস্বতী পূজোয়। কনকনে শীতের রাত্তির। বাঁধান ষ্টেজে শতরঞ্চির ওপর কোন কারণে বেশ খানিকটা জল পড়ে খানিকটা জায়গা ভিজে জব জব করছে। বোসেদের বাড়ীর তিনু মুসলমান সৈনিক সেজে বন্দুকের গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় ভিজে জায়গাটার ওপর মুখ দিয়ে ধপাশ করে পড়লো। তারপর—যাই যাই, আমার বিবিকে দেখো, ছেলেকে দেখো, বলে টেনে টেনে এমন বক্তৃতা করলে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে, আর এমন করে শেষটা হঠাৎ থেমে গেল যে সবাই নিশ্চয় করে জানলে, যে সে বেঁচে নেই, মরে ভূত হয়ে গেছে।

—এদিকে শীতের রাত্রে ভিজে জায়গাটা বেশ ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে। কি করবে তিনু? ও অবস্থায় মরার কথা ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়—তিনু হামাগুড়ি দিয়ে অনেকখানি দূরে অন্যদিকে সরে গেল।

অনেকক্ষণ আগের মরা মৃত সৈনিককে হামাগুড়ি দিতে যারা দেখলে তারা কিছু কিছু হাসলে বটে, কিন্তু চিকের আড়ালে বড়ো বৌদি জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে বসেছিলেন, হাসির ব্যাপারে তিনি সবাইকে গোহারান হারিয়ে দিলেন।

যারা থিয়েটার করছে, তারা সব সিদ্ধি খেয়ে বুঁদ···সবাই হাহা করে হাসছে, অথচ কেন হাসছে, কেউ জানে না।

প্রবল হাসির বন্যা ছুটলো, শ্রোতাদের দলতো হাসলোই, উপরন্তু যাঁরা মৃত-সৈনিকের সিনে চীৎকার করে বীররসের পাট কচ্ছিলেন, তাঁরাও হাহা করে হাসতে লাগলেন। মৃতসৈনিকও দাঁড়িয়ে উঠে হাসিতে যোগ দিলে। শেষ পর্য্যন্ত ড্রপসিন ফেলে দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ও মোশান মাষ্টারের মান রক্ষা করা হয়। ঐ তো মজা সখের দলের থিয়েটারের, আনন্দের অনেক উপরি পাওনা মেলে, অনেক হাসির ফাউ জোটে কপালে। আবার যখন ড্রপ উঠল, থিয়েটারের সেক্রেটারী প্লে বন্ধ হয়ে যাবার জন্যে আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিলেন, গলা ঝেড়ে বল্লেন, আপনারা তো জানেন এ্যামেচার থিয়েটারে এই রকমই হয়ে

থাকে, আর তাছাড়া যে প্রচুর আনন্দ আজ আমরা পেলুম এই হাসির তুফানে হাবুডুবু খেয়ে, তার জন্যে আপনাদের এবং থিয়েটারের পক্ষ থেকে আমাদের বড় বৌমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।...

তখন বড়ো বৌমাকে ধরে মেয়েরা বাইরে নিয়ে গেছেন জলের টবের কাছে...চোখে মুখে জল দেবে, তবে তো থামবে ঐ সৃষ্টিছাড়া হাসি ?

-তিন-

মনে। আসার পর সেদিন সুলতার সঙ্গে সুশান্তর আবার একবার তর্কাতর্কি হয়ে গেল...মধু, গোপাল, বিলু, কানাই, তারা সব খাচ্ছে, তা না হয় যতদিন ঠাকুর চালাচ্ছেন ততদিন দু'বেলা দু'মুঠো খাক্, কিন্তু এই অবস্থার ওপর ওদের ইস্কুল কলেজের মাইনে কোথা থেকে দেওয়া হবে ?...

মুখ নীচু করে সুশান্ত বলে, তাই তো !...

সুলতার আপাদমস্তক জ্বলে যায়,—তাই তো ? তাই তো কি ? স্পষ্ট করে ওদের বলে দিতে পার না, যে এতদিন আমি দিয়েছি, এখন আর আমি পাচ্ছি না ? স্পষ্ট করে কথা বলতে আর কবে শিখবে ?

তা একথা খুব সত্যি, স্পষ্ট করে, 'না' বলতে সুশান্ত কিছুতেই পারে না—দেনদারকেও না, পাওনাদারকেও না ; যে কেউ নয় তাকেও না। ও কথা উঠলে সুশান্ত প্রায় বলে, যতক্ষণ সম্ভব 'না' না বলাই ভালো... আমরা কতটুকু বুঝি ? আজ যেটা 'না' আছে, ঠাকুর চাইলে কাল সেটা 'হাঁ' হয়ে যেতে পারে,...সেদিনও সুলতাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই কথাটাই বল্লে।

সুলতা মানতে চায় না, তর্ক তুলে বসে...কিন্তু তোমাকে ভুল বুঝে, তোমার কাছে স্পষ্ট 'না', না শুনতে পেয়ে, যারা তোমার ওপর আশা করে বসে থাকে, তাদের যে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ হতে পারে।...

বড়ো স্নিগ্ধ একটু হাসি হাসে সুশান্ত। বলে, লতা, এমন অবস্থাতেও যারা আমার ওপর আশা করে বসে থাকে, পঞ্চাশ বার স্পষ্ট 'না', বলার

পরেও আজও যারা স্পষ্ট করে তা শুনতে পায়নি বলে ভান করে, তারা কি আমার আশা করে? তারা আশা করে ঠাকুরের। ঠাকুর আবার আমায় দেবেন সেই আশা করে তারা ··ঠাকুরের আশা করে যদি তাদের সর্ব্বনাশ হয় তাতে আমার কি কোন হাত আছে?

সুলতার চোখ মুখ ছল ছল করে, সে প্রতিবাদ না করে চুপ করে বসে থাকে ··স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সুশান্ত বলে যায়—কত তো টাকা এসেছিল আমাদের কাছে···কত খেয়েছি। কত দিয়েছি-থুয়েছি, কত সেবা করিয়েছেন ভগবান আমাদের হাত দিয়ে। কোনদিন তুমি কি কখনও কাউকে দিতে আমায় বারণ করেছ? আমি কি অমন করে পারি, যেমন করে তুমি পার দিতে? যেমন করে তুমি দিয়ে এসেছ সকলকে? লতা মুখ নীচু করে প্রতিবাদ করে। বলে, আমি তো আমার স্তুতিগান শুনতে আসিনি।···

সুশান্ত মাথা নাড়ে···না, না, স্তুতিগান নয়,···আমার সময় সময় বড়ো ভয় হয়, আমি বুঝি লতাকে ভুল বুঝছি···লতার ওপর বুঝি অবিচার করছি···কত কষ্ট দিচ্ছি বল দিকিন তোমাকে?···আর প্রাণ-ভরে কাউকে কিছু দিতে পার না, মা মা করে লোকে খালি হাতে শুক্‌নো মুখে ফিরে চলে যায়, মা মুখ কালো করে মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকে। সাধ করে কি সব হাসি লুকিয়ে গেছে? ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে লতা···বেশ তোমার যা খুসী তুমি তাই কর, আর আমি কখনো তোমায় কিছু বলব না। শুক্‌নো মুখ তুমিই বুঝি দেখতে পাও শুধু? আমি পাই না? তুমি কি মুখে ঘোমটা দিয়ে থাক?

রাগ করে উঠে যায় লতা···মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সুশান্ত এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে···প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, অফিসে যেতে হবে।

মনো পেছু ডাকে · সুকাকা,···চোখ ফুলে উঠেছে কেঁদে কেঁদে। কাকা-কাকীমার ঝগড়া সব শুনেছে মনো দরজার পাশ থেকে,··সুকাকা, তোমাদের এত টানাটানি, আমাকে আবার কেন নিয়ে এলে? আমি তার চেয়ে বৌবাজারে ছোট কাকীমার বাড়ী চলে যাই।

হাহা করে হেসে ফেলে সুশান্ত,—তোকে? তোকে তো চিঠি লিখে

আনিয়েছি মা, হাসবি বলে। তুই তো এসে পর্য্যন্ত কেবল কাঁদছিস্; একদিনও তো হাসলি না তেমন করে? মনোর পিঠটা ঠুকে দিয়ে সুশান্ত আবার বলে, আচ্ছা, আমি এখন অফিস চল্লুম···আজ সন্ধ্যে-বেলা কিন্তু শুনতে চাই সেই আগেকার মত হাসি। প্যান্ প্যান্ করে শুধু কাঁদলেই বুঝি ভালো হবে সুকাকার?

ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের প্রকাণ্ড অফিসটা সব ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে; নিজের জন্যে শুধু একখানা ঘর রেখেছে সুশান্ত। প্রায় দু'শো লোক যেখানে কাজ করতো, সেখানে আজ শুধু একজন কর্ম্মচারী, আর একজন চাপরাসী—বিমলবাবু ও রামপেয়ারে। চার মাসের মাইনে পায়নি, তবু আঁকড়ে ধরে আছে। স্পষ্ট করে বললেও এরা না বোঝার ভান করে। এরা ঠিক সুলতার মত···কেবল ঠাকুরের কথা বলে, কেবল আশ্বাস দেয়, কেবল বলে আবার সব ভাল হয়ে যাবে।

রামপেয়ারে অফিসেই থাকে, তিনদিন না খেলেও মুখ ফুটে বলতে চায় না···খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নেয় সুশান্ত। চেষ্টা-চরিত্র করে দু'চার টাকা যোগাড় করে দেয় তার ডাল-রুটির জন্যে।

সুশান্ত অফিসে ঢুকেই দেখে মালিকের অর্থাৎ সুশান্তর চেয়ারে বেলা একলা বসে আছে···বেলা মুখার্জ্জি, সেদিনের সেই লিপ্ ষ্টিক্ওয়ালা মেয়েটা, যে সেদিন জোর করে দোকানে ঢুকে খাবার খেয়েছিল। একলা বসে আছে বেলা, বিমল বাবুর সে দিন ছুটি।

—সময় মত অফিসে আসেন না কেন?

সুশান্ত হেসে ফেলে,—কেন চাকরী গেল নাকি?

—এত দেরি করলেন যে? গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন বুঝি?

সুমুখের চেয়ারে, যাতে বাইরের লোক এসে বসে, তাতে বসে পড়লো সুশান্ত। বল্লে, আশ্চর্য্য ধরেছেন···সত্যি ঝগড়াই করছিলুম এতক্ষণ।

—আমাকে বাড়ীর ঠিকানা দেননি কেন? ভুরু কোঁচকায় বেলা: রক্ষিতার সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হয়ে গেলে গৃহবিবাদের ভয়ে? সুশান্ত গভীর বিস্ময়ে চুপ করে থাকে।

বেলা বলে, আপনার আর্থিক অবস্থা এমন অচল হ'ল কেন? সুশান্ত নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বেলা বলে, আপনি তো অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন ব্ল্যাকমার্কেট করে?

সুশান্তর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে যায়: ব্ল্যাকমার্কেট করে?

রিভলভিং চেয়ারটার ওপরে বসে বেলা উত্তর-দক্ষিণে দোল খেতে থাকে।

—জানেন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের আমি ভয়ানক ঘৃণা করি? লোকে অনাহারে প্রাণ দেয়, ওদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়তে থাকে···আপনি কি জানেন, আপনাকে আমি সকলের চেয়ে বেশী ঘৃণা করি?

সুশান্ত বলে, না জানিনা।

—তবে কি জানেন? ভালোবাসি? যদি বলি ভালোবাসি, তাহ'লে সে কথা বিশ্বাস করবেন?

—না।

—কেন?

ভ্যানিটী ব্যাগে সাধারণতঃ ভ্যানিটীই থাকে, সেখানে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না।

খিল খিল করে হেসে ওঠে বেলা। বলে, বাঃ, আপনি তো বেশ কথা বলতে পারেন। খানিকটা খক্ খক্ করে কাশে, আবার বলে, আপনার আর্থিক অবস্থা বুঝি চরমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে জানলেন?

বেলা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। বলে, রোজ র‍্যাশনের টাকা জোটেনা বুঝি?

গভীর বিস্ময়ে সুশান্ত একেবারে নির্বাক হয়ে পড়ে।

বেলা মুখ টিপে হাসে। বলে, জানেন আমি জ্যোতিষ জানি? মুখ দেখে সকলের সব বলে দিতে পারি? আপনার ভবিষ্যৎ বলবো? আজ একঘণ্টার মধ্যে আপনি অনেক টাকা পাবেন···অনেক···দশ হাজার···পরের টাকা কিন্তু!···পরের টাকা আপনি ভালোবাসেন?

সুশান্ত উত্তর করে, না।

—পরস্ত্রী ?

—না।

ব্ল্যাকমার্কেটে পরের গলা টিপে যে টাকা রোজগার করেন, সেটা পরের টাকা নয় ? সুশান্ত ঝাঁঝিয়ে ওঠে : আমি কখনো ব্ল্যাকমার্কেট করিনি।

—বেলা সেদিন আপনার রক্ষিতা হবে বলেছিল বলে, তাকে খুব ভাল লাগেনি আপনার ?

—না তার ওপরে প্রচণ্ড ঘৃণা এসেছিল মনে।

—অথচ লক্ষ্মীর কৌটোর সিঁদুর-মাখা টাকা তাকে সব দিয়ে দিতে আপনার তো একটুও বাধেনি সেদিন ? একটা ছোট নিঃশ্বাস চাপে বেলা : ভেবেছিলুম আপনি ভদ্রলোক, এখন্ দেখছি ভুল করেছিলুম। লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা কেউ কি কখনো কাউকে দেয় ? লক্ষ্মী যে চির-দিনের মত ছেড়ে চলে যাবে • কেন দিলেন ঐ টাকা ? এই অলক্ষ্মী বেলাটা সব লক্ষ্মীশ্রী চুরি করে নিয়ে যাক্ তাই কি আপনার ইচ্ছে ছিল ? লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা দিয়ে দিলেন এত ভালোবাসা বেলার ওপর ? কেন অমন করে অপমান করলেন আপনি ?

ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে সব ক'টা টাকা বার করে ফেললে বেলা। হাত উপুড় করে সব টাকাগুলো রাখলে টেবিলের ওপর। বল্লে, ফিরিয়ে নিন আপনার টাকা।···

কিছুক্ষণ চুপ করে কাটে দু'জনের। বেলার মুখের দিকে চাইলে মনে হয়, সে যেন অনেক, অনেক দূরে কোথায় উড়ে চলে গেছে। কেমন যেন একটা ছায়া জেগে ওঠে ওর অধরোষ্ঠের ওপর।

আবার কথা বলে বেলা,···আমাদের লক্ষ্মীর কৌটো নিয়েছিলো ইয়াসিন···সে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো। দাঙ্গার সুযোগে আমাকে, আমার শরীরটাকে চেয়েছিল ; আমাকে পাবার চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে এসেছিল তার। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীর লক্ষ্মীর কৌটোতে অনেক ছিল সিঁদুর মাখা গিনি মোহর, অনেক গয়না ছিল সিন্দুকে ;

.অনেক হীরে-জহরত। ইয়াসিনকে সব দিয়েছিলুম লক্ষ্মীর কৌটো সমেত···রূপেয়া দিয়ে তার রূপের নেশা কাটিয়েছিলুম।···

আবার খানিকটা খক্ খক্ করে কাশি···আবার চলে অতীতদিনের গল্প : ইয়াসিন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল, আমায় অব্যাহতি দিয়েছিল সসম্ভ্রমে ; সবাইকে নিরাপদে পৌছে দিয়েছিল কলকাতার পথে···আবার খানিকটা চুপচাপ···মা খুব কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন বেলা, লক্ষ্মীর কৌটো গেল, চিরদিনের মত লক্ষ্মীশ্রী আমাদের ছেড়ে চলে গেল ; আর কখনও ফিরে আসবে না লক্ষ্মী···হোলোও ঠিক তাই, মরবার একটু আগেও সেই কথা বললেন। বাড়ী গিয়ে সেদিন আপনার সিঁদুর মাখা টাকা দেখে মার কান্না আবার শুনতে পেয়েছি।···

যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসে বেলা মুখার্জি। দোরের দিকে তাকিয়ে বলে, বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে···আপনার ঐ গুঁফো দরওয়ানটাকে সরিয়ে দিন।

—রামপেয়ারে।

রামপেয়ারে এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ফুলছিল, সুশান্তকে ইসারা করে বাইরে ডেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে, সাহেব ইয়ে আওরত আচ্ছা নেহী···অর্থাৎ এ স্ত্রীলোক ভালো নয়।

—কেন ?

—কিতনা মানা কিয়া ফির আপকা কুর্শীমেই যাকে বৈঠ গই। অর্থাৎ, কত বারণ করলুম, শেষে আপনার চেয়ারেই ও বসে পড়ল।

হেসে ফেলে সুশান্ত। রামপেয়ারে খুব রেগে গেছে বেলার ওপর। সাহেবের চেয়ারে অন্য কেউ এসে বসে এ ব্যাপারটা রামপেয়ারের পক্ষে হজম করা শক্ত। রামপেয়ারে ভাবলে, বেলাকে ওরকম ভাবে চেয়ারে বসতে দেবার জন্যে সুশান্ত বুঝি তার ওপরেই রেগে গেছে। হিন্দি করে যা বললে, তার মর্ম্মার্থ এইরূপ : স্ত্রীলোকের ব্যাপার কি করব ?···না হলে চুলের মুঠি ধরে ওপর থেকে নীচের তলায় নাবিয়ে দিতুম। ঘরে ফিরে সুশান্ত দেখে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে বেলা ; মনে হচ্ছে রামপেয়ারের কথা ও কিচ্ছু শুনতে পায়নি।

ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায় বলে তাড়াতাড়ি সুশান্ত রামপেয়ারেকে পাঠিয়ে দিলে বড় বাজারে একটা তাগাদায়।

বেলা ফিস ফিস করে কথা বলে,—আত্মহত্যা করবেন? আমার কাছে রিভলভার আছে।···

—আত্মহত্যা কেন করতে যাব?

বেলা হাসে···র‍্যাশনের টাকা জোটে না, স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াতে পারেন না, এখন তো হয় চুরি করবেন, নয় আত্মহত্যা করবেন।

সুশান্ত বলে, ও দুটোর মধ্যে কোনটাই করব না আমি।

—কেন?

সুশান্ত বলে, আমার ভগবানে বিশ্বাস আছে।

—ভগবান? ছি ছি করে হেসে উঠে চেয়ারটার ওপরে আবার দোল খায় বেলা। বলে, আপনি সেদিন আমায় বলেছিলেন আত্মহত্যা করতে···ওকথা ওরকম করে এতদিন কেউ বলেনি আমাকে··একটা চোঁক গেলে,···আপনার সুমুখে আত্মহত্যা করতে এসেছি, আমার সঙ্গে রিভলভার আছে···সুশান্তর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বেলা।

সুশান্ত হতভম্ব হয়ে যায়। বলে, এ আপনি কি বলছেন?

বেলা বলে, আমার কাছে ব্যাগ-ভর্ত্তি গয়না আছে, চুরি করে এনেছি··অনেক টাকার গয়না, অনায়াসে দশ হাজারে বেচা যাবে। ওগুলো যদি আপনার কাছে রেখে দেন তাহ'লে হয়তো আমি আত্মহত্যা করব না। তাছাড়া তিন হাজার টাকার নোটও আছে, সবগুলো আপনার কাছে রেখে দিন। আরও একহাজার টাকা আমি রেখেছি আমাদের খরচের জন্যে।···

—কেন চুরি করলেন? সুশান্তর গলা শুকিয়ে আসে।

—সে কথা পরে বলবো একদিন। যার চুরি করেছি সে অন্ততঃ ছ'মাস জানতে পারবে না চুরির কথা, তারপর জানলেও আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। যাদের বাড়ীর আস্তাবলে থাকি, তাদের বাড়ীর বুড়ী গিন্নির জিনিস, সে আমাকে খুব ভালবাসে।···

—কিন্তু এত গয়না টাকা দিয়ে আপনি কেমন করে আমায় বিশ্বাস করছেন?···তাছাড়া কোথায় রাখবো আমি এসব?

বেলা ও কথার উত্তর দিলেনা। ভ্যানিটী ব্যাগের ভেতর থেকে ন্যাকড়া জড়ানো গয়না ও নোটের তাড়া টেবিলের ওপরে সুশান্তর এ্যাটাচি কেসে ভরে দিলে। বল্লে, লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা দিয়ে যে আমাকে আত্মহত্যা করতে বলেছিল তার জন্যে রেখে যাচ্ছি আমার চিরদিনের প্রণাম···জানবেন, শুধু নিজের জন্যেই এ টাকা আনিনি···এ আপনার জন্যেও ; তাছাড়া, যারা আপনার আর আমার মত, তাদেরও সকলের জন্যে এ টাকা।···

পায়ের চাপ্পালটা একবার মেঝের ওপর ঠোকে বেলা। তারপর বলে, যাদের জন্যে আজকের এই সমাজ-ব্যবস্থা ; যাদের জন্যে আজকে আপনার এই অবস্থা, আমাদের এই অবস্থা, তাদের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে বেলা, আপনাকে নেতৃত্ব নিতে হবে। আত্মহত্যা করবার বা কুকুর শেয়ালের মত রাস্তায় পড়ে মরবার মেয়ে বেলা নয়। কিসের যেন তীব্র উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ায় মেয়েটা। বলে, আমি আপনার মত নই, আপনাকে অপমান করতে আসিনি···চুরির টাকা আপনাকে [illegible]তে বলছি না, আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি ঐ টাকা ; কিন্তু তবু আপনার দরকার হলে ও-থেকে খরচ করতে দ্বিধা করবেন না···আবার আসবে অনেক টাকা। মনে রাখবেন এ টাকা ঠাকুরের টাকা···যারা খেতে পায়না, যাদের সত্যিকারের দরকার, এ টাকা তাদের টাকা।···

তবু সুশান্ত দ্বিধা করে···কিন্তু আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না।···

বেলা উঠে দাঁড়ায়···যদি না বুঝে থাকি, পরে বুঝলেই চলবে। এখন আর আমার সময় নেই, চল্লুম, নমস্কার। দরকার হলেই আবার বেলা নিজে এসে দেখা করে যাবে।

—চার—

সিঁড়ির ওপরে বেলার চাপ্পলের শব্দ মিলিয়ে যেতেই অফিসের ঘরে একলা বসে সুশান্তর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মনে হ'ল দপ করে সব আলো বুঝি নিবে গেল, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবীটা একেবারে বুঝি অন্ধকার কালো হয়ে গেছে; কোথাও একটু খুব ক্ষীণ রশ্মি-রেখাও বুঝি দেখা যাচ্ছে না। দুপুরবেলার সেই ঘনান্ধকার পৃথিবীটাতে শুধু সুমুখে টেবিলের ওপরে ঐ চুরির টাকা-ভরা এ্যাটাচি কেসটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ঘরের চারটে কোণ থেকে কারা যেন শুধু চীৎকার করে বলতে লাগল বেলার সেই আশ্চর্য্য কথাগুলো: মনে রাখবেন এ টাকা ঠাকুরের টাকা, যারা খেতে পায়না, যাদের সত্যি-কারের দরকার এ টাকা তাদের টাকা!···

টেবিলের ওপর মার ফটোখানার দিকে চোখ পড়তেই হুহু করে জল ছুটে এলো সুশান্তর দু'চোখ ভরে···আড়াই বছরের পিতৃহীন সুশান্তকে কোলে করে গিরিনন্দিনী বাড়ী ছেড়ে কালীমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভিটের ওপরেই বাড়ী থেকে সামান্য একটু দূরে, সুশান্তর বাবার প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দির, আড়াই বচ্ছর বয়েস থেকে ঐখানেই বড়ো হয়ে উঠেছিল সে। দু'বেলা ধূপ ধুনো জ্বলতো, কাঁসর ঘণ্টা বাজতো, কতো সাধু সন্ন্যাসীরা আসতেন যেতেন। একাদশীর দিন বিকেলবেলা সারাদিনের নির্জ্জলা উপোস করা মা'র স্নিগ্ধ করুণ তপঃক্ষীণ মুখশ্রী আজকে হঠাৎ অনেকদিন পরে সুশান্তর চোখের সুমুখে জ্বল জ্বল করে উঠলো। সেই ছোটবেলা থেকে বিশ্বজননী ও মানব-জননীর পরিবেশের মধ্যে অনেক উচ্ছ্বাস নিয়ে রক্তপদ্মের মত তার মনটা একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো।—যো মাং পশ্যতি সর্বত্র···মা মানে করে বুঝিয়ে দিতেন, তিনি সব জায়গায় আছেন, সমস্তর মধ্যে তাঁকে, ও তাঁর মধ্যে সমস্তকে দেখো।

সুশান্ত ছবি আঁকে···আঁতুড় ঘরে প্রসব বেদনায় গিরিনন্দিনী

ছটফট করছেন···সমস্ত বাড়ীটাময় তাল তাল অন্ধকার, সকলের মুখে একটা চুপ চুপ ভাব। সুশান্ত জন্মাবার তিরিশ সেকেণ্ড আগে পাঁচ বছরের বোন দুর্গা কলেরায় মারা গেছে। সম্পন্নঘরে জন্মেছিল সুশান্ত, তবু সেদিন শঙ্খ বাজেনি আঁতুড়ঘরের সামনে, খোকা হয়েছে বলে আনন্দধ্বনি ওঠেনি বাড়ীতে···পাছে প্রসূতি শুনতে পান, সেই ভয়ে বাড়ীর অনেকেই মন্দিরের কাছে চাপা-কান্না কাঁদছিলেন। দুর্গার মৃতদেহ একটা ঘরে পড়ে রয়েছে, এমন সময় পৃথিবীতে এলো সুশান্ত। কালো মেয়ে বুঝি ঠিক তেমনি করেই হাসছিল তখন ?

তারপর অনেকবার মড়াকান্নার রোল জীবনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে···গড়তে গড়তে শেষ করে আনার মুখে অনেকবার গিয়েছে সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে। বারে বারে জেগেছে মাব সেই কথা : 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'···তিনি কখনো তোমার অদৃশ্য নন, তুমি কখনো তাঁর অদৃশ্য হোয়োনা।

এ ছাড়া আর একটা ছিল বাড়ীতে আনন্দঘন পরিবেশ···উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত রসগণ্ডী। দাদারা সঙ্গীতচর্চ্চা করতেন বাইরের ঘরে। বাড়ীতে ছাপাখানা ছিল, অনেক ছিল জমী-জমা ; তাই দিয়ে বেশ সুন্দর ভাবেই চলে যেত খাওয়াদাওয়া, ঠাকুরের, সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা। দাদাদের কাজ করতে হ'ত অল্প। সকাল-সন্ধ্যেয়, দুপুরবেলায় যখনই দক্ষিণদিকের ঘরটার কাছে গিয়েছে সুশান্ত, তখনই শুনেছে, সেতার, এস্রাজ বা কণ্ঠসঙ্গীতের বন্যা বইছে। স্থানীয় রাজাদের দরবারে যিনি আসতেন, যেখান থেকে যে গুণী, মেজদা ছোটদার ডাক পড়তো সঙ্গত করতে। মেজদার ছিল আশ্চর্য্য কণ্ঠ, অপূর্ব্ব গুণী ছিলেন ছোটদা। তিনি যে কোন ওস্তাদকে মুগ্ধ করতে পারতেন। রাজার দরবারের ফাঁকে সময় করে সব গুণীই সুশান্তদের বৈঠকখানায় হয় গান গেয়ে গেছেন, নয় বাজনা বাজিয়ে গেছেন।

কিশোর সুশান্ত কোন কোনদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনতো ছোটদা মন্দিরে বসে সুরবাহার বাজাচ্ছেন। মন্দিরে মাঝে মাঝে মা ডাকতেন ছোটদাকে বাজনা বাজাবার জন্যে···কালো মেয়েকে সুরবাহার শোনাবার জন্যে।

মন্দিরের একটা ঘরে শুতো সুশান্ত মার কাছে; ঘুম ভেঙে গিয়ে ছোটদার পাশে উঠে এসে বসতো গভীর রাত্তিরে। আদর করে সুশু বলে ডাকতেন ছোটদা। বাজনা বাজাতে বাজাতে বলতেন, সুশু ঠিক যেন কাঁদছে আজকের এই বেহাগটা, না ?

মনে হতো সত্যিই কাঁদছে সুরবাহারটা। মা চোখ বুঁজে শুনতেন, মাঝে মাঝে চোখ খুলে বলতেন, সত্যি ভারী সুন্দর বাজছে···খানিক পরে ছোটদা আবার বলতেন, শুনছো এবার আবদার করছে ?···

ফরসা মেয়ে, কালো মেয়ে ও বেহাগ, ভৈরবী, দরবারী কানাড়া ইত্যাদির মধ্যে ফুলের মত ফুটে উঠেছিল সুশান্তর মন।

বেহারের ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছিল ওদের সব বাড়ী ঘর মন্দির। সুশান্ত আবার নতুন করে তৈরী করেছে সেবার জন্যে বাড়ী ঘর, শ্বেতপাথরের কালীমন্দির। আগে ছিল পট, সুশান্ত শিলাময়ীকে প্রতিষ্ঠা করেছে। নাম দিয়েছে মায়ের নামে গিরিনন্দিনী কালী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মা বলেছিলেন আবার নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে।

আজকাল আর নিত্য সেবার টাকা নিয়ম মত পাঠানো যায় না—দু'তিন মাসের বাকী পড়ে গেছে। এই ব্যাপারে সুলতার বুকটা আরও শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মন্দিরের পূজোরী শিবরাম এখনো বন্ধ করেনি পূজো করা, তাতেই সুশান্তর প্রচুর আনন্দ···সুশান্ত যা পারে সেবার জন্যে যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। লতাকে বলে, মা বলতেন, তিনি সর্বভূতে আছেন, পূজো হওয়ার মধ্যেও তিনি, না হওয়ার মধ্যেও তিনি। লতা ভয়ে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে থাকে। সুশান্ত দিব্যি উড়িয়ে দেয় কথাটা ··পূজোর ভাবনা কালো মেয়েই ভাববে।

সুশান্ত সেদিন চোখ তুলে দেখে দেয়ালঘড়িটায় প্রায় একটা বাজে। চোখের সুমুখে হঠাৎ ভেসে ওঠে মন্দিরের গিরিনন্দিনী কালী···মনে হয় একটা বাজে, এতক্ষণ শিবরাম নিশ্চয়ই পূজো সেরে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ফিরে চলে গেছে নিজের বাড়ীতে। লোহার শিক দেওয়া দরজা, মন্দিরের ভেতরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।···

ভাবাবেশে সুশান্তর দু'চোখ বুজে আসে⋯লাল জবায় ভরে গেছে কালো মেয়ের ছোট্ট কালো বুকটা,—জবায় জবায় ভরে গেছে দুটো পা। একহাতে খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়। কেন জিব কেটেছে কালো মেয়ে? লজ্জা দিচ্ছে বুঝি? জিব কেটে আজকের এই কদর্য্য বীভৎস দুনিয়াটাকে লজ্জা দিচ্ছে বুঝি কালো মেয়ে?

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বাজে বাঁ-পাশের টিপয়টার ওপর।

—হ্যালো।⋯

সুলতা টেলিফোন করছে বাড়ী থেকে⋯শোনো ক'টা বাজে?

সুশান্ত বলে, একটা।

—আমাদের বুঝি খিদে পায়না?⋯খাবে এসো।⋯

সুশান্ত অপ্রতিভের মত বলে, এক্ষুনি যাচ্ছি⋯তার চেয়ে তোমরা খেয়ে নাও না!⋯

ওপার থেকে একটা বড়ো নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়⋯না তুমি এসো। কড়াং করে কি একটা আওয়াজ হয় টেলিফোনটার ভেতর। লতা বলে, আর শোনো, রামপেয়ারে কাঁদছে।⋯

আশ্চর্য্য হয়ে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে, কেন? কাঁদছে কেন?

—তুমি নাকি তার ওপরে খুব রাগ করেছ⋯তার দোষের কৈফিয়ৎ দেবার তাকে একটুও সময় দাওনি,—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায় বলে বিরক্ত হয়ে তাকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়েছ।⋯

সুশান্তর মনে পড়ে, বেলার সম্বন্ধে কটুক্তি করেছিল বলে তাকে সে সত্যিই তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিয়েছিল, কাজের অছিলায়। তাই রামপেয়ারে ভুল বুঝেছে, তাই ভেবেছে সাহেব রাগ করেছে। সুশান্তর খুব হাসি পায় মনে মনে।

সুলতা বলে, সে কাজের ইস্তফা দিচ্ছে। বলছে, তার জন্যে কে একজন নাকি ভ্রষ্টা আওরাত তোমার চেয়ারে বসে অফিসকে একেবারে অশুদ্ধ করে দিয়েছে। ও বলছে, ওর অপরাধ অমার্জ্জনীয়, তাই ইস্তফা দিচ্ছে

সুশান্ত চমকে ওঠে⋯ভ্রষ্টা আওরাত!

লতা বলে, হাঁ কে একজন নাকি শাড়ী-পরা মেমসাহেব, খুব ফরসা

দেখতে···রামপেয়ারে নাকি রীতিমত চেষ্টা করেছে তাকে রোকবার, তিনবার ইংরিজীতে ষ্টাপ্ বলেছে···তবু নাকি মেমসাহেব ওর কথা শোনেনি !···

একটা ঢোঁক গেলে লতা···ও বলছে, তোমাকে মুখ না দেখিয়েই এক্ষুনি দেশে চলে যাবে। তুমি শিগ্‌গীর এসো···ছেলেমানুষের মত অনেক ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদেছে, এখন গামছায় চোখ মুছ্ছে।···

রিসিভার রেখে দিতে যাবে সুশান্ত, আবার লতা কথা বলে, হ্যালো, শোনো আরও একটা জরুরী খবর আছে।···

—কি ?

—মনো হাসছে। এ ঘরে নেই, না হলে হাসি শুনতে পেতে টেলিফোনে।

—মনো হাসছে, খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সুশান্ত,—সত্যি ? সত্যি হাসছে মনো ? লতা বলে, কারণ শুনবে ?···প্রথম নম্বর রামপেয়ারের বড়ো গোঁফ বেয়ে জলের ফোঁটা পড়তে দেখে হাসি তাল পাকিয়ে উঠেছিল পেটে, তারপর অট্টহাসির খোরাক জুগিয়েছে তোমার গুণধর ভৃত্যদ্বয় নরেন ও রমণী।

খুব মজা লাগে সুশান্তর—কি রকম ?

—নরেন বাবুর তো কাল রাগ হয়েছিল, রাত্তিরে খাননি, সকালে আমি যখন পূজো করছি তখন এদিক-ওদিকে তাকিয়ে রুটী গিলেছেন অনেকগুলো, চা গিলেছেন দু'বাটি। তারপর মুখে রাগ নিয়েই ওঁদের ঘরে বসে ফাটা ঠোঁঠে ঘি লাগাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে ছোট থেকে বড়ো হাঁ করে দেখছিলেন, হাঁ করতে লাগছে কিনা। রমণী ঘরে ঝাঁট দিচ্ছিল।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, তারপর ?

লতা বলে, তারপর—খুব একটা বড়ো হাঁ-এর অবস্থায় রমণীর ঝাঁটার তাড়া খেয়ে একটা আরশুলা একেবারে নরেনের মুখের ভেতরে ঢুকে যায়। সেই সময়কার মুখের চেহারা মনো দেখতে পেয়েছিল জানলা থেকে।···

সুশান্ত হাহা করে হেসে ওঠে।

—মনোর প্রচণ্ড হাসির তোড়ে রামপেয়ারের ফোঁপানি কান্না বন্ধ হয়ে গেছে···তুমি শিগ্‌গীর এসো কিন্তু, আমি আর একলা সামলাতে পাচ্ছিনা।

—পাঁচ—

সেদিন সেই যে বেলা অফিসে এসেছিল তারপর প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেছে, আর তার কোন সন্ধান নেই। তার দেওয়া ঠাকুরের টাকা-ভরা এ্যাটাচি কেসটা লতা সিন্দুকে তুলে রেখেছে। বেলা কে, কেমন করে তার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল, তারপর কেমন করে সে অতগুলো টাকা গহনা দিয়ে গেল তার অফিসে এসে, সুলতাকে সব কথা বলেছে সুশান্ত। ভ্রষ্টা আওরাত কে নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে তাদের মধ্যে।

আজ ক'দিন হ'ল সুশান্ত আবিষ্কার করেছে কিসের যেন একটা প্রবল দাবী একটু একটু করে গড়ে উঠেছে তার মনে। বেলার ওপর কেমন যেন একটা আত্মীয়তার ভাব, কেমন যেন একটা নির্ভরতার সুর রঙ ধরে উঠছে মনের ভেতরটায়। আবার দেখা হবার একটা আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে যেন জোরে দোলা দিচ্ছে সুশান্তকে। বেলা চলে গেল অথচ সে তার কাছ থেকে তার ঠিকানাটা চেয়ে নিলো না, এ ব্যাপারটা বড়ো অদ্ভুত ঠেকছে—কেন এমন বোকার মত কাজ করলে সে? এত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ না দিয়ে গেল বেলা নিজে থেকে ঠিকানাটা, না সুশান্ত মনে করে চেয়ে নিলে সেটাকে।

মনে মনে বড়ো রাগ হয় সুশান্তর···কেন অমন করে চুরির জিনিস দিয়ে গেল তাকে? আর কি কাউকে খুঁজে পোলো না এই এতবড়ো কলকাতা শহরে? ঠাকুরের টাকা? ওঃ ভারী ঠাকুরের টাকা!···রাগে ঠোঁট কামড়ায় সুশান্ত, চুরির টাকা কখনো ঠাকুরের টাকা হয়? আর তাছাড়া ঐ টাকা বাড়ীতে রাখাটা তো ভালো কাজ হয়নি···ঐ নিয়ে বিপদ হতে পারে তো প্রকাণ্ড রকমের?

আগে আরও দু'একদিন বলেছে, সেদিন রাত্তিরে আবার সুশান্ত লতার কাছে কথাটা বলে ফেললে,—দেখো বেলার ঐ গয়না, টাকা আমার নেওয়াই উচিত হয়নি।...

লতা চেয়ারে বসে কি একটা পড়ছিলো, গম্ভীর হয়ে বলে, সত্যি উচিত হয়নি।

সুশান্তর যেন ভালো লাগে না কথাটা, বলে, উচিত হয়নি? তাহ'লে তুমি সে কথা বল্লে না কেন তখন? তাছাড়া নেওয়াটা যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে তাহ'লে তুমিই বা সাত তাড়াতাড়ি ও সব সিন্দুকে তুলতে গেলে কেন?

লতা মাটির দিকে চেয়ে বলে, কাল গঙ্গা নাইতে যাবো,...সবসুদ্ধু গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসবো ওগুলো।...

সুশান্ত চমকে ওঠে...ফেলে দিয়ে আসবে? তারপর বেলা যদি চাইতে আসে?

—বোলো নেওয়া উচিৎ হয়নি বলে সুলতা সব জলে ফেলে দিয়েছে।

রেগে ওঠে সুশান্ত...তোমার যত সব বাজে কথা, ঐ কথা বল্‌লেই হবে নাকি?

লতার মুখটা আবার শক্ত হয়ে আসে। বলে, তাহ'লে না হয় অন্য কথা বোলো...বোলো, ঐ সব সোনা, টাকা দিয়ে সুলতার গয়না গড়িয়ে দিয়েছি।

সুশান্ত বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসে.. সব সময় ইয়ারকী কর কেন বলতো?

লতা বলে, স্বামী-স্ত্রীর ইয়ারকি তো রাত্তির বেলাই জমে।

সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে সুশান্তর, মনে হয় হাত দিয়ে সুলতার মুখ চেপে ধরে। বলে, তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছো না লতা।...

লতা বলে ঠিক বুঝেছি।...

সুশান্ত ভেংচে ওঠে,—বুঝেছি, কি বুঝেছো?

লতা হেসে ফেলে। বলে দুটো কথা বুঝেছি। বুঝেছি যে, ভ্রষ্টা আওরাতের জন্যে তোমার মন কেমন করছে, আর বুঝেছি যে, সে দিনের পরে ভ্রষ্টা আওরাত আর একবারও আসেনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।...

দপ্ করে নিবে যায় সুশান্তর মুখটা। তবু ধাকাটাকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেমন্ করে বুঝলে?

সুলতার অতল-কালো চোখ দুটো বড়ো যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে। —কেমন করে বুঝলুম? জানো, একবছর আগে কবে তোমার ভালো করে খাওয়া হয়নি, সুলতা তোমার গায়ে হাত দিয়ে আজ সে কথা ঠিক বলে দিতে পারে?

সুশান্ত নির্বাক হয়ে থাকে। লতা বলে যায়…আজ এতদিনেও লতাকে জানলে না তুমি, জানলে ও-কথা কখনো জিজ্ঞেস করতে না, যে কেমন করে বুঝলুম।…

একেবারে কাছে এগিয়ে আসে লতা, সুশান্তর একটা হাত দু'হাতে তুলে নেয় কোলের ওপর, বলে, কেন মিছিমিছি ভুল করছ?

সুশান্ত বলে, কি ভুল করছি?

লতা বলে, মিছিমিছি ভুল করে তাকে ভয় করছ তুমি। কিসের ভয়? পুলিসের? পুলিস কখনো তোমাকে ধরবে না। বেলা বিপদে ফেলবে? কেমন যেন একটা আলো ফুটে ওঠে লতার মুখে,—কে তোমাকে বিপদে ফেলবে?—বেলা? বেলা কেন, কেউ, বিশেষ করে কোন অল্পবয়সের মেয়ে কখনো তোমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। না, না, লতা চোখ বুঁজে মাথা নাড়ে…না, না, কেউ তোমাকে কখনো বিপদে ফেলতে পারবে না।…

কাছে সরে এসে বুকের ওপর মাথা রাখে লতা। বলে কেন ভয় পাচ্ছ? কোন বিপদ, কোন ঝড় ঝাপটা কখনো ভেঙে ফেলতে পারবে না তোমাকে। লতার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এই নাকি তোমার ভয়? ও ভয় কোরো না। কেউ পারবে না, এই তোমাকে বলে দিলুম, তুমি দেখো। নিজের মনে হাসে সুলতা,—হুঁ আসুক না অমন দশহাজারটা ভ্রষ্টা আওরাত, দেখি কেমন করে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে?

আজ ক'দিন ধরে ভ্যানিটী ব্যাগ হাতে করে সুশান্তর সারা বাড়ীটাময় কেবল পায়চারী করে বেড়াচ্ছে ভ্রষ্টা আওরাত, চাপ্পালটাকে মশ্ মশ্ করে…লতা বুঝি শুনতে পেয়েছে তার জুতোর মশ্ মশানি?

সে রাত্তিরে অনেকদিন পরে আবার অনেক আদর সোহাগের কথা বলেছে ওরা। দুপুরবেলা জনবিরল কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিটার ওপর হেলান দিয়ে সুশান্ত আবার নতুন করে ভাবতে লাগল কথাগুলো।

বিয়ে হয়েছিল যখন তখন সুশান্ত এম. এ পড়ে, লতা তখন সবে আই. এ পাশ করে বেরিয়েছে। এই কলেজ স্কোয়ারে জম্‌তো বন্ধুদের নিয়ে রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত আড্ডা। কতদিন বাড়ী গিয়ে সুশান্ত সুলতাকে বলেছে, তোমার চেয়ে কলেজ স্কোয়ারকে আমি অনেক বেশী ভালোবাসি।

সত্যি সমস্ত মনটা যেন ছেয়ে ফেলেছিল এই স্কোয়ারটা, কলেজ জীবনের সেই দিনগুলোতে। সুশান্ত ভাবতে লাগলো কতবড়ো জায়গা এই বাগানটা ··এখান থেকেই পরে সম্ভব হয়েছিলেন গান্ধীজী, এখান থেকেই উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল আজকের ভারতের এই নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বপ্ন। এখানে বসে একদিন বাঙ্গালী স্বাধীনতার প্রথম ধ্যান করে। তারপরে একটু দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অগ্নিমন্ত্রে গ্রহণ করেছিল বাঙ্গালী তার আত্মাহুতির প্রথম শপথ। ঐ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের আশেপাশেই জেগে উঠেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আর সেই অগ্নিযুগের দুর্দ্ধর্ষ ঋত্বিকের দল।

সেদিন অফিস যাবার পথে কলেজ স্কোয়ারে ঢুকে পড়েছে সুশান্ত···হেলে পড়েছে বেঞ্চিটার ওপর। শেলীর কবিতা থেকে হঠাৎ উড়ে এলো noon tide bee, দুপুরবেলার মৌমাছি। উত্তরে সংস্কৃত কলেজের দিকটায়, গাছের ঘন ছায়ায় একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে সুশান্ত, ঘুমে যেন দু'চোখ ভরে এলো হঠাৎ। মনে হতে লাগল, কলেজ স্কোয়ারটা যেন দুপুরবেলার মৌমাছি হয়ে তার আশেপাশে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে।

কে বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়েছে···সুশান্ত খপ্ করে ধরে ফেলে হাতটা···ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বেঞ্চিটার ওপর।···

দশ এগারো বছরের ছেলে ; কালো রঙ তবে ভারী সুন্দর চেহারা।

মাথায় একরাশ কোকড়া চুল, মিশমিশে কালো। হাতটা ধরতেই ভ্যা করে কেঁদে ফেল্লে—বাবু আমি চুরি করিনি।...

সুশান্ত ধমক দিয়ে ওঠে...চুরি করনি ? এই তো পকেটে হাত দিয়েছো চুরি করবার জন্যে।...

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা উত্তর দেয়: না বাবু, মাইরী বলছি আপনাকে, আমি চুরি করিনি...মা, মা আমাকে চুরি করতে বল্লে।

মা চুরি করতে বল্লে ? খুব আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে সুশান্ত।

ছেলেটা একটা ঢোঁক গেলে—হাঁ বাবু, বাবা তো আজ সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে গেছে...সারা শরীরে অনেকদিন ধরেই পক্ষেঘাত ধরেছে, তার ওপর আজ ডাক্তার বাবু এসে বললেন, পক্ষেঘাত নাকি মাথায় চড়ে গেছে, আর সেই জন্তেই বাবা সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে গেছে একেবারে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোল খায় সুশান্ত · তারপর ?...

ছেলেটা বলে, সকালবেলা ন'টায় ডাক্তার এসে একটা ওষুধ লিখে দিয়ে গেছে বাবু, ইন্‌জেকসন্ দিতে হবে, পাঁচ টাকা দাম...আমাদের বস্তীর রাধু মাসী আর মণি দিদির কাছ থেকে অনেক কেঁদে-কেটে মা তিনটে টাকা যোগাড় করে এনেছে, কিন্তু আর দু'টাকা তো নেই... মা বাবার কাছে বসে বসে অনেক কাঁদলে, আমাদের ঘরে কালীঘাটের কালীমার ছবি আছে সেখানার কাছে কত মাথা খুঁড়লে, তারপর বাবু সত্যি বলছি, আমাকে বল্লে, মধু এই নিয়ে যা ডাক্তারের লেখা কাগজ আর এই তিনটে টাকা। চলে যা ঐ বাগানের মধ্যে, অনেক লোক আছে ওখানে। কারুর পকেট থেকে চুরি করে নিস দুটো টাকা, নিয়ে ওষুধ কিনে আনিস।...

চোখ মুছে ছেলেটা আবার বল্লে, বাবু মাইরী বলছি মা আমাকে বল্লে, যা মধু যা দুটো টাকা চুরি করে নিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে আয়। ভগবানের নাম করে চুরি করিস্, আমি তোর মা, আমি বলছি কক্ষনো তোর কোন বিপদ হবে না, এই কথা বলতে বলতে মা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

ট্যাঁক থেকে বার করে প্রেসকিপসনটা আর তিনটে টাকা দেখায়

মধু···সত্যি বল্লে বাবু কি বিশ্বাস করবে? তবু বড়ো আশা নিয়ে আবার মধু বলে, বাবু মা কালীর দিব্যি বলছি কখনো চুরি করিনি আমি···আমি যে ভদ্দরলোকের ছেলে।···

শেলীর কবিতা থেকে আবার উড়ে এলো সেই দুপুরবেলার মৌমাছিটা, সুশান্তর হাসি আসে···এই এসেছে এই মৌমাছি, এই ভদ্দরলোকের ছেলে মধু, বাবার মাথায় পক্ষাঘাত চড়ে গেছে, এই এসেছে ও ওষুধের টাকা চুরি করতে।··

এই এসেছে শেলীর মৌমাছিটা গুঞ্জন করতে করতে···মধু ভগবানের নাম করে চুরি করিস···আমি বলছি কখনো তোর কোন বিপদ হবে না।

ফুলে ফুলে মধু খাওয়া এই ভাববিলাসী মৌমাছিটা আজ অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করছে : কবি কি শুধু ভাববিলাসী? কবি অগ্নিহোত্রীও বটে।

উঠে দাঁড়ায় সুশান্ত, কোথায় তোমাদের বস্তী? আশ্বস্ত হয়ে মধু দক্ষিণ দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ যে খুব কাছে···বাগানটা পেরিয়েই আমাদের বস্তী, ঐ যে গলিটা দেখা যাচ্ছে··যাবেন আপনি আমাদের বাড়ীতে? চলুন না বাবু মাকে জিজ্ঞেস করবেন—ভগবানের দিব্যি বলছি আমি চুরি করিনি—মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে সুশান্তর পা দুটো জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে ওঠে মধু।

পকেটে কিছু টাকা ছিল সেদিন, সুশান্ত বলে, না চলো আগে ওষুধ কিনে আনি।

পাশের দোকান থেকে ইন্‌জেকস্‌নটা কিনে সুশান্ত মধুর পেছুন পেছুন তাদের বস্তীর দিকে এগিয়ে চলেছে···মনে মনে বহুবার মাথা ঠেকিয়েছে এই ভদ্দরলোকের ছেলে চোর সাথীটার দুটো পায়; বার বার মনে মনে বলেছে, আমার বিশ্বাস ছিল আমি বুঝি আমার মাকে ভালোবাসি, ভক্তি করি···আজকের এই ছেলেটা আমার সব দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে গেল। তার মা যদি অমন করে বলতেন, সে কি পারতো মধুর মত চুরি করতে?

আরও একটা লোভ ছিল মনে মনে···নেপোলিয়নের মাকে দেখতে পাওয়া যাবে। কর্ত্তব্যের জন্যে নিশ্চিত সর্ব্বনাশের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়ে

দিয়েছেন ছেলেকে, এতটুকু দ্বিধা করেন নি এক মুহূর্তের জন্যে···যে চুরি করলে কালো মেয়ের মুখ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এ সেই চুরি। সুশান্তর হাসি আসে, তাকে যেন চতুর্দ্দিক থেকে চোরেরাই ঘিরে ধরছে আজকাল। বেলা চুরি করেছিল, আজ আবার মধু চুরি করেছে।···

মধুদের ঘরের সুমুখে লোকে লোকারণ্য। মড়াকান্নার রোল উঠেছে। ঘরের ভেতর থেকে মধুর মা চীৎকার করে বুকফাটা কান্না কাঁদছেন : ওরে আমার সর্ব্বনেশে ক্ষিদে, আমিই তোকে খেয়েছি মা ; পোড়া পেটের জ্বালায় তোকে বেহুঁস জ্বরে পাঠিয়েছিলুম মা !···

মধু ভিড ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। সুশান্ত কান্নার মর্ম্মার্থ না বুঝতে পেরে একজনকে জিজ্ঞেস করে, মধুর বাবা মারা গেছেন বুঝি ?

—না না সে তো এখনও বেহুঁস হয়েই পড়ে আছে, মারা গেছে মধুর দেড় বছরের বোন সেবা।

মধু বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি—হাউ হাউ করে কাঁদছে। বাবু আমার বোন সেবা মরে গেছে···আসুন না, দেখবেন আসুন। ঘরের ভেতর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল মধু।

খোলার চালের ছোট্ট মেটো-ঘর। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছেঁড়া শতরঞ্জির ওপর একটা খুব ছেঁড়া তুলো বার করা লেপ গায়ে দিয়ে যিনি অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন···তিনি মধুর বাবা।

তাঁর আগেই সেবা টিকিট পেয়ে গেছে।

সুমুখে মেঝের ওপর একজন পনেরো-যোল বছরের ছেলে, মেয়েদের মত করে লাল শাড়ী পরে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছে···কানে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে শীত করছিল বোধ হয়, তাই মেয়েদের মত মাথার ওপরে কাপড়টা তখনও তুলে দেওয়া।

তার সুমুখে মরা সেবাকে কোলে করে মা কাঁদছেন বুকফাটা কান্না।

বীরজননী, নেপোলিয়নের মা।

গল্পটা একটু পরেই শুনতে পেলে সুশান্ত। ঐ যে কেষ্ট, মেয়েমানুষ সেজে বসে আছে, ও রোজ এগারোটার সময় সেবাকে নিয়ে যেত হ্যারিসন রোডের মোড়ে। সেখানে ঘোমটা দিয়ে বসতো, সেবাকে

দেখিয়ে ভিক্ষে করত লোকের কাছে। দু'চার আনা যা পাওয়া যেত, কেষ্ট আর সেবার মধ্যে হ'ত আধাআধি ভাগ।

এমনি করে কিছু কিছু পয়সা দিয়ে সেবা চালিয়েছে ওদের সংসারের খানিকটা খরচ। বাবা কম্পোজিটারী করতেন, তিনি তো আজ প্রায় দু'মাস পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়ে।

দু'দিন থেকে খুব জ্বর হয়েছিল সেবার। সকালবেলা কেঁদে কেঁদে কেমন যেন নিঃঝুমের মত হয়ে গিয়েছিল। একটা পুরোনো ছেঁড়া শাল ছিল বাড়ীতে, সেটা গয়লাকে দিয়ে আজ দু'দিন ধরে দুধ কেনা হচ্ছিল তার জন্যে।

সকালবেলায় দুধ খেয়ে একটু যেন চনমনে হয়ে উঠেছিল মেয়েটা। তারপর এগারোটার সময় কেষ্টর কোলে চড়ে অন্যদিনের মত সে অফিস করতে গেছে···পয়সা রোজগার করবার জন্যে। কেষ্ট বল্লে, একেবারে নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল সব সময়, একটুও কাঁদেনি। ভাবলুম জ্বর বেড়েছে, তাই নিঃঝুম হয়ে আছে। একবার নাকি মাকে ডেকেছিল, একবার বলেছিল তাতা, অর্থাৎ দাদাকে,—মধুকে ডেকেছিল। তারপর আমি তো বুঝতে পারিনি, খানিক পরে দেখি ঠোঁট দুটো একেবারে নীল হয়ে গেছে···ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে কেষ্ট।···

কান্না ফেনিয়ে উঠছে ঘরে—ওরে আমি রাক্ষুসী, তোর রোজগার খেতে গিয়ে তোকেই খেয়ে ফেল্লুম মা।···

পকেটে ছিল পঞ্চাশটা টাকা···সেই টাকা মধুর হাতে দিয়ে বেরিয়ে এলো সুশান্ত। মধুকে বলে এলো, আবার আসবে।

—ছয়—

সেদিন অপরাহ্ণ বেলা পাথরের মত ভারী মনটা মাথায় করে সেবাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো সুশান্ত। পথে এসে এমন জাগলো মনে বিরক্তি, এমন করে চেপে ধরল তীব্র অবসাদ সমস্ত শরীরটাকে, মনে হ'ল আর বুঝি সে চলতে পারছে না। সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিল একটা রিক্সা, তাতে চড়ে বসলো সুশান্ত।

শীতের দিন, তাড়াতাড়ি বেলা পড়ে আসছে। খুব কন কনে শীত পড়েছে, মাঝে মাঝে বেশ চলেছে ঠাণ্ডা বাতাস। দুটো গরম জামার ওপরে র‍্যাপার জড়িয়েছে সুশান্ত, তবু যেন শীত করছে।

তাইতো কোথায় এগিয়ে চলেছে দুনিয়াটা···বেলা, মধুর দলই যেন বেড়ে চলেছে চতুর্দ্দিকে···এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য কেন এরা সহ্য করবে? না না করবে না, করবে না,—সুশান্ত ঠিক জানে কখনো ওরা মুখ বুজে সহ্য করবে না আর।···

ঐ যে রিক্সাওয়ালাটা, এত শীতে ঐ যে সুতি-কামিজটা পরে রয়েছে ও, ঐ কামিজের পিঠটা নেই বললেই হয়। কেন হবে এমন ধারা? কেন ও সুশান্তর মত দুটো গরম জামা পরবে না?

মানুষে জ্যান্ত মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে···এ বড়ো কদর্য্য ব্যাপার। অন্য কোন রকমে হয় নাকি ঐ রিক্সাওয়ালার অন্ন-সংস্থান? সুশান্ত ভাবলে, যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ রিক্সা চড়াই ভালো; এরা তবু দু'মুঠো খেতে পাবে দু'বেলা।

কে দেখাবে পথ? কে করবে উপায়? কে মুছে দেবে মানুষের জীবন থেকে এ জৈব-জীবনের নিদারুণ জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ-আর্ত্তনাদ! কালো মেয়ে?. সুশান্ত হাসে, কালো মেয়ের ইচ্ছে হলেই সব হবে।

থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় মনোর হাসিতে···মারামারি বন্ধ হতে পারেনা? কোরিয়ার আটত্রিশ অক্ষরেখায় একদিন জেগে উঠবে মনোর হাসি···তারপর দুনিয়ায় আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না।

রাস্তার উল্টো দিক থেকে অনেকগুলো লোক চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে···সুশান্ত নেবে পড়লো রিক্সা থেকে। যারা দৌড়ে এলো, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি ?

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে, গাধা ছুটছে।

গাধা ছুটছে ? খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল সুশান্ত। গাধা তো ছোটেনা, গাধা তো চিরদিন আস্তে আস্তে চলে। রেসের ঘোড়া জিততে না পারলে লোকে বলে গাধার বাচ্চা। এ আবার কোন অনাবিষ্কৃত, স্বতোচ্ছ্বাসিত, অতিপ্রগত গাধা ?

ব্যাপারটা এই : একটা কেরোসিনের ক্যানাস্তারাকে ফুটো করে, তার ভেতর দিয়ে পরানো হয়েছে দড়ি, একটা গাধার পুচ্ছকে বিনুনি করে পাকিয়ে তার সঙ্গে ক্যানাস্তারার দড়িটা বেধে দেওয়া হয়েছে···একটা লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে গাধাটাকে, এবং তারপরে আর তার গতিবেগ কিছুতেই থামছে না। সুশান্তর সুমুখ দিয়ে গাধাটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। পেছুন পেছুন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে একদল ছেলে। ক্যানাস্তারাটা প্রচণ্ড ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করছে···গাধার গায়ে আঁটা কাগজে লাল রঙয়ের বড় বড় হরফে লেখা : ট্রুম্যান, এ্যাটলি, ষ্ট্যালিন।

মনে মনে বিশ্লেষণ করলে সুশান্ত : পুচ্ছের অত সন্নিকটে ক্যানাস্তারার শব্দের মত শব্দ হবার অভিজ্ঞতা ইতঃপূর্ব্বে কখনো অর্জ্জন করেনি গাধাটা। ঐ শব্দে অতি বড়ো বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে ও বেচারী। শব্দ হচ্ছে বলে দৌড়চ্ছে, এবং যত দৌড়চ্ছে তত যাচ্ছে শব্দটা বেড়ে। থামতে হবে, এবং না থামলে শব্দ থামবে না, গাধার মস্তিস্ক এ সত্যটাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছে না।

যে যেখানে আছে সবাই হাসছে অট্টহাসি···সুশান্তও বাদ পড়লো না। সুশান্তর মনে হ'ল, একথা খুব সত্যি যে ট্রুম্যান, এ্যাট্লি, ষ্ট্যালিন পৃথিবীময় ঐ রকম উর্দ্ধশাসেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে আজকাল, পেছুনে শব্দ হচ্ছে বলে। প্রত্যেকের মনের তীব্র শঙ্কা-চেতনা এনে দিয়েছে প্রবল মস্তিস্ক-বিকৃতি। দৌড়লে যে চলবে না, থামতে হ'বে, তবে থামবে শব্দ, তবে মিটবে ভয়, একথা তাদের মাথাতেও ঢুকছে না।

কোরিয়া তো কোরিয়াবাসীদের নয়, কোরিয়া হ'ল ঐ পেছুনে ক্যানাস্তারা বাঁধা এয়ী—ট্রুম্যান, এ্যাটলি, ও ষ্ট্যালিনের।

পেছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখলে,...এই যে সুশান্ত যে। সুশান্ত ফিরে দেখে খৃষ্টপূর্ব্ব রমেশ ঘোষাল। রমেশ ঘোষাল এম. এ, বি. এল। আগে ওকালতি করতেন হাইকোর্টে। বড জমিদারী ছিল, অনেক ছিল বাড়ী ঘর সম্পত্তি...সব উড়ে গেছে স্বদেশী করে আর আজীবন ভালোবেসে।

রমেশ ঘোষাল ভালবাসার বিশেষজ্ঞ—ঐ নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন বহুদিন থেকে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চাশ শতাব্দী থেকে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার ক্রমবিবর্ত্তনের. রূপকে উপলব্ধি করেছেন, সেই জন্যে সুশান্তর বন্ধুর দল তাঁকে খৃষ্টপূর্ব্ব বলে ডাকে।

—দীর্ঘ ঋজু দেহ, বয়েস ষাটের কোঠার দ্বিতীয় ধাপে, চেহারা দেখলে আজও মনে হয় বয়েসকালে একখানা দেখবার মত চেহারা ছিল খৃষ্টপূর্ব্বর।

গাধাটা প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল হে...ও দেখছি সগোত্রকে ঠিক চিনতে পারে...হেসে বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। ডান হাতে একতাল গোবর। সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে...গোবর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুঝি রমেশ ঘোষাল মহেঞ্জদাড়ো চলে গেলেন। চোখ টেনে বোধ হয় কোন অদৃশ্য খৃষ্টপূর্ব্ব তরুণীকে ইসারা করলেন। তারপর চমকে উঠে ফিরে এলেন সুশান্তর কাছে। বললেন, গোবর?...আচ্ছা গরুর গোবর ও ষাঁড়ের গোবরে কোন তফাৎ আছে কি? সুশান্ত বললে, নিশ্চয়ই আছে, একটা হ'ল গরুর গোবর, অন্যটা হ'ল ষাঁড়ের। আবার চমকে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব...কলম্বাস যেন এ্যামেরিকা আবিষ্কার করে ফেললে...তাই নাকি? তারপর হা হা করে হেসে ফেললেন খৃষ্টপূর্ব্ব,—তাইতো এদিকটা তো আমার মনে ছিল না, কিন্তু সে যাই হোক এটা গোবর তো?

সুশান্ত হাসে, হ্যাঁ গোবর তো নিশ্চয়ই, তবে ওর মধ্যে ঐ গরু ও ষাঁড়ের ঝগড়াটা রয়ে গেল।...

কিন্তু পূজোআচ্ছার ব্যাপারে গরুর গোবর ও ষাঁড়ের গোবর কি এক নয়? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন রমেশ ঘোষাল।

সুশান্ত কথাটাকে অন্যদিকে ধাক্কা দেয়···কিসের পূজো হবে ঐ গোবরে?

খৃষ্টপূর্ব্ব উত্তর করেন, লীলার ভায়ের যে কাল পৈতে।

—লীলা কে?

খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে বলেন, বিধবা লীলাকে ভালবেসেছি। প্রফেসারী করে। আমার বয়স দেখছ তো? লীলার ভালবাসাই বোধ হয় আমার জীবনে শেষ ফুল ফোটা।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, লীলা আপনাকে ভালবাসে?

আবার চোখ দুটো টেনে ঘাড়টা একটু নেড়ে বোধকরি প্রাচীন মিশরের কোন সুন্দরীকে ইঙ্গিত করলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। তারপর হেসে বললেন, না না, লীলা ভালবাসেনা। ওদের কি জানো? ওদের মাংসর ভালবাসা ···ওরা কি আসল ভালবাসা জানে না বোঝে? মাংস তো মাংস, পচে যায়, গন্ধ বেরোয়···আমি কি মাংস চাই, আমি চাই ভালবাসা··· আজীবনই তাই চেয়েছি, মাংসর পূজো কোনদিনই করিনি আমি···একটা নিঃশ্বাস চাপেন খৃষ্টপূর্ব্ব···ভারী রাগী মেয়ে, বড়ো মুখ করে আমাকে, কাছে গেলেই কেবল ঝগড়া, কেবল দূর-ছাই! গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিলে কি ফুলকে ভালবাসা যায়? ভালবাসা যায় ঐ ফুলের শরীরটাকে, যা কিছুক্ষণ পরে ঝিমিয়ে যায়, শুকিয়ে যাচ্ছেতাই হয়ে যায় একেবারে। আমি বলি, ফুল তুমি বোঁটার ওপরে থাক,···কাউকে কাছে আসতে দিওনা, কেউ যেন ছিঁড়ে না ফেলে তোমাকে···তা যতই বল লীলা কিছুতেই বুঝবে না,···যে আসবে, এগিয়ে যাবে তার কাছে। আরে মানুষ না হয় এগিয়ে আসবে ফুলের কাছে সেটা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু তুই ফুল, তুই এগিয়ে যাবি নিজে থেকে? প্রফেসার মানেই একেবারে bovine, ষোল আনা গব্য।···

আবার কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলো দু'জনে—গোবরের তালটা হাতেই আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, কাল ওর ভায়ের পৈতে। ওতো আমাকে কিছু

বললে না···আমি নিজে থেকেই খবর নিয়ে জানলুম, পৈতের পূজোর জন্যে নাকি ষাঁড়ের গোবর চাই···শুনেই বেরিয়ে পড়লুম, সেই তিনটে থেকে দুটো ষাঁড়ের পেছুন পেছুন ঘুরছি। একটা তো বউবাজার থেকে হেদো পর্য্যন্ত নিয়ে গেল, সেখানে গিয়ে দেখলুম আর একটা ষাঁড় উল্টোমুখে যাচ্ছে···তার পেছুন পেছুন এই পর্য্যন্ত এসে তারপরে দেখলে তো গাধা চাপা পড়ে মরি আর কি !···

সুশান্ত জিজ্ঞেস করলে, কোন ষাঁড়ের গোবর এটা ? সোজামুখের না উল্টোমুখের ?

খৃষ্টপূর্ব্ব আবার যেন তলিয়ে গেছেন নিজের মধ্যে, একটু থেমে বললেন, এটা তো ষাঁড়ের গোবর নয়, এতো গরুর।

কেন ?

বিরক্ত হয়ে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব···কেন কি ? ও দুটো ষাঁড়ই তো আমার মত কোষ্ঠবদ্ধের রুগী ; আমি ষাঁড়ের পেছুন পেছুন ঘুরতেই পারি, গোবর পেলে কুড়োতে পারি, কিন্তু গোবর পেলে তবে তো কুড়োব ? এক মিনিট চুপ করে কি যেন ভেবে নেন খৃষ্টপূর্ব্ব। তারপর বলেন, তাই ভাবলুম দূর হোক গে ছাই···গোবরে তো স্ত্রী-পুরুষ লেবেল দেওয়া নেই···গরুর গোবরই নিয়ে যাই।

সুশান্ত বললে, লীলার সঙ্গে মিথ্যাচার করবেন ?

খৃষ্টপূর্ব্বের মুখটা শক্ত হয়ে আসে·· না না, ও তুমি বোঝনা, আমার মতে ওতে কিছু আসে যায়না। আমি রিসার্চ করে দেখেছি প্রত্যেকটা মেয়ে পনেরো আনা পুরুষ ও প্রত্যেকটা পুরুষ পনেরো আনা মেয়ে।

সুশান্ত বাধা দেয়,···কিন্তু এক আনার গোলমালটা তো রয়েই গেল।

চিন্তিত হয়ে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব···হ্যাঁ তা রয়ে গেল বটে···তাহ'লে কি করি বলতো ?

সুশান্ত উপদেশ দেয়···একে গরুর গোবর, তায় কালকে বলেছেন পৈতে হবে···একে গরুর, তায় বাসী ; ব্যাপারটা যে একেবারে বাসী-মড়ার মত হয়ে যাবে। তার চেয়ে ফেলে দিন ওটাকে হাত থেকে, কাল না হয় ভোর রাত্তিরে উঠে পেছু নেবেন কোন সদয় ষাঁড়ের···

—তাই ভালো বলে গোবরের তালটা ছুঁড়ে একটা গাছের

গোড়ায় ফেলে দিয়ে ঘাসে হাত মুছে আবার বেঞ্চিতে ফিরে আসেন খৃষ্টপূর্ব্ব…আবার লীলার কথা এসে পড়ে…জানো মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে…লেখা পড়া জানে মন্দ নয়, কবিতাটবিতা বোঝে ভালো। বলে আমি সিনেমায় নাবেবো। আমি বলি সিনেমায় নাবো, বিয়ে কর, আবার স্বামীকে ভালবাসো…কিন্তু তার সঙ্গে আমাকেও ভালোবাসতে হবে।··

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কি বলে তাতে?

খৃষ্টপূর্ব্ব উত্তর করেন, কি আবার বলে? বলে তা' হয়না। আমি বলি হয়, সে বলে কিছুতেই হয় না, আমি আবার বলি হয়, সে আবার বলে হয় না…এমনি করে লেগে যায় ঝগড়া। তারপর আমার মাথার ঠিক থাকে না, সেদিন ঐ রকম ঝগড়ার পর রেগে গিয়ে তার বাড়ীতে দাঁড়িয়েই আমি তাকে বললুম, গেট আউট…যাও জাহান্নমে যাও।…

সুশান্ত আবার মোড় ঘোরায় কথাটার…আজকাল আপনার গবেষণা কি রকম চলছে?

খৃষ্টপূর্ব্ব আশ্বাস দিয়ে বলেন, খুব এগিয়ে গিয়েছি ঐ ব্যাপারে। ভালবাসার মন্ত্র হোমিওপ্যাথিতে মিশিয়ে আজকাল দুরারোগ্য ব্যাধি সারাচ্ছি আমি…আমাদের হোটেলের সামনে যদু মুদীর ছ'মাসের নাক নিয়ে জলপড়া বারো আনা কমে গেছে।

কোন হোটেলে আছেন আজকাল?

আধুনিকা হোটেলে। এসো না একদিন…আমি তো এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো আমার ওসুধের। দৈনিক কাগজে কপি পাঠিয়ে দেবো কাল-পরশু…"ভালবাসার হাসপাতাল", কেয়ার অফ আধুনিকা হোটেল, এই ঠিকানায় রুগীদের চিঠিপত্র আহ্বান করবো।

অকস্মাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে যায় খৃষ্টপূর্ব্বর। খানিকটা চুপ করে থেকে বলেন, তুমি সত্যিকারের বিপ্লবী মেয়ে দেখেছো?

চমকে ওঠে সুশান্ত…বিপ্লবী মেয়ে! সে আবার কে?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, আজ প্রায় মাসখানেক হতে চললো "আধুনিকা হোটেল"-এ একটা মেয়ে এসেছে, তুমি তাকে দেখলে ভুলতে পারবে না। বিপ্লবী মেয়েদের কথা বইয়েতে পড়েছি, আগেকার কংগ্রেসী আমলে

দু'একজনকে দেখেওছি চোখে···আধুনিকার এ মেয়ে কিন্তু সবাইকে হার মানিয়ে দিয়েছে···আবার একবার তলিয়ে গেলেন· খৃষ্টপূর্ব্ব ; এ একটা ভালবাসার ডাকাত, জানলে ? মনে হয় এ যেন পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা এক গণ্ডূষে শুষে খেয়ে ফেলবে !···

মনে মনে দোল খেতে থাকে সুশান্ত···খুব রূপসী বুঝি ?

খৃষ্টপূর্ব্ব একটা ঢোঁক গেলেন···রূপসী. বল্লে, ললিতলবঙ্গলতাকে কল্পনা কোরোনা, খুব বড়ো বড়ো চোখ আর তিলফুলজিনিনাসা থাকলেও দৌর্ব্বল্য নেই···সতেজ শিশুগাছের মত দীর্ঘ, ঋজু চেহারা পা পর্য্যন্ত চুল, বয়েস একুশ বাইশ, খুব ফর্সা গায়ের রঙ। এ এমন একটা অদ্ভুত দুর্গার মত বিজয়িনী রূপ যে সত্যি বলছি তার দিকে আজ পর্য্যন্ত আমি ভাল করে তাকাতে পারিনি।

ব্যগ্র হয়ে সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, নাম কি ?

ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন খৃষ্টপূর্ব্ব···চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে নামের, নাম বিদ্যুৎ। তারপর বাপ যিনি তাঁকে দেখলে মনে হয় বুঝি যীশুখৃষ্টের দিকে তাকিয়ে আছি। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি উজ্জ্বল রঙ, তেমনি বুক পর্য্যন্ত ছড়ানো দাড়ি। প্রায় সব সময়েই জপতপ লেখাপড়া নিয়ে থাকেন।···

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কেমন করে জানলেন ও বিপ্লবী মেয়ে ?
খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে উত্তর দেন···সে কি আমায় বলেছে, সে বিপ্লবী ? তা সে বলেনি···তার সঙ্গে আমি যেচেই আলাপ করেছি, তার দিকে তাকিয়েই আমার মনে হয়েছে, ওকে বুঝি কিছুতেই বোঝা যাবে না···ও যা, তা বুঝি ও কিছুতেই নয় ; যে মাটিতে ও দাঁড়িয়ে আছে সে মাটি বুঝি আর একদণ্ডও সে মাটি থাকবে না।··· ওর পায়ের তলায় এখনই আবার বুঝি জ্বলে-পুড়ে নতুন হয়ে উঠবে এ মাটি, আবার ফুটবে সেই নতুন মাটিতে নতুন ফুল, নতুন ফল···একটু চুপ করে যান খৃষ্টপূর্ব্ব···তুমি এসো সুশান্ত, নিশ্চয়ই এসো কিন্তু আধুনিকা হোটেলে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, দেখবে পিতাপুত্রী দু'জনেই অপূর্ব্ব···আবার একটু কি ভেবে নেন রমেশ ঘোষাল। বলেন, লীলার ভালবাসা আমার জীবনে

শেষ ফুল ফুটিয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে ও ফোটাবে নতুন ফুল, নতুন ফল, মানুষের বুকে নতুন কথা, নতুন সুর জাগাবে ও !···

আশায় আশায় সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, শুধু বুঝি পিতাপুত্রী, আর কেউ নেই বিদ্যুতের ?—ভাইবোন ?

কপাল কুঁচকে খৃষ্টপূর্ব্ব স্মরণ করবার প্রয়াস করেন,···কে জানে, ঠিক মনে পড়ছে না তো।···ঐ পিতাপুত্রী দু'জনে এমন ব্যাডমিণ্টন খেলছে আমার মনটাকে নিয়ে আজ ক'দিন ধরে, অন্য কে আছে না আছে সে দিকে মন দেবার একটুও সুযোগ পাইনি।

সুশান্ত টোকা মারে···লীলা তাহ'লে শেষের ফুল ফোটা নাও হতে পারে ?

আমরা আগে দেখেছি খৃষ্টপূর্ব্ব মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে যান ; এবারকার অবগাহনটা বেশ জমাট রকমের। কে যেন চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে একবার হাসলেন, একবার চোখ পাকালেন, তারপর চোখটা টেনে ঘাড়টাকে এমন করে নাড়লেন যে মনে হ'ল, বোধ হয় নূরজাহানকেই ইঙ্গিত করে বললেন, চলা যাও—নেই মাঙ্‌তা···আবার তক্ষুনি কে যেন সুইচ টিপে দিলে, আবার ফিরে এলেন সুশান্তর কাছে···ফুল ? না···বিদ্যুৎ তো খোঁপায় ফুল পরে না।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, লীলা পরে ?

খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে ওঠেন,···না, না, লীলা যে বিধবা। আর তাছাড়া ও সব ভালো নয়—ঐ রূপেনটা রয়েছে, মাঝে মাঝে এসে কবিতা শুনিয়ে যাচ্ছে লীলাকে···তারপর একটু হেসে, একটু ভেবে, খৃষ্টপূর্ব্ব ঘাড়টা নেড়ে বললেন, ঐ রূপেনটাই পাঠাবে ওকে জাহান্নমে, ঐ প্রেমের কবিতা শুনিয়ে !···

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, আপনি কবিতা শোনান না কেন ? রূপেনের চেয়ে আপনি তো ঢের ভালো কবিতা লেখেন।

বড় বিরক্ত হয়ে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব···আমি তো লিখিই রূপেনের চেয়ে ভালো কবিতা, রূপেনটা আবার কবে কবিতা লিখতে শিখলে ? কিন্তু

গোড়ায় যে গলদ, আমার বয়েস যে বাষট্টি, আর রূপেন যে কচি···মোটে সাঁইত্রিশ বছরের···বাষট্টির কবিতা নোবেল প্রাইজ পেলেও রাবিশ। তারপর অকস্মাৎ রমেশের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, সুশান্তর হাত দুটো ধরে এমন সহজভাবে আস্তে আস্তে তিনি কথা বললেন, মনে হ'ল যেন ঝরঝর করে কল থেকে চৌবাচ্ছাতে জল ঝরে-পড়ছে। ফুলের কথা বললে, সুশান্ত, তাই একটু বিমনা হয়ে গিছলুম···ফুলের কথা আজকাল কেউ বলে না, কেউ বলতেই চায়না আজকাল ও সব কথা, ও সব ফুল-টুল চাঁদ-টাদ, ও সব হ'ল আজকাল ভাববিলাস। যাক্, শোন বলি, কাল ছিল লীলার জন্মদিন। কোন কোন সময় যখন ভালো করে কথা কয়, তখন একদিন বলেছিল এই জন্মদিনের তারিখ। আমি ডায়েরীতে নোট করে নিয়েছিলুম। একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে আবার খৃষ্টপূর্ব্ব বললেন···একটা বেশ বড়ো রক্তগোলাপ, শুধু একটা, নিয়ে গেলুম তার কাছে, কাল সকালবেলায়। একলা বসে চা খাচ্ছিল পড়ার ঘরে···বল্লুম, লিলি আজ তোমার জন্মদিন, তুমি তো জানো, আমি গরীব মানুষ, তাই তোমাকে এই ফুল দিলুম···আর তাছাড়া গরীব বড়োলোক মানিনা, একজন রসিক মানুষ অন্য মানুষকে যতকিছু দিতে পারে, তার মধ্যে ফুল দেওয়াটাই হ'ল সবার চেয়ে বড়ো দেওয়া।···

জন্মদিনের মন কিনা, মিষ্টি করে হাসলে লীলা, পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললে, বোসো।···

বসে বল্লুম, দেশ থেকে পাটালি এনেছিলুম একটু···পকেট থেকে বার করে একটুকুরো দিয়ে, বল্লুম, আমার সুমুখে একটু ভেঙে নিয়ে চায়ের সঙ্গে খাও।

লীলা ছোট্ট একটা টুকুরো ভেঙে কামড়ালে। বল্লে, আপনি কি নিজেকে রসিক মনে করেন?

আমি নড়ে উঠলুম চেয়ারে। বল্লুম, আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমি রসিক···আজীবন রসের দেবতাকেই পূজো করলুম, এই ধর না ঐ সব কটাকেই···রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ···রূপই আমার সব···ও তত্ত্ব-ফত্ত্ব

আমি মানিই না কোনদিন। রূপই আমার কাছে তত্ত্ব…ব'লে সেই যে কবিতাটা, সেটার শেষটা শুনিয়ে দিলুম :

> বৃথা মাষ্টারী, মিছিমিছি বেত নাড়া,
> ফুলে ফুলে ওঠে ষোড়শী নটীর বুক—
> পাখী উড়ে যাবে, ঐ শোন ডানা ঝাড়া,
> মুঠো ভরে নাও ছড়ানো রূপ-ঝিনুক।…

লীলা জিজ্ঞেস করলে, আপনি রস ভালোবাসেন, না কষ ?

—দেখ দিকিন, কি অদ্ভুত মেয়ে, আরে কষটা আবার কি ? বল্লে, কাঁচা ফলের কষ ? ঐ শোন দিকিন সুশান্ত। তারপর কি বল্লে জানো ? বল্লে, দেখো দাদু আমি কক্‌খনো তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না।

আমি চেয়ারে বসে বসেই এ্যাটেন্সন হয়ে গেলুম, ও কথা শুনলেই কেমন যেন মাথা গরম হয়ে ওঠে। বল্লুম, নিশ্চয়ই বাসতে হবে, সে বল্লে, কক্‌খনো পারবো না, এই তোমার পাটালির দিব্যি করে বলছি।…

বল্লুম, নিশ্চয়ই বাসতে হবে।

সে আমার ফুলটাকে নিয়ে জোরে আমার সুমুখে নেড়ে বল্লে, কক্‌খনো পারবো না।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম, বসে বসে কতক্ষণ ঐ মিথ্যে কথা সহ্য করা যায় বল ? আমাকে ভালবাসে, আমি ডেফিনিট, তবু বলবে পারবো না। বল্লুম, ভালবাসতে পারবে না ও কথা মিথ্যে কথা।

যেন ছারপোকা মারবে এমন চোখ মুখের ভাব…বল্লে, কক্‌খনো মিথ্যে নয়।…আমি আর পারলুম না, ব'লে ফেল্লুম, রাসকেল…ব'লে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর উনি যেন ফেনা ভরা ঢেউ, হি হি করে হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়লেন।

খৃষ্টপূর্ব্বর ভঙ্গী দেখে সুশান্তর মনে হ'ল সেখানে রামপেয়ারে থাকলে লীলাকে হাসতে দেখে নিশ্চয়ই 'ষ্টাপ' বলতো।

সুশান্ত আগের কথাটা নিয়ে আসে : আমি বলছিলুম যে, আপনার জীবনে লীলা হয়ত শেষ ফুল ফোটা নাও হতে পারে…বিদ্যুৎও তো পারে পরের ফুলটা ফোটাতে ?

...আবার এল আর একটা গভীর অবগাহন...এবারে দাঁত খিঁচোলেন যাকে সে বোধ হয় ট্রয়ের হেলেন...তারপরে বুঝি—খৃষ্টপূর্ব্ব চলে গেলেন অশোকবনে বন্দিনী সীতার কাছে। হাসির ওপর এমন স্নিগ্ধ একটু আলো ফুটলো, এমন একটা নিরস্তিত্বের শুভ্র সূচিতা, মনে হ'ল এবার বুঝি সীতার দেখাই মিলেছে খৃষ্টপূর্ব্বর।

এবারে কিন্তু সুশান্তর কথা ভুলে যাননি। বললেন, বিদ্যুতের কথা বলছো? আমি তাকে বড়ো ভয় করি, বড়ো বেয়াড়া বেয়াড়া কথা বলে। নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুর চিন্তা ওদের যেন বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটু কাশেন রমেশ ঘোষাল। বলেন, আমাকে একদিন বল্লে, আপনাদের মত বুড়ো অকর্ম্মণ্য যারা, রাষ্ট্রের উচিত তাদের গুলি করে মেরে ফেলা। বল্লে, আমার হাতে যদি আজ রাষ্ট্রশক্তি থাকতো, তাহ'লে আমি ভারত-রাষ্ট্রের অন্ততঃ দশ কোটি লোককে গুলি করে মেরে ফেলতুম, জন-সংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্যে।

বললুম, বেশতো তাহ'লে মেরেই ফেলুন।

বল্লে, কিছু ভাববেন না তার জন্যে, প্রয়োজন হলেই পাদুটো উঁচু আর মাথাটা নিচু করে টাঙিয়ে দম্ করে গুলি করে দেবো...এক সেকেণ্ডে বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন।—তুমি এসো কিন্তু নিশ্চয়ই...বাপ মেয়ে দু'জনেরই অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব...আলাপ করে আনন্দ পাবে।...

—নমস্কার, রমেশ বাবু। সুমুখে এসে দাঁড়ায় নুটবিহারী সামন্ত। দাঁতওয়ালা, দাঁতের ব্যবসা করে। খৃষ্টপূর্ব্বকে দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছে। ষাট টাকার দামের মধ্যে পেয়েছে মাত্র দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা এখনো বাকী।

রেগে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব। বলেন, পথে-ঘাটে ভূতের মত এমন পেছু নাও কেন বলতো? দাঁড়াও পাকিস্তান যাচ্ছি, সেখানে থেকে এসেই টাকা দিয়ে দেবো।

নুটবিহারীর ট্যারা চোখ, আরও যেন ট্যারা হয়ে যায়; কোন দিকে তাকিয়ে আছে মোটেই বোঝা যায় না। মনে হ'ল সুশান্তর দিকে তাকিয়ে তাকেই বল্লে, দাঁত বাঁধিয়ে তারপরতো পাকিস্থানে যাবেনই, গিয়ে ওদের ধর্ম্ম নিয়ে ওখানে থেকে যাবেন তাও জানি। তা বেশতো

ভূতটা আপনিই ছাড়িয়ে ফেলুন না···পয়সা তো দেবেন না বোঝাই যাচ্ছে···তা পয়সা না দিলেন, দাঁতগুলোই ফেরৎ দিন না মশাই।···

খৃষ্টপূর্ব্ব আরও আগুন হয়ে ওঠেন···ওরে বাবা আস্পর্দ্ধা তো কম নয় দেখছি, এর পরে কোনদিন বলবে চোখ দুটোও খুলে দাও! যাও পথ দেখ,···মুখ থেকে দাঁত খুলে দেবে? কি অপরাধ? না, কিছু টাকা ধারি ···যাও, যখন হবে নিয়ে যেও, এখন বিরক্ত কোরো না শুধু শুধু।···

হেসে ফেলে নুটবিহারী। বলে, সে কথা তো বরাবরই শুনে আসছি। আপনার টাকা কি আর শীগ্‌গির আসবে? আমার দাঁতগুলো সব পড়ে যাবে, তবে বোধ হয় আপনার দাঁতের দাম পাবো···হেসে চলে যায় নুটবিহারী নিজের গন্তব্য পথে।

খৃষ্টপূর্ব্বও উঠে পড়েন। বলেন, যাই সুশান্ত, লীলার বাড়ী কাল কাজ ···অনেকক্ষণ বাড়ীর বাইরে রইলুম। লীলা যাই বলুক, আমি না হলে একটা কাজও হবে না কারুর দ্বারা।···উঠে পড়েন রমেশ ঘোষাল। যাবার সময় আবার বলেন, এসো কিন্তু কাল সকালে—আমি এগারোটার পর হোটেলে থাকবো।

—সাত—

তারপরের দিন সুশান্তর বাড়ীতে সকালবেলা ন'টার সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। সুশান্ত সেই সবেমাত্র ট্যাক্সি করে খিদিরপুরের কাজে বেরিয়ে গেছে। উপস্থিত সুশান্তর আর্থিক অবস্থায় একটু আলো উঁকি দিয়েছে। এক জায়গার পাওনা পঞ্চাশ হাজারের ওপর টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। সকালবেলার চড়াই পাখীর মত একটু যেন হাসি জানালার চৌকাটটার ওপরে নাচতে আরম্ভ করেছে। এতোখানি বড়ো মুখ করে সুশান্তকে সেদিন বলেছে সুলতা: এই আবার তোমার ভাল সময় আরম্ভ হ'ল···এতদিনে আবার কালো মেয়ের ইচ্ছে হয়েছে।···

. ' .টেলিফোন বেজে উঠলো, সুলতাই গিয়ে ধরল টেলিফোনটা। হ্যালো···ওপার থেকে আসে নারীকণ্ঠ,···হ্যালো, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আছেন?

—আমি কথা বলছি।

—সুশান্ত বাবু আছেন?

লতা বলে, না তিনি তো বেরিয়ে গেছেন,. আপনি কে?

নারীকণ্ঠ উত্তর দেয়, আমার নাম সদানন্দ ঘোষ।

—সদানন্দ ঘোষ? ওতো পুরুষের নাম, কথা যে কইছে সে তো মেয়েমানুষ···আশ্চর্য্য হয়ে যায় লতা। বলে, সদানন্দ ঘোষ? কিন্তু আপনার?···

—নিজেই বলে নারীকণ্ঠ···গলার আওয়াজটা মেয়েমানুষের মত, এই বলছেন ত'? হ্যাঁ, সে কথা সত্যি; তিন বছর বয়েসের সময় ডিপথিরিয়া হয়েছিল, মরিনি, তবে পুরুষের কণ্ঠ চিরদিনের মত হারিয়েছি। কলেজ জীবনে বন্ধুরা আমাকে সদানন্দা বলে ডাকতো।

মিথ্যে কথা, সুলতার মনে হয় নিশ্চয় মিথ্যে কথা। ইচ্ছে করে আত্মগোপন করছে এ মেয়েটা।···এ ভ্রষ্টা আওরাত নয়তো?

তবু সদানন্দ ঘোষ নামক ভদ্রলোকটিকে বাহ্যতঃ অবিশ্বাস করে অপমান করতে ইচ্ছে করল না সুলতার···আচ্ছা সদানন্দ বাবু কি বলছেন, বলুন।···

সদানন্দ বলে: এখনো এদেশে টেলিফোন করলে এপার-ওপার দেখা যায় না তাই, তা না হলে দেখতেন. আপনাদের রামপেয়ারের চেয়েও আমার বড় গোঁফ আছে।···

লতা জিজ্ঞেস করে: আপনি রামপেয়ারেকে কেমন করে জানলেন?

—আপনার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কি আপনাদের দরওয়ানের নামটাও জানতে পারে না? কিন্তু যাক সে কথা···আপনি অনুগ্রহ করে একটা কাজ করুন, করবেন?

লতা বলে, বলুন।

—রামপেয়ারের গোঁফের কথা উপস্থিত ভুলে গিয়ে ধরে নিন আমি স্ত্রীলোক।···

—লতা হাসে। বলে, সেটা আমি আগেই ধরে নিয়েছি।

ওপার থেকে উত্তর আসে, তাহ'লে ধরুন আমার নাম বলাকা সেন··· চাপ্পাল পায়ে, ছিপছিপে, চশমা পরা।···

লতা ঘাড় নেড়ে হাসে। বলে, মোটেই নয়।

ঝড় ঝড় কি একটা শব্দ হয় টেলিফোনে···দু'পার থেকে আর্ত্তনাদ আসতে থাকে···হ্যালো, হ্যালো··

বলাকা সেন বলে, কি বললেন কিচ্ছু বোঝা গেল না তো?

লতা বলে, বলছি আপনি মোটেই বলাকা সেন নন, আপনি অন্য মেয়ে।

—কোন অন্য মেয়ে কি সম্প্রতি আপনার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছে?

মরণ-দশা···আস্পদ্দা যেন একেবারে তাল গাছে গিয়ে উঠেছে! হঠাৎ যেন রাগ করলে সুলতা।

ওপার থেকে আবার আসে প্রশ্ন, রাগ করলেন?

লতা বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন?

লতা বলে, আপনার গলাটা ভারী মিষ্টি।

বলাকা জিজ্ঞেস করে, কেমন করে দেখা হবে?

—কাল আসুন—

—নেমন্তন্ন? কখন? এ-বেলা না ও-বেলা?

—লতা বলে, দু'বেলাই।

বলাকা জোরে হেসে ওঠে,—কাছে বসে খাওয়াতে হবে কিন্তু?

—লতা বলে, নিশ্চয়ই খাওয়াব।

—একপাতে খাবেন?

একেবারে বেহায়া···তবু লতা বলে, তাও খেতে পারি।

ওপার থেকে আবার একটু হাসির শব্দ···কিন্তু আমি যদি সদানন্দ ঘোষ হই, নারীকণ্ঠ সদানন্দ?

হি হি করে হাসে লতা···তাহ'লে গোঁফ কামিয়ে আসবেন। লতা চেপে ধরে, ঠিক আসছেন তো? কখন আসবেন?

বলাকা বলে, কাল সকাল সকাল যাবো, ন'টার মধ্যে। সঙ্গে এক বোতল ভালো মদ নিয়ে যাবো…বেলা ন'টা থেকে আরম্ভ করে রাত্তির ন'টা পর্য্যন্ত মদ খাবো আমরা.—আমি. আপনি ও সুশান্ত বাব… খাবেন তো?

লতা জিজ্ঞেস করে, কেন, মদ খাবো কেন? /

—মদের নেশায় আপনারা চিনে নেবেন. আমাকে, আমি চিনবো আপনাদের দু'জনকে…নেশার চোখে সুশান্ত বাবু দেখবেন আমাদের দু'জনকে, আমরা দু'জনে দেখবো সুশান্ত বাবুকে…আপত্তি আছে?

—নেশা না হলে কি চিনতে পারা যাবে না? জিজ্ঞেস করে লতা।

বলাকা বলে, মদের নেশা প্রায়ই প্রাথমিক মানুষকে চিনিয়ে দিতে পারে, যাকে ইংরেজিতে আপনারা বলেন elemental, আপনি একটা গন্ধ ফুলের মালা আনিয়ে রাখবেন কিন্তু…শুধু একটা হলেই চলবে।

লতা বলে, মালা কি হবে?

একটা কাশির শব্দ আসে ওপার থেকে,—মদের নেশায় তিনজন প্রাথমিক আমরা, বেশ ভালো করে দেখে নেবো তিনজনকে, তারপর ঘুরে ঘুরে তিনজন তিনজনকে পরিয়ে দেবো ঐ মালা।

কি ঘেন্না, লতার ইচ্ছে করে টেলিফোনটা রেখে দেয় তক্ষুনি। তবু, তবু…তাল দিয়ে যায় লতা,—তারপর কার গলায় হবে ঐ মালার যাত্রা শেষ? কার বুকটা হবে শেষের ইষ্টিসান?

ওপার থেকে জবাব আসে—বলাকার বুক।

লতা বলে, কেন, বলাকার কেন?

—বলাকা মাতাল বলে।

—কেন মাতাল কেন? জিজ্ঞেস করে লতা।

বলাকা বলে, এইতো এলো মাতাল হবার দিন, আজ বলাকা মাতাল হয়েছে, কাল বলাকা, সুশান্ত বাবু ও তাঁর স্ত্রী তিনজনেই মাতাল হয়ে যাবে…সমস্ত পৃথিবীতে টলে টলে বেড়াচ্ছে ঘোর মাতলামী।. বিশ্বময় আজ চলেছে বামমার্গী কাপালিকের তপস্যা…মদ্য, মাংস, দেহভোগের আজ জেগেছে বীভৎস মহোৎসব…এই প্রবৃত্তির পথ দিয়েই আবার আজকেকার মানুষ একদিন নিবৃত্তিতে পৌঁছে যাবে।

দম বন্ধ করে শোনে লতা…যেন খেই হারিয়ে গেছে। ঠিকমত উত্তর জোগায় না মুখে।

ওপার থেকে আবার বলে বলাকা, পাগলা কালীকে জানেন? সেই পাগলা কালীর নাচ জেগেছে আজ মানুষের জীবনে। আজকে সবার মাতাল হবার দিন এসেছে দেবী। আজ নেশার ঘোরে সবাইকে সব ত্যাগ করতে হবে…একটা ঢোঁক গেলে বলাকা…কাল তাহ'লে মদের বোতল নিয়েই আসবো, কেমন?—ভালো কথা আর একটা অনুরোধ আপনাকে করা হয়নি, সুশান্ত বাবু।…

টেলিফোনে কড়াং করে আবার একটা শব্দ…যাঃ লাইন কেটে গেল…এপারে-ওপারে কেবল চলে হাঁকহাঁকি হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

টেলিফোন রেখে দিয়ে ধপ্ করে সোফাটায় বসে পড়লো লতা। সমস্ত মনটা যেন কালো গম্ভীর হয়ে উঠেছে একেবারে…কিসের যেন একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার পর সমস্ত শরীরটা অবসাদে ঝিমঝিম্ করছে। মাতল হতে হবে, বামমার্গীর তপস্যা করতে হবে…কি বলতে চায় মেয়েটা? বলাকা? ছিপছিপে, চাপ্পাল পায়ে চশমা পরা।…না, না, এ বেলা, এ নিশ্চয়ই ভ্রষ্টা আওরাত! লতা নিশ্চয় করে বলতে পারে এ ভ্রষ্টা আওরাত ছাড়া অন্য কেউ নয়। অকস্মাৎ রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে…জানা নেই, চেনা নেই, তবে ওরকম করে বেহায়ার মত কথা কইবার সাহস কোথায় পেলে ঐ মেয়েটা? অতি বড়ো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ঢঙ করে ইয়ারকি করবার, কে দিয়েছে ওকে অধিকার? একসঙ্গে সকাল থেকে রাতদুপুর পর্য্যন্ত মদ খেয়ে মাতলামী করতে চায় ও সুলতা ও সুশান্তর সঙ্গে! ওঃ সুলতাকে, সুশান্তকে বড়ো সস্তা ভেবে নিয়েছে ভ্রষ্টা আওরাত! রামপেয়ারে ঠিকই বলেছিল, ও ভ্রষ্টা, ভ্রষ্টা না হলে পুরুষ মানুষের সঙ্গে মদ গেলবার এত সখ? বড়ো দুঃখে হাসি আসে লতার…শুধু সুলতাকে হলে চলবে না, সুশান্তকেও চাই মদের আসরে। সুলতা ভাবলে ঢের ঢের গায়ে-পড়া বেহায়া মেয়ে দেখেছে সে, কিন্তু তারা কেউ বেহায়াপনায় ভ্রষ্টা আওরাতের পায়ের কাছে স্থান পাবারও যোগ্য নয়।

দেয়াল ঘড়িটাতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। লতা নিশ্চল

হয়ে সোফায় বসে আছে…কি যেন একটা আসছে, কি যেন একটা ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ, কি যেন একটা মহাপ্রলয়…সারা আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে কালো হয়ে গেছে বুঝি? লতার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সব আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে মেঘে, মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিশ্বচরাচরের সব আলো…এবার? এবার বুঝি ঝড় উঠবে? এ পরমক্ষণে জাগবে বুঝি লতার জীবনে পাগলা কালীর উন্মাদ নৃত্য?

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, ঠোঁটে রঙ মেখে আসবে বুঝি পাগলা কালী এক্ষুনি? এক্ষুনি আসবে? লতার মনে হ'ল ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে কার যেন জুতোর শব্দ হচ্ছে…ঐ বুঝি আসছে পাগলা কালী, লিপষ্টিক মাখা ঠোঁট নিয়ে, মদের বোতল হাতে করে।

কোথায় যেন অনেক অনেক দূরে চলে গেছে লতা…কোথায় যেন একটা নিবিড় বনের মধ্যে সে চলেছে সুশান্তর সঙ্গে। এই রকম বেলা দশটা এগারোটা হবে। সুশান্তর হাতে বন্দুক রয়েছে, শিকার করতে বেরিয়েছে ওরা। হঠাৎ তাড়াতাড়ি সামনের গাছটার মগডালে উঠে পড়ে দু'জনে…সুমুখের নদীতে বাঘ-বাঘিনী জল খেতে এসেছে একসঙ্গে।

—আমাকে দাও আমি মারবো, বলে বন্দুক কেড়ে নেয় লতা। ছোটবেলার মত দুম্ করে ছোঁড়ে বন্দুক। মাথায় লেগে একটা প্রচণ্ড গর্জন করে লুটিয়ে পড়ে বাঘটা বাঘিনীর কাছে।

—বাঘের বুকের কাছে এগিয়ে যায় বাঘিনী…তারপর ফিরে লতাদের গাছের দিকে তাকায়…উঃ কি ভীষণ চাউনি…লতার মনে হয় টেলিফোনের অপর পারে ঐ মেয়েটা বুঝি ঠিক অমনি করেই তাকিয়েছিল তখন?

—হঠাৎ সুশান্তর ডালটা মড় মড় করে ভেঙে সুশান্ত পড়ে গেল গাছের তলায়…উঃ লতা আর তাকাতে পাচ্ছে না,…বাঘিনীটা সুশান্তর দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসছে।

তারপর বনটা যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। একলা চলেছে লতা…একেবারে একলা। যে বনে সীতার নির্ব্বাসন হয়েছিল; তার চেয়েও বোধ হয় এ বন ভয়ঙ্কর। কেউ নেই সঙ্গে সব হারিয়ে গেছে লতার…সবাই তাকে এই বনের মধ্যে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

কেউ নেই···সুশান্ত নেই, সুরমা নেই ; স্নেহ নেই, মমতা নেই···কিছু নেই···আছে শুধু এই কালো ভয়ঙ্কর বন, আর আছে মনের মধ্যে অনন্ত সংশয় ও ভয়। একলা লতা পথ চলছে।

বাঘিনীর মনে কি একটুও দয়া নেই ? সুলতাকে মনে পড়বে না কি তার ? সে কি সুলতাকেও মেরে ফেলবে না ?

ভয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছে লতা। সুমুখে একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কালো মেয়ে—গিরিনন্দিনী কালী।

—সব দিয়েছিস্ ?

—দিয়েছি।

—সুশান্তকে, সুরমাকে ?

—দিয়েছি

—ঘর, সুখ, সুখের আশা ? উনুন ভেঙে ফেলেছিস ?

ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে লতা···সব দিয়েছি আমি, বাকী আছে প্রাণ, তাও দেবো।···

কালো মেয়ে জিজ্ঞেস করে, কার জন্যে ?

লতা বলে, তোমার জন্যে কালোমেয়ে, পাগলা কালীর জন্যে, ভ্রষ্টা আওরাতের জন্যে।···

—দশের জন্যে প্রাণ দিবি ? দশের সেবায় ?

—দেবো।

—কালোমেয়ের তাতেই সেবা হবে।

—মা ছুদা হাচি হাচবো ? সুরমা পাশে বসে বারবার জিজ্ঞেস করে, মা ছুদা হাচি হাচবো ? অনেকক্ষণ ধরে সুরমা দেখেছে বড়ো যেন কালো হয়ে গেছে সুলতার মুখ···চোখ বুজে আছে অনেকক্ষণ থেকে আশেপাশে ঘুরঘুর করে সুরমা···গায়ে হাত দিয়ে আবার বলে সুরমা, মা এবারে একটু ছুদা হাচি, হাচি ?

লতা অজ্ঞান হয়ে গেছে···গা ঠেলে মা মা বলে সুরমা চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

হৈ হৈ পড়ে গেছে বাড়ীতে, সবার চেয়ে মনোই অস্থির হয়েছে বেশী···ওরে সুকাকাকে টেলিফোন কর, শীগগির টেলিফোন করে

ডাক্তার বাবুকে আনা···ঝরঝর করে জল ঝরছে মনোর চোখে···প্রতিমা কোলে তুলে নিয়েছেন মাথা···সুলতাকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়েছেন। মাথায়, মুখে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এখন মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। মনোকে বলছেন···ভয় পেওনা, ও কিছু নয়, ফিট হয়েছে···সুরমা হবার পর দু'একবার এই রকম হয়েছিল। জানো, আমাদের চাপেই একদিন প্রাণ বেরিয়ে যাবে ওর···আমরাই মেরে ফেলবো ওকে। জানো মনো, এমন মানুষ আর হয়না. দশজনের জন্যে এতো ভালোবাসা, আমি এতো-খানি বয়েসে অন্য কোথাও দেখতে পাইনি···একটা চোখ একটু একটু কাঁপছে সুলতার।

ঘণ্টাখানেক পরে সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে লতা। সে দিন ছিল ষষ্ঠীর হাঙ্গাম। জননীরা আজ সন্তানদের মঙ্গল কামনায় কেউ অন্ন গ্রহণ করবেন না। সুলতা, প্রতিমা আরও তিন চারজন আছেন বাড়ীতে; সকলের জন্যে সুলতা লুচি ভাজতে বসেছে···প্রতিমা বেলে দিচ্ছেন। মনো নিঃসন্তান, প্রতিমা সুলতাকে জিজ্ঞেস করলেন, মনো তো ভাতই খাবে?

মনো রান্নঘরেই বসেছিল, সে প্রতিবাদ করলে, না না, আমি তোমাদের মত রুটী, লুচিই খাবো···শ্বশুরবাড়ীতে আমার জা-ননদদের সঙ্গে আমিও ষষ্ঠী করি···আমার শাশুড়ী বলেন, যাদের মা নেই তাদের কল্যাণে তুমিও ষষ্ঠী কর।

লতা হাসে···সেই কথাই ঠিক, যাদের মা নেই, যাদের কেউ নেই মনো তাদের মা। মনো কালোমেয়ে, বিশ্বজননী।

—আট—

ভুবনমোহন ঘোষ মশায়ের একটা পুরোনো টাইমপিস্ ঘড়ি ছিল। বহু মেরামত, বহু ডাক্তারী সত্ত্বেও সেটার একটা বহুদিনের প্রাচীন রোগ কিছুতেই আরোগ্য করা যায়নি। আগেকার দিনের নব-লাজরক্তা অবগুণ্ঠনবতী কিশোরী বধূর মত ঘড়িটা নিজের ইচ্ছেয় কখনো কাউকে মুখ দেখাতে চাইতো না। যেদিকটা মুখ সেদিকটা টেবিলের ওপর উপুড়

করে রাখলে তবে চলতো ঘড়িটা···শেষরাত্তিরের অন্ধকারের ঢাকনাটা তুললে যেন সকালবেলার প্রথম আলোকে দেখা যাবে, তেমনি রক্তিম আশা ও প্রতীক্ষা নিয়ে ওল্টানো ঘড়িটাকে সোজা করে দেখলে তবে দেখা যেত সময়, তারপর সময়কে অসময়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তৎক্ষণাৎ আবার ঘড়িটাকে উপুড় করে রেখে দিতে হ'ত টেবিলে··· না হলে রাত্রি ন'টার সময় বাড়ী ফিরে দেখা যেত ঘড়ি সোজা হয়ে বসে আছে বটে, তবে ন'টা রাত্তিরে সবে জেগেছে সন্ধ্যা ছ'টার ক্রমঘনায়মান অন্ধকার।

ঘোষজা মশাই, অর্থাৎ ভুবনমোহন ঘোষ মশাই প্রায়ই স্ত্রী বিমলাকে ঐ ঘড়িটার কথা বলতেন···কি করবো বল? ঐ ঘড়িটা যেমন উল্টে থাকলেই ভাল থাকে, কাজ করে, আমার শরীরটাও তেমনি ··উল্টে থাকলেই ঠিক চলে। ··তা কথাটা সত্যি যে ঘোষজা মশায়ের শরীরটা ঠিক ঐ ঘড়িটার মতই অনেকদিন থেকে দিন-রাত্তির উল্টে উপুড় হয়ে থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ ঐ তিনটেরই একটানা অত্যাচার। আজ একটা বেড়ে ওঠে তো কাল বাড়ে আর একটা। সময় সময় যখন হয় ত্র্যহস্পর্শ, অর্থাৎ তিনটেই যখন একসঙ্গে জোর করে ওঠে, তখন রুগীর কথা না হয় নাই বললুম, তাঁর আশেপাশে আর যে কেউ থাকে, ঘোষজা মশায়ের জ্বালায় তাদেরও অবস্থাটা প্রায় উল্টে যাবার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোয়।

মাণিকতলা অঞ্চলে সেই যে প্রকাণ্ড হোটেল "আধুনিকা" লাল রঙএর মস্ত বাড়ী, ঘোষজা মশাই সেই হোটেলের মালিক। ছাতের ওপর যে চারখানা ঘর আছে, তাতেই ঘোষজা মশাই সপরিবারে বাস করেন। নীচে একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত অহোরাত্র চলে আশ্রয় ও আহার্য্যের বাণিজ্য।

শরীরের জন্যে ভুবনমোহন নিজে হোটেলের কাজ বড় একটা দেখতে পারেন না, আসলে হোটেল চালায় দু'জন অল্পবয়সী ম্যানেজার। একজন ভুবনমোহনের আশ্রিত পিসতুতো ভাই অম্বর, ও অন্যজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় প্রণতিকুমার।

অনেকদিন আগে যখন ডাক্তার কবিরাজ দেখতো, তখন তারা

বলতো, ঘোষজা মশায়ের রোগটা নাকি বেশীরভাগই মানসিক। তবে এখন রুগী নিজেই হয়ে উঠেছেন চিকিৎসক…এ্যালোপ্যাথিক, হোমিও-প্যাথিক, কবিরাজী, হাকিমি সব শাস্ত্রের রকমারী অষুধের শিশি ও বোতলে ঘরের সব তাক, আলমারী একেবারে ঠাসা। ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছেন আর ওষুধ খাচ্ছেন। হোটেলের একজন চাকর পালা করে প্রতিদিন মালিকের কাছে ডিউটি দেয়।

রোজ শেষ রাত্তিরে রোগ-জাহাজের দিগ্‌নির্ণয় করে দেন নিজেই ভুবনমোহন। তা না করলে গিন্নি ভুল করে বসেন, চাকরগুলোর তো কথাই নেই, এবং ফলে, পথ্য ও সেবার ব্যবস্থায় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

রোজ রাত্তির সাড়ে তিনটেয় উঠে ঘোষজা মশাই দেয়ালের ব্ল্যাক-বোর্ডে খড়ি দিয়ে পরের দিনের নাড়ীর খবরটা লিখে রেখে দেন…অর্থাৎ যদি লেখন, 'কাঁচা', তাহ'লে সকালে চাকরটা ও অন্যান্য সকলকে বুঝে নিতে হ'বে যে রুগীর কাঁচা-সর্দ্দি হয়েছে, এবং তৎক্ষণাৎ ও পরে আরও অনেকবার আদা দিয়ে গরম চা আনতে হবে… মকরধ্বজ খাবেন, আলু-মরিচ, পাঁপর ভাজা দিয়ে রুটি খাবেন, খুব ঝাল ঝাল মাংস থাকবে তার সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি পরে কখনো লেখেন, 'পাকা', তাহ'লে কফকে সরল করবার জন্যে মিছ্‌রির জল, ফুটন্ত দুধ, আদাহীন চা, পেঁপের ডালনা এবং পায়ের তলায় গরম সরষের তেলের মালিশ। তাছাড়া নস্যি এনে দিতে হবে, এবং কফ তুলে ফেলবার জন্যে মাঝে মাঝে রুগীকে কাশবার এবং হাঁচবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

বায়ুর প্রকোপ হলে হয়তো সেদিন মাথা ঘোরে, তাই সেদিন ব্ল্যাক-বোর্ডে শুধু 'মাথা' লেখা থাকে এবং বাড়ীর লোক বাকীটুকু বুঝে নিয়ে পথ্যাদির ব্যবস্থা করে। পিত্তের ব্যাপারে প্রায়ই লেখা থাকে 'ঘিনঘিন' অর্থাৎ গা ঘিনঘিন করছে।

সেদিন হোটেলের চাকর উমেশ একটা বিশ্রী কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেললো। সেদিন বায়ুর প্রকোপ অর্থাৎ মাথার দিন, অথচ উমেশটা এক্কাপ আদা-চা এনে হাজির।

চোখ কপালে তুলে ঘোষজা হাঁকলেন, কি লেখা আছে বোর্ডে?

উমেশ বল্লে, মা তো বল্লেন, কাঁচা।

ধমকে উঠলেন ভুবনমোহন : কাঁচা ? কাল রাত্তির থেকে আমি ঝাঁ ঝাঁ করছি শুকিয়ে মরুভূমির মত, আর তুই বলছিস কিনা কাঁচা লেখা আছে ? একেবারে উমেশের কর্ণধারণ করলেন ঘোষজা···তোরাই গলা টিপে মেরে রাখবি দেখছি কোনদিন রাত্তিরে। চল, দেখা কোথায় কাঁচা লেখা আছে···দেখা গেল ব্ল্যাকবোর্ডে সত্যিই লেখা আছে 'কাঁচা'। ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন ঘোষজা···এ কক্‌খনো আমার লেখা নয়···কাঁচা তুই লিখেছিস ব্যাটা!···

উমেশ উত্তর করে, আমি কেমন করে লিখবু বাবু···আমি তো অতদুর নেকাপড়া করিনি।

তারপর এমনি ধারা দু'একদিন গোলমাল হতে লাগলো, ঘিনঘিনের জায়গায় পাকা, এবং পাকার জায়গায় মাথা। ভুল কথা নিজেই লিখে ফেলেন ভুবনমোহন, অথচ পরে স্মরণ থাকে না। একদিন সকালবেলায় রাগে দুঃখে আত্মহারা হয়ে ঘোষজা ডাকলেন ললিতাকে।

ঘোষজার ছেলেপিলে পাঁচ ছ'টি তাছাড়া ঘোষজায়া বিমলা তো আছেনই। কিন্তু আজ পাঁচ ছ'মাস হ'লো শ্বশুরবাড়ী থেকে একটি নবাগতার আমদানী হয়েছে···বহুদিন থেকে পিতৃহীন, এবং সম্প্রতি মাতৃহীন হয়ে ভুবনের শ্বশুরকুলের একমাত্র অসহায় অবশিষ্ট ষোড়শী ললিতা, দিদি অর্থাৎ বিমলার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। অতএব ললিতা ভুবনমোহনের শালী।

ললিতা সামনে এলে অনুনয় করে ভুবন বললেন, তুমি ভাই এই লেখার ব্যাপারটার চার্জ্জ নাওতো ··দেখছো তো এদের জ্বালায় আমি একদিন দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো।

ললিতার দেশের স্কুল থেকে এবার ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল, মুখ টিপে হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। তারপর থেকে ললিতাই এখন রোগ-জাহাজের কর্ণধার···সেই শুনিয়ে দেয় সকলকে রেডিওর মত প্রতিদিন সকালবেলা আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি : কাঁচা, পাকা, ঘিনঘিন ইত্যাদি।

. এদিকে দোতালায় অফিস ঘরে চলে দুই ম্যানেজারের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি ও বিদ্বেষ। দু'বেলা বাজার করার ব্যাপার নিয়ে তাল পাকিয়ে ওঠে ঝগড়া…বাজারটা ভালো হওয়া চাই তো? না হলে বোর্ডাররা খাবে কি? ওদের যা তা খাওয়ালে তো তিনদিনেই শিকেয় উঠে যাবে ব্যবসা।

আড়ালে অম্বর বলে, প্রণতিটা বাজার করার কি জানে? দেশে আমাদের বাড়ীর ঠিক গায়ে বসে সাহাদের বাজার, বাজারের ওপরেই আমাদের বাড়ীর আঁতুড় ঘর…সেইখানে, একেবারে বাজারের মধ্যেই আমার জন্ম। সেই জন্ম ইস্তক জানলা দিয়ে দু'বেলা বাজারকে আমি ষ্টাডি করেছি…সেই জন্যেই তো বেশী লেখাপড়া হ'ল না।…

রেস্তরাঁর ইনচার্জ্জ ধরণী সব ক'টা দাঁত বার করে হাসে…হেঁ, হেঁ, কতরকমের ষ্টাডি করবেন বলুন একসঙ্গে?

প্রণতিও অমনি আড়াল খুঁজেই কথা বলে, অম্বরটা তো বাজারে যায় শুধু পকেট ভারী করবার জন্যে…তা না হলে ও যে পয়সায় বাজার করে আনে, তাতে আমি কলকাতায় দশটা বাজার বসিয়ে দিতে পারি।

একজন বাজার করার কাজটা একবার হস্তগত করতে পারলে জোঁকের মত কামড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই সহজে ছাড়তে চায় না। অপরপক্ষকে অনেক নুন খরচ করতে হয় অনেকদিন ধরে…বহু লাগানি ভাঙানি…বহু কারসাজী করে, বাজারের ব্যাপারে অনেক গলদ সৃষ্টি করে, অনেক নালিশ পৌঁছে দিতে হয় ছাতের ওপর কাঁচা-পাকার কাছে। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, তবে পাওয়া যায় মালিকের কাছে বদলি হবার হুকুম।

দু'জনকে লুকিয়ে দু'জনের খাওয়াদাওয়া চলে, অপরপক্ষ দেখতে পেলেই তক্ষুনি ছাতের ওপর চলে যাবে টেলিগ্রাফের খবর। দু'খানা টোষ্টের জয়গায় চারখানা টোষ্ট, একটা চপের বদলে চারখানা চপ। আদ্ধেক চিবিয়েই টপ্ করে গিলে ফেলে, কাছাকাছি পায়ের শব্দ শুনলে। সতেরো নম্বর ঘরের জন্যে মুর্গী রান্না হয়েছে…দু'জনেই ধরণীকে গোপনে ডেকে হেসে, চোখ টিপে, ফিস্ ফিস্ করে বলে যায়…বাকীটা সবটা

আমাকেই দিও, বুঝলে ?···ওকে ওরকম করে ভাল খাবার খাইয়ে নাই দিওনা, একেবারে মাথায় চড়ে বসবে।

তারপর এলো ললিতা, ছাতের ওপর বেণী দুলিয়ে দুম দুম করে ঘুরে বেড়ায়। পরে তাকে নিয়েও অনেক ছিল রেষারেষি এই দুই ম্যানেজারের মধ্যে···কিন্তু, এখন থাক সে কথা।

ছাব্বিশ নম্বর ঘরে ভালোবাসার হাসপাতাল। খৃষ্টপূর্ব্ব সেদিন সকালবেলা রুগী দেখছেন। রুগী হোটেলেরই বোর্ডার, সেদিন এসেছেন বহরমপুর থেকে। বহুদিনের অজীর্ণ রোগ, কিছুতেই বাগ মানেনা, অনেক ডাক্তার, বদ্যি, দৈব সত্ত্বেও। তাছাড়া আজ কিছুদিন থেকে একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে, মনে হয় যেন বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং দিনে-রাত্রে যতবারই ঢেঁকুর তোলেন, মনে হয় ঢেঁকুরে যেন পাঁপর ভাজার গন্ধ।

ম্যানেজারের কাছে শুনেছিলেন খৃষ্টপূর্ব্বর চিকিৎসার কথা। কৌতূহলের বশে খৃষ্টপূর্ব্বর সঙ্গে আলাপ করেছেন, এবং আজকের এই বৈঠকের জন্যে খৃষ্টপূর্ব্বকে দশটাকা ফি দিতে রাজী হয়েছেন।

এই হ'ল খৃষ্টপূর্ব্বর প্রথম লক্ষ্মী রুগী···যদু মুদীর চিকিৎসা করেছেন বটে, তবে সে একটু পাটালির ওপরেই সেরে দিয়েছে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে করে একটা কাগজে লিখে নিচ্ছেন : আপনার পুরো নামটা কি ?

—লোভজিৎ দত্ত।

—জাতিতে ?

—কায়স্থ।

—পিতা মাতা জীবিত না মৃত ?

—দু'জনেই মৃত।

—কি করেন ?

—এখন কিছু করিনা, আগে একটা ইন্সিওর কোম্পানীর ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার ছিলুম।

—আরে, তাই নাকি ? হেসে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব ··ঠিক নামের মতই

কাজ করতেন তো? লোভজিৎ যে সেই তো ঠিক পারে ইন্সিওরেন্সের ও ব্যাঙ্কের কাজ করতে। লোভ দমন করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়?

লোভজিৎ ঘাড় নাড়েন···হ্যাঁ, তবে কোম্পানীর অনেকগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছিলুম।

চমকে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব···কত টাকা?

—তা প্রায় দশহাজার হবে।

চশমাটা নাকের ওপরে সোজা করে নেন খৃষ্টপূর্ব্ব,···তাহ'লে কেমন করে লোভ দমন করা হ'ল?

লোভজিৎ বলেন, টাকাটা আমি সন্ধ্যাতারার জন্যে খরচ করেছিলুম, সে ভারী সুন্দর গান গাইত। আমার লোভ টাকার ওপর ছিলনা, ছিল সন্ধ্যাতারার ওপর, আর তার গানের ওপর।

হঠাৎ এলো একটা দীর্ঘ সুগভীর ডুব। খৃষ্টপূর্ব্ব পেন্সিলটা নেড়ে নেড়ে দাঁত খিঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে, একাক্কার করে ফেললেন···বিড় বিড করে কি যেন বললেন কতগুলো কথা। তারপর আবার ফিরে এলেন ছাব্বিশ নম্বর ঘরে।···আপনার তো দেখছি বেশ ইণ্টারেষ্টিং কেস। দাঁড়ান, ব্যাহত ভালবাসার ফাইলটা দেখি···সুমুখের একটা লাল ফাইল টেনে পড়তে লাগলেন রমেশ ঘোষাল। একটু পরে বললেন, আপনারা কয় ভাই বোন?

—বোন নেই, তবে ছয় ভাই, আমি সেজো।

—বড়োর নাম কি?

লোভজিৎ মৃদু হেসে বল্লেন, ষড় রিপু জানেন তো?···সেই সব রিপুর সঙ্গে একটা একটা জিৎ লাগিয়ে আমাদের ছ'ভায়ের নাম।

হা হা করে হেসে ফেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব···আরে তাই নাকি? সব কটাই জিৎ?

আশ্বাস দিয়ে কথা বলেন লোভজিৎ, হ্যাঁ, এই দেখুন না বড়দার নাম কামজিৎ।

চেয়ারটার ওপরে পা দুটো তুলে উবু হয়ে বসলেন রমেশ ঘোষাল। বল্লেন, কামজিৎ? তিনি কি গার্লস কলেজে মাষ্টারী করেন?

—না, তিনি ঘোড়ার ডাক্তার।

বড় দুঃখ পেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব···এই দেখুন দিকি কি অসঙ্গতি···ঐ যে ইংরেজিতে কি বলে ? ··

লোভজিৎ উত্তর জুগিয়ে দেন, maladjustment.

খৃষ্টপূর্ব্ব হঠাৎ বাঁ দিকে তাকিয়ে যেন আঠায় জুড়ে গেছেন···কে যেন সুমুখে দাঁড়িয়েছে এসে, কে একটা মেয়ে, বেণী দুলিয়ে। এবারে, শুধু একটু হাসলেন খৃষ্টপূর্ব্ব, বিড়বিড় করে বললেন, ফণিনী···তারপর আবার বল্লেন, মেজোটি তো ক্রোধজিৎ—কেমন ? দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন কি তিনি ? সতীন আছে নাকি আপনার বৌদির ? একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারে যে সেই তো হ'ল ঠিক ক্রোধজিৎ··· আচ্ছা, মদজিৎ যিনি তিনি নিশ্চয়ই মদ খান না ?

—সে পাঁড় মাতাল। সে কি বলে জানেন ? বলে, গীতায় নাকি মদ খাওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে : 'মদভক্তো ভব'।

দু'জনেই হাহা করে হেসে ওঠেন। খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, তারপর মোহজিৎ ?···

তার রেসের মোহ, দিনরাত রেস খেলে আর শেষের যেটি মাৎসর্য্যজিৎ সে কিছু করে না, বসে বসে খায়, ভালো খাবার না হলে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে, ভালো খাবার খেতে আমি বাধ্য···আমি পূর্ব্বজন্মে রাজার ছেলে ছিলুম।

খুব সপ্রতিভ ভাবে কথা বলেন লোভজিৎ। বলেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ?···আমাদের ছ'ভায়ের ঐ যে শেষের তিনজন, ওরা মোটেই ভালো নয়। ভালো হলুম আমরা ওপরের তিনজন।

একটা বয়কে সঙ্গে করে ছাব্বিশ নম্বর ঘরে এসে দাঁড়ায় সুশান্ত।

এই যে নমস্কার রমেশদা।

সেদিন কলেজ স্কোয়ারে বিকেল বেলা খৃষ্টপূর্ব্বর কাছে আধুনিকা হোটেলের বিপ্লবী মেয়ে বিদ্যুৎএর কথা শুনে পর্য্যন্ত, সুশান্তর মনটা রঙে রঙে ভরে উঠেছে। নিশ্চয় করে মনে হয়েছে, ঐ যে বিদ্যুৎ, ঐ হ'ল বেলা, ও বেলা ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। সেদিনই প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল আধুনিকায় খোঁজ করবার, তারপর আজ কয়েকদিন ধরে নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে সুশান্ত। যত হয়েছে দুর্দ্দম বাসনা

বিদ্যুৎ-এর সঙ্গে দেখা করবার, ততই সে নিজের মনকে ফিস্ ফিস্ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কি দরকার নিজে গিয়ে দেখা করবার? তার তো নিজের এমন কোন গরজ নেই যে সারা কলকাতা খুঁজে খুঁজে বেলাকে টেনে বার করতে হবে? তার গয়না, টাকা তো সুলতা তুলেই রেখেছে ভাল করে···যেদিন বেলার নিজের প্রয়োজন হবে, সেদিনই আবার দেখা হবে, সেদিন তার গচ্ছিত গয়না টাকা ফেরৎ দিয়ে গঙ্গা স্নান করে আসবে ওরা দু'জনে, সুশান্ত আর সুলতা।···

কি এমন পরম শ্রেয় ও প্রেয় বেলা, যে সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে তার খোঁজে ঘুরতে হবে দিনরাত্তির? আর তাছাড়া বলাকা সেজে সুলতাকে সেদিন টেলিফোন করে ইয়ারকি করার গল্পটা সব শুনেছে সুশান্ত। শুনে সত্যি সত্যি রাগ হয়েছিল সুশান্তর। যে দেখা করতে পারে না, সে অমন নির্লজ্জের মত টেলিফোন করে অত বেহায়াপনা করে কেন সুলতার সঙ্গে? তার ওপরে আবার মদ খাবার কথা বলছে। সাধ করে কি রাগ করেছে সুলতা? আজ ক'দিন ধরে বারবার বেলার কথা ভেবেছে সুশান্ত, আর বারবার রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ রিরি করে উঠেছে।

তবু মনের অতল একটা দিকে রঙে রঙে ভরে গেছে সমস্ত আকাশটা। জল আনতে গিয়ে কদমতলায় দেখা হয়ে যাবার বড়ো ইচ্ছে করে, বড়ো ভয় করে, যদি সত্যিই দেখা হয়ে যায়। সুশান্তর ছেলেবেলার একটা গান কেবলই মনে পড়ে যায় আজকাল: 'ভয়ে ভয়ে থাকি যদি দেখা পাই।'···

খৃষ্টপূর্ব্ব একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন, আরে এসো এসো··· তুমি তো আর এলেই না সেদিন থেকে। তারপর লোভজিৎকে বিদায় করে দিলেন রমেশ ঘোষাল; আবার সন্ধ্যেবেলা বসা যাবে'খন··· আপনার তো জটিল কেস, সময় দিতে হবে। তারপর আবার একটু তলিয়ে গেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব···পরে বল্লেন লোভীজিৎকে, ভয় নেই, সন্ধ্যেবেলার জন্যে আর আপনাকে টাকা দিতে হবে না···আচ্ছা, আচ্ছা, বলে প্রসন্ন মুখে লোভজিৎ ছাব্বিশ নম্বর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

পাশের চেয়ারে বসে পড়ে সুশান্ত। খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, বিদ্যুৎকে তোমার কথা বলেছি, সে তো তোমাকে চেনে! আমি তো শুনে অবাক, ভাবলুম লুকিয়ে লুকিয়ে এ জানাশোনা আবার কবে করলে সুশান্ত···আমরা তো কিছু খবর পেলুম না? আমি হলে কিন্তু একরম ডুবেডুবে···

সুশান্ত বাধা দেয়, আমার কথা কি বললে বিদ্যুৎ? খৃষ্টপূর্ব্ব চেয়ারে বসে বসে যেন অনেকদূর চলে গেলেন। আবার একটু চোখ পাকালেন, দাঁত খিঁচোলেন, আবার নাড়লেন ঘাড়টা···তারপর হাতের পেন্সিলটা দিয়ে ঠক্ করে একটা শব্দ করলেন টেবিলের ওপর। ভাবটা যেন কাকে ফাঁসীর হুকুম দিয়ে দিলেন। তারপর সুশান্তর দিকে চেয়ে ঠোট দুটো উঁচু করে শিস্ দিতে লাগলেন একমনে। সুশান্তর মনে হ'ল যেন খৃষ্টপূর্ব্বর মুখখানা এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভয় হ'ল, ভাবাবেশে শেষ পর্য্যন্ত সুশান্তকে চুম্বন না করে ফেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। যাক, সে ভয়টা কেটে গেল। খৃষ্টপূর্ব্ব বল্লেন, অনেক দিন আগে একটা চন্দনা পাখী কিনেছিলুম,···পাহাড়ী চন্দনা। তার কানের কাছে শিস্ দিয়ে দিয়ে তাকে শিস্ দিতে শেখাতুম। যখন শিস্ দিতুম, তখন সুন্দর একটা ভঙ্গী করে পাখীটা মাথা নীচু করে শুনতো আমার শিস্ দেওয়া। সেদিন তোমার কথা যখন বলছিলুম, তখন কান পেতে এমন তন্ময় হয়ে বিদ্যুৎ শুনলো কথাগুলো, যে তাকে দেখে সেই চন্দনার চেহারাটা আমার চোখের সুমুখে একেবারে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠলো। সব শুনলে। শুনে বললে, আমি তাঁকে জানি, দিদির কাছে তার কথা অনেক শুনেছি।

অস্থির হয়ে ওঠে সুশান্ত, দিদির কাছে শুনেছে? তাই বলছে নাকি ও? তাহ'লে বেলা কোথায় গেল?···

খৃষ্টপূর্ব্বর সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হয়ে শক্ত হয়ে গেছে···আবার এসেছে একটা ভাব-সমাধি। সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, বেলা? বেলা তো মারা গেছে!

সুশান্তর মাথার ওপর যেন একটা আকাশটা ভেঙে পড়লো···বেলা মারা গেছে!

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, বেলা তো অনেকদিন ছিল টালিগঞ্জের বাড়ীতে, তারপর একদিন নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল। একটা ঢোঁক গেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব, বেলার নীচের ঠোঁটে ছিল ছোট্ট একটা কালো তিল, সেটাকে উপলক্ষ করে একদিন লিখেছিলুম একটা কবিতা :

কোন্ পিয়াসীর দগ্ধ হৃদয় বুঝি
তোমার অধরে তিল হ'য়ে গেছে কালো।...

গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে সমাধি ভাঙাবার চেষ্টা করে সুশান্ত। বলে, বিদ্যুৎ কি বেলা নয়?

—না ও তো বিদ্যুৎ।

সুশান্তর গলা পর্য্যন্ত ঠেলে আসে কি যেন একটা উচ্ছ্বাস, তাহ'লে বেলা কোথায় গেল?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, বেলা? বেলা তো মারা গেছে নিউমোনিয়া হয়ে। সে মারা যাবার পর কি লিখেছিলুম জানো?—লিখেছিলুম :

ফুল দিও, ভুল দিও, জ্বেলে দিও বহ্নি,
হায় প্রিয়, মুছে ফেলো চিহ্ন!

সুশান্ত অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, না,না, ও হ'ল অন্য বেলা! তারপর এক মুহূর্ত্ত কি একটা ভেবে নিয়ে বলে, বিদ্যুৎ কত নম্বর ঘরে থাকে? চলুন না আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখে আসি বিদ্যুৎ ঘরে আছে কিনা...বলে, সোজাসুজি পঁয়ত্রিশ নম্বরের উদ্দেশ্যে সিঁড়ি দিয়ে তেতালায় উঠে যান।

দ্বিধা থরোথরো কাঁপে বুঝি বুকে প্রতিমুহূর্ত্তখানি। চুপ করে একলা বসে থাকে সুশান্ত। অপূর্ব্ব আনন্দবেদনাময় সংশয় মনটাকে জোরে জোরে দোলা দিচ্ছে—বেলা থেকে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ থেকে বেলার কাছে। দিদির কাছে সুশান্তর কথা শুনেছে?...এ তাহ'লে কি সত্যিই বেলা নয়? ভাইবোনের কথা বেলা বলেছিল বটে, কিন্তু সুশান্তর যতদূর মনে পড়ে, যেন ছোট ছোট শিশু ভাইবোনের কথা বলেছিল। অথচ খৃষ্টপূর্ব্বর কাছে সে বিদ্যুৎ-এর বয়েসের কথা যা শুনেছে তাতে তো তাকে শিশুর

পর্য্যায়ে মোটেই ফেলা যায় না। তাছাড়া চেহারার বর্ণনাটা তো একেবারে হুবহু বেলার চেহারার মত। এদিকে বিদ্যুৎ নাকি বলেছে খৃষ্টপূর্ব্বকে, সুশান্তর কথা শুনেছে সে দিদির কাছে ··না, সুশান্ত কিছু বুঝতে পাচ্ছে না, সবটা যেন কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কেবল লাগছে ঝোড়ো বাতাস প্রদীপটার গায়ে···কেবল কাঁপছে থরথর করে বিদ্রোহী শিখাটা ··

ফিরে আসেন খৃষ্টপূর্ব্ব···না হে, বিধি বাম, পাকা আম খেয়ে গেছে শেয়ালে ··বিদ্যুৎ তো এখন নেই, সকালবেলা বেরিয়ে গেছে। চলো না শিবানন্দ বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, দেখবে তিনিও অদ্ভুত, তাঁরও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

শিবানন্দ বাবু রণেনের সঙ্গে কথা কইছিলেন···সেই সময় খৃষ্টপূর্ব্বর সঙ্গে সুশান্ত গিয়ে ঢুকলো পঁচিশ নম্বর ঘরে। সুশান্তকে দেখে প্রসন্ন হাসিতে শিবানন্দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। দু'হাত একত্র করে সুশান্তর নমস্কারের উত্তর দিলেন। চেয়ারের দিকে হাত দেখিয়ে বল্লেন, বসুন।

আগেকার কথাই চলতে লাগলো। শিবানন্দ বাবু বললেন, আশ্চর্য্য কথা এই যে, আজকের দিনে সমস্ত পৃথিবীতে চলেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ···অথচ এটা হবার কথা নয়, এটা পিতা-পুত্রের মধ্যে বিবাদ হবার মতই নিদারুণ দুঃখ ও লজ্জার কথা।

খৃষ্টপূর্ব্ব ও সুশান্ত দু'জনে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে পড়েছে। রণেন যেন বিদ্যার্থীর মত মাথা নীচু করে পরম বিনয়াবনত চিত্তে, ছায়াচ্ছন্ন মুখে, শিবানন্দের কথাগুলোর মর্ম্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

সুমুখের টেবিলের ওপর রয়েছে একটা শাদা গোলাপ ফুল, এবং তার পাশে 'ওঁ' লেখা একটা পেতলের ধূপদানীতে জ্বলছে একজোড়া ধূপ কাঠি।

শিবানন্দ আবার বলেন, রাষ্ট্রকে সমাজই করেছে সৃষ্টি। বিরাট জনতা থেকে মুষ্টিমেয় লোককে নির্বাচন করে সমাজ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রীয় যত কিছু কাজকর্ম্ম পরিচালনা করবার ভার ও ক্ষমতা সমাজ দেয়

সেই রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু আজ বিশ্বজগতে সমস্ত দেশেই এই সমাজের তৈরী রাষ্ট্র সমাজকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলবার চেষ্টা করছে। সংবাদিকেরা কোরিয়াতে এ্যামেরিকান, বৃটিশ ও কোরিয়ান সৈন্যদের প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন যে তারা যুদ্ধ করতে চায় না, নিজের ইচ্ছেয় যুদ্ধ করছে না, এবং জানে না কিসের জন্যে যুদ্ধ করছে। গত দুটো বিশ্বযুদ্ধের সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথাটাই সত্যি যে, সমাজ যুদ্ধ চায়নি, যুদ্ধ করিয়েছে ঐ রাষ্ট্র-গোষ্ঠী···যাকে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি **ruling class.**

রণেন প্রশ্ন করে, তাহ'লে উপায় কি ?

শিবানন্দ হাসেন। বলেন, উপায়টা যে ঠিক কি সেটা পরিষ্কার করে বলা খুব কঠিন। সমাজ না হলে রাষ্ট্র চলে না, আবার রাষ্ট্র না হলে সমাজ চলবার উপায় নেই। অথচ বহিপ্রকৃতিতে দেখা যায়, যে ছোট সে একলা কখনো তার চেয়ে অনেক বড়ো যে তাকে গ্রাস করতে পারে না ; কিন্তু এখানে ঠিক সেইটেই সংঘটিত হচ্ছে চতুর্দ্দিকে···ছোট রাষ্ট্র বড়ো সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে একলা।

একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলেন শিবানন্দ···যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। বিরাট দম্ভের সঙ্গে রাষ্ট্র চীৎকার করে বলছে, সত্যকে আমিই উপলব্ধি করেছি, আমিই ঠিক বুঝি তার স্বরূপ, অতএব আমিই সমাজের ভাগ্য-বিধাতা। আমি যেটা চাইবো সেটাই হবে, সেটাই মেনে নিতে হবে সমাজকে।

শিবানন্দ বাবু একটু থেমে আবার রণেনকে বললেন, আমি সেদিন তোমাকে বলছিলুম, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে, সত্যাশ্রয়ী হতে হবে···যে সত্যিকারের বড়ো তাকে বড়োর আসন দিতে হবে, বড়ো বলে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিতে হবে তাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ যাই থাকুক, যে বড়ো, যে প্রথম, তার হাতে দিতে হবে বড়ো ও প্রাথমিক শক্তি ··স্লোগান বদলাতে হবে, জোর দিয়ে ভাবতে হবে ও চীৎকার করে বলতে হবে নতুন স্লোগান : রাষ্ট্র চাই না. সমাজ চাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব বলে ফেল্লেন, শুধু ভাবলেই, শুধু চীৎকার করলেই হবে কি উপায় ? যে কোন অবস্থাতেই হোক রাষ্ট্রকে চাই তো আমাদের ?

আবার হাসেন শিবানন্দ বাবু, আগে আসন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, উপলব্ধ মন্ত্র শ্রদ্ধা করে জপ করতে হবে···তবে আসবে শক্তি, তবে আসবে কর্ম্ম···ভেবে দেখতে হবে, কেমন করে হবে এই সমাজের বন্ধন-মুক্তি, চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মণের গণ্ডী টেনে দিয়ে কেমন করে হবে এই মদোদ্ধত রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্ধারণ করা। হয়তো বিকেন্দ্রীকরণই হবে এই বিশ্বব্যাপী শক্তিশেলের বিশল্যকরণী; তবুও ঐ বিকেন্দ্রীকরণের রূপটাকেও ঠিকমত উপলব্ধি করে নিতে হ'বে আমাদের। আবার খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে শিবানন্দ বাবু বলেন, এখনকার বড়ো প্রশ্ন হ'ল সাম্প্রতিক সমস্যা। যে রকম করেই হোক চতুর্দ্দিকের ক্রমবর্দ্ধমান বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করা। যে বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে পৃথিবীতে তাকে সম্যকভাবে ধারণ করা, এবং সত্যাশ্রয়ী হয়ে পরে তাকে মঙ্গল ও কল্যাণের রূপ দান করা।···শপথ গ্রহণ করতে হবে, সংগঠন করতে হ'বে প্রথমে প্রেম ও অহিংসার পথে, তারপর তাতে না পারলে, যেখানে মানবতা-ধর্ম্ম ক্লিষ্ট হবে, সেখানে প্রয়োজন হলে হিংসার পথ দিয়েও শক্তিসঞ্চয় করতে হবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে অশিব শক্তির সঙ্গে নির্ম্মম যুদ্ধ। গত যুদ্ধের শেষে এ্যামেরিকা ও বৃটেন আমাদের দেশে গৃহযুদ্ধের বীজ বপন করে গেছে, ঘরে ঘরে টলিয়ে দিয়ে গেছে মানুষের মনকে, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে আমাদের দেশে অনেক গুলি-গোলা, বন্দুক, অনেক আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্র সব চাই আমাদের, অনেক টাকা চাই, অনেক চাই দুর্দ্ধর্ষ মন্ত্রাশ্রয়ী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কর্মী।···

সুশান্ত চুপ করে বসে বসে শুনছে। মানুষের মন, মানুষের চোখ কতটুকু গ্রহণ করতে পারে ? অসীমকে অন্ততঃ আংশিকভাবেও উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে দাঁড়াতে হয় সমুদ্রতটে গিয়ে। ধুধু প্রান্তরকে যেখানে আকাশ স্পর্শ করেছে, সেই দিগন্তের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে হয়, উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখে নিতে হয় নীচের বহুদূর বিস্তৃত পৃথিবীটাকে। সমগ্র হিমালয়কে কে পেরেছে

দু'চোখ দিয়ে একসঙ্গে উপলব্ধি করতে? তবু সেদিন আসন্নপ্রায় মধ্যাহ্নে শিবানন্দের সুমুখে চেয়ারে বসে বসে সুশান্তর কেবলই মনে হতে লাগল, সে যেন আজ জীবনে প্রথমবার সমস্ত হিমালয়কে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব একটা ভাবসমাধি থেকে জেগে উঠে বোকার মত হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, আমাদের দেশ কি কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে?

শিবানন্দ জোরে হাহা করে হেসে ওঠেন। কি-'ইজম্' আসবে সেটা বড়ো কথা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জনকল্যাণ আসবে কিনা সেটাই হ'ল আসল কথা। তবে আমার মনে হয় জড়বাদ ভারতবর্ষ কখনই গ্রহণ করতে পারবে না। শুধু ভারতবর্ষ কেন, কোন দেশ কোন জাতিই শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে পারবে না কম্যুনিজমের জড়বাদকে।...

খৃষ্টপূর্ব্ব জিজ্ঞেস করেন, কেন পারবে না?

শিবানন্দ আবার হাসেন। বলেন, আপনি দার্জ্জিলিং গেছেন? দার্জ্জিলিং-এর ওপরে আছে ঘুম...সেই ঘুমের দেশ পর্য্যন্ত যে পৌঁচেছে, সে কি কখনো শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে এসে, শিলিগুড়িকেই সকলের চেয়ে উঁচু বলে মেনে নিতে পারে? কম্যুনিজম্ হ'ল ঐ শিলিগুড়ির কথা...আমাদের দেশ ঘুম কেন, গৌরীশঙ্করে পৌঁছে তার রূপকে উপলব্ধি করেছে একদিন। একটা ঢোঁক গেলেন শিবানন্দ...জানেন রমেশবাবু, মানুষ পাঁক থেকে উঠে পদ্মে পৌঁছে গেছে অনেকদিন আগে...তবে পদ্মকে ভাল রাখতে গেলে পাঁকটাকেও সুস্থ করে রাখতে হবে। আজকের মানুষ আবার যেন পাঁকে নেবে এসেছে পাঁককে বিশুদ্ধতর পবিত্রতর করে নেবার জন্যে...আধারটা ভাল না হলে অপব্যবহৃত দেহে আত্মা হয়ে পড়ে ক্লিষ্ট, মোহাশ্রিত; পাঁকটা দুষ্ট হলে, পদ্মও হয়ে পড়ে ক্ষুণ্ণ, ব্যাধিজর্জ্জর। শুধু এই দিক দিয়ে আমি আজকের জড়বাদের এই সাময়িক বিস্তৃতিকে বুঝতে পারি।...

তর্ক করেন খৃষ্টপূর্ব্ব...কিন্তু জগতের এই অর্থনৈতিক অসাম্য...এই মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার অতিপ্রাচুর্য্যের অপচয় ও বহুর অনশন অর্দ্ধাসন এটার তো একটা উপায় চাই?...

ঘাড় নাড়েন শিবানন্দ, হ্যাঁ, সেটা তো চাই-ই, সেটা তো জনকল্যাণের প্রাথমিক, অতিআবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য উপচার; কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি, শুভকামনা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকলে জড়বাদী ছাড়া যে কোন অন্য সমাজব্যবস্থার মধ্যেও ঐ সাম্য সৃষ্টি তো অসম্ভব নয়। ঐ সাম্যকে সম্ভব করবার জন্যে কম্যুনিজমের জড়বাদ গ্রহণ করবার তো কোন প্রয়োজন নেই। তারপর রণেনের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন শিবানন্দ, তোমাদের তো সেদিন এই কথাই বলছিলুম—এদেশে আধ্যাত্মবাদী হয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়ে, আমরা কম্যুনিজমের বাকীটুকু আনন্দমনে গ্রহণ করতে পারবো…এখানকার কম্যুনিষ্ট হবে বৈদান্তিক, জড়বাদী নয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, কিন্তু ওরা, কম্যুনিষ্টরা তো ব্যক্তিকে মোটেই মানতে চায়না।…

শিবানন্দ বাবু উত্তর করেন: ওরা মানেনা তা জানি, কিন্তু এও জানি যে তারা প্রকাণ্ড ভুল করে। ওরা বলে, সমাজের জন্যে ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তির জন্যেও কি সমাজ নয়? সকালবেলা সূর্য্য উঠলেই, মানুষের পেছনে পড়ে তার ছায়া…সেটা তার নিজের ছায়া…সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস, সেটা সমাজের ছায়া নয়। তার নিজের ছায়া নিজের কায়া মেনে নিলে তবে আসে সমষ্টির কথা। ওরা বলে, সমষ্টি থেকে পৃথক করে দেখলে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই…একেবারে ভুল কথা…এর চেয়ে বড়ো ভুল আর কিছু হতে পারেনা। সৃষ্টি করে ব্যক্তিই চিরদিন, সমষ্টি কোনদিন সৃষ্টি করে না—ব্যষ্টি সৃষ্টি করে, আর সমষ্টি ভোগ করে তার ফল। তারপর জাগে যেদিন সমষ্টির অহঙ্কার, সেদিন সে মদোদ্ধত হয়ে নিজে থেকে সৃষ্টি করতে যায়, ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অস্বীকার করে…সেদিন জাগে পৃথিবীতে সংঘর্ষ, সেদিন আসে পৃথিবীতে সমষ্টিগত পাপ ও সমষ্টিগত সংহার। এদেশে যেমন বৌদ্ধযুগের শেষের দিকে হয়েছিল • যেমন আজকে হচ্ছে।…

কি একটা ভেবে হাহা করে হাসেন শিবানন্দ…জানো রণেন, ওরা চায় সমষ্টিগতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করতে—সমষ্টিগতভাবে গান গাইতে, ছবি আঁকতে, ধ্যান করতে…দেখছোনা আজকাল চতুর্দ্দিকে নানা

লেবেলের সাহিত্য-সঙ্ঘের সৃষ্টি হচ্ছে···কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ, কম্যুনিষ্ট সাহিত্য-সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা সাহিত্য-সঙ্ঘ। ফলে কলালক্ষ্মী ত্রাহি ত্রাহি বলে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে থাকেন শিবানন্দ। পরে বোধ হয় অকস্মাৎ কি একটা কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। চোখ খুলে রণেনকে বলেন, তোমার ক'টায় ট্রেন ?

রণেন বলে, দেড়টায়।

শিবানন্দ ব্যস্ত হয়ে বলেন—তাহ'লে আর দেরি কোরোনা, এবার উঠে পড়ো তুমি। দিল্লী পৌঁছে ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করো, তারপর সেখানে যেও। ত্রিবেদীকে বোলো কিছু যেন হাতছাড়া না করে। বোলো, শীগ্‌গিরই প্লেনে করে সব মাল নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে পারা যাবে। তারপরে পথে যাদের সঙ্গে দেখা হবে সবাইকে বোলো, যত পাওয়া যায় সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের হস্তগত করা চাই-ই।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যায় রণেন। খৃষ্টপূর্ব্বও ইতঃপূর্ব্বে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

একলা বসে সুশান্ত, আর তার সুমুখে সমগ্র হিমালয়। শিবানন্দ হাসেন। বলেন, তোমাকে আমি জানি···বেলার কাছে এত কথা শুনেছি তোমার সম্বন্ধে যে তারপর থেকেই তোমাকে পরমাত্মীয় বলে মনে হয়েছে, তাই তোমার সুমুখে রণেনকে অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলতে দ্বিধা করলুম না, তাই তোমাকে তুমি বল্লুম···মনে কষ্ট পেলে না তো ?

সুশান্ত উত্তর দেয়, না, না, কষ্ট পাবো কেন ? আমাকে আত্মীয় ভেবেছেন এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। একটা ঢোঁক গেলে সুশান্ত। কি যেন গলা পর্য্যন্ত ঠেলে আসছে···বেলা, বেলাদেবীকে তো দেখছি না ?···

আজ ছ'সাত দিন আগে সে প্লেনে করে এ্যামেরিকা চলে গেছে। এ খানে এখন আছে বিদ্যুৎ, তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?

সুশান্ত বলে, না। শিবানন্দ বলেন, সে আজ সকালে কামারহাটী গেছে একটা শ্রমিকদের সভায়। ফিরতে হয়তো রাত্তির হবে। কাল এসো না সকালে, আলাপ করিয়ে দেবো। বেলার কাছে সব কথা শুনে সেও তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে।···

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুশান্ত বলে, না, না, আমার মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত তো কিছু নেই···চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শিবানন্দের সুমুখে। কপালে দু'হাত এক করে নমস্কার করে বলে, আচ্ছা এখন তা'হলে যাবার অনুমতি দিন···কাল সকালে এসে বিদ্যুৎ দেবীর সঙ্গে আলাপ করে যাবো।

—নয়—

আজ ক'দিন থেকে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে একদল স্ত্রী-পুরুষ ঠেলা-গাড়ী করে মাটি নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে: বাঙলার মাটি···বাঙলার মাটি।··· 'বাঙলার মাটি সমবায় সমিতি' গঠিত হয়েছে। কলকাতায় কাঁচা মাটির প্রচুর বিক্রি আছে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঐ কাজ করলে প্রভূত মুনাফা হওয়া সম্ভব। এই নিয়ে সুশান্ত নিজে চেষ্টা করে বাঙলার মাটি সমিতির সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজি কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়েছে, অনেক বিলিয়েছে হ্যাণ্ডবিল। মধুদের বস্তির প্রায় সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ অংশীদার হয়ে গেছে ঐ সমবায় সমিতির। মধুর মা শুভা দেবীকে সুশান্ত কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়েছে; তিনি বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ ভালই জানেন। সুশান্ত নিজেও দেখে, তাছাড়া সুলতা প্রায় প্রতিদিনই এসে মধুর মাকে সাহায্য করে যায়।

ইতোমধ্যে মধুর বাবা হরিশ বাবুর পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যু হয়েছে। মা ও ছেলের ভার সুশান্ত নিজেই নিয়েছে নিজের হাতে। মধুকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছে এবং বিধবা শুভাকে জুটিয়ে দিয়েছে দেশ সেবার কাজ। তাকে বুঝিয়েছে বিশ্বকে সেবা করার কাজ তাঁকে তাঁর নিজের মেয়ে সেবাই দিয়ে গেছে সেদিন, সেই যেদিন তার ঠোঁট দুটো একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে বলে গেছে চুপি চুপি, আরও অনেক সেবা ওর চেয়েও বেশী নীল ঠোঁট নিয়ে ঘরে ঘরে প্রতিদিন মরছে রোগে, দারিদ্র্যে, অনশনে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সেদিন শুভা নিয়েছে সুশান্তর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে···সে পারবে কি অতবড় কাজ করতে, দ্বিধা কম্পিত স্বরে দাদাকে জিজ্ঞেস করেছে শুভা।

শুভা সুশান্তকে দাদা ও সুলতাকে বৌদি বলে ডাকে। ননদ-জায়ের মধ্যে জেগেছে বেশ প্রগাঢ় ভালোবাসা। আমাদের নেপোলিয়ান মধু মামা-মামীকে খুসী করবার চেষ্টায় সব সময়ে ব্যস্ত থাকে। ওরা মধুর বাড়ীতে গেলে মামা-মামীকে একটু মিষ্টি, একটু কমলালেবু, একটু চা খাওয়াবার জন্যে আড়ালে বার বার মনে করিয়ে দেয় মাকে, মার চেয়ে অনেক বেশী অস্থির হয়ে ওঠে মধু। প্রথমদিন মামীমা খেতে চাননি বলে মার চোখে ভরে এসেছিল জল···মধুও দেখেছিল, মামীও দেখতে পেয়েছিলেন, মামা সেদিন আসেন নি। ব্যস্ত হয়ে শুভার হাত ধরে সুলতারও প্রায় এসে গিয়েছিল কান্না। চেষ্টা করে হেসে বলেছিল, তুমি কিন্তু আশ্চর্য্য করলে শুভা ঠাকুরঝি, এরই মধ্যে চোখে জল এসে গেল তোমার? এখনও তো লেবুর খোসার রস দিইনি চোখে?···

সেদিন থেকে ওরা এলেই খাবার চা খাওয়ায় শুভা। মধু ছুটোছুটি করে দোকান থেকে কিনে আনে জিনিবপত্তর। সুশান্তর খরচেই খাওয়ায় বটে, কিন্তু ও কথা বলবার একটু চেষ্টা করতেই সেদিন সুলতা হাত দিয়ে শুভার মুখ চেপে ধরেছিল। মাঝে মাঝে মনোও আসে মধুদের বাড়ী সুলতার সঙ্গে।

শিবানন্দ বাবুর ঘর থেকে সেদিন দুপুরবেলা বেরিয়ে সুশান্তর মনে পড়ে গেল, আজ বিকেল চারটের সময় বাঙলার মাটি সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির সভা বসবে মধুদের ছোট্ট ঘরটায়। সুলতা সভানেত্রী। বাড়ী গিয়ে খাবার সময় সুশান্ত সেদিন সুলতাকে বলেছে, খেয়েই সে একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যাবে, এবং সেখান থেকে সোজা যাবে সেবাদের বাড়ী সভার সময়। মনো যদি যায়, তাকে সঙ্গে করে সুলতা যেন সময়মত নিজেই চলে যায় সোজা সেবাদের বাড়ীতে।

বাঙলার মাটি সমিতির অংশীদার স্ত্রী ও পুরুষ দুই-ই আছে বটে, কিন্তু কার্য্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের হাতে—কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে কোন পুরুষ অংশীদার নেই। এ ব্যবস্থাটা সুশান্তই করিয়েছে আগ্রহ করে, প্রযোজক ও উপদেষ্টা হিসেবে শুধু সেই আছে একমাত্র পুরুষ কর্ম্মী কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মধ্যে। সে সবাইকে বুঝিয়েছে, লক্ষ্মীর কাজের ভার সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের হাতে—লক্ষ্মীর জাত এবং

মায়ের জাতের হাতেই অর্পণ করতে হবে, এবং তবেই চলবে ঠিকমত জনকল্যাণের কর্ম্ম।

শুভার আমন্ত্রণে সেদিন খিদিরপুরের জাতীয়তাবাদী স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্না মহিলা কর্ম্মী আফজল উন্নেসা কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন। ঘন নীল রঙ-এর একটা বোরকা দিয়ে ঢেকে এসেছেন আপাদমস্তক। বাইরে থেকে শুধু বড়ো বড়ো অপূর্ব্ব চোখ দুটো দেখা যায়।

সভাগৃহে এসেই খুলে ফেলেছেন বোরকা। লতা, মনো, শুভা সবাইকে বুঝিয়েছেন, তিনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান হলেও পরদার সম্বন্ধে পয়গম্বরের নির্দ্দেশ মেনে চলেন, তাই পথে-ঘাটে পুরুষদের সুমুখে বোরকা পরেন। এ সভায় সবলেই স্ত্রীলোক, অতএব বোরকা খুলে ফেলেছেন আফজল উন্নেসা।

শুভার ছোট্ট ঘরটায় যেন আলোর বন্যা বয়ে গেছে। মনোর মনে হয়েছে গণেশ-জননীর একটা খুব সুন্দর ছবি দেখেছিল সে একবার তার দেওরের কাছে···সুমুখের এই মুসলমান মেয়েটার রূপ ঠিক যেন সেই গণেশ-জননীর মত।

সুলতার প্রস্তাবে ও শুভার সমর্থনে নবাগতাকেই সেদিন সভানেত্রীর পদে বরণ করা হয়েছে। সুন্দর বিনয় ও সলজ্জ হাস্যে আফজল উন্নেসা পৌঁছে গেছেন ঘরের মধ্যিখানে সভানেত্রীর আসনে। মেঝের ওপরে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে ছোট্ট ঘরটায় বসেছে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ছোট্ট বৈঠক। সব মিলিয়ে প্রায় সাত আটজন সভ্যা, কিন্তু তাতেই ভরে গেছে সমস্ত ঘরটা।

সভানেত্রী প্রাথমিক বক্তৃতা দিচ্ছেন: আমাকে সভানেত্রী করার জন্যে আপনাদের সর্বান্তঃকরণে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে, এবার আনতে হ'বে সকলের জন্যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তি! সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন, এবং জনসাধারণের অর্থ উপার্জ্জনের প্রচেষ্টাকে পুঁজিদার ও মুনাফাখোরদের হাত থেকে রক্ষা করবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে যা নাকি আপনারা গ্রহণ করেছেন, যে পথে আপনারা করেছেন আপনাদের যাত্রা সুরু···যেটাকে এদেশে আমরা বলে থাকি সমবায়

সমবায়-আশ্রিত, গণতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই এখন আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং সেই আদর্শ সুমুখে রেখেই আমরা সৃষ্টি করে নেবো আমাদের নতুন কর্ম্মপদ্ধতি। সেই কর্ম্মের ফল-স্বরূপ আসবে আমাদের দেশে, এবং সমগ্র বিশ্বে কল্যাণ, প্রেম ও শান্তি।...

মধু পাশের দোকান থেকে একটা ট্রেতে করে এক কেট্‌লী চা ও গোটাকতক কাপ প্লেট নিয়ে এলো।

আফজলের বক্তৃতা এগিয়ে চলেছে : আপনারা মাটি নিয়ে আরম্ভ করেছেন এটাও আমার মতে খুব সুন্দর লক্ষণ। মাটিকে অস্বীকার করে মানুষকে পাওয়া যায় না, অথচ মানুষ শুধু মাটিই নয়,—বড়ো দিকের এটা যেমন একটা প্রকাণ্ড সত্যি কথা, তেমনি অঙ্ক কষার দিক থেকে দেখলেও বেশ বোঝা যায় এই এতবড়ো কলকাতা শহরে কত হাজার টাকার মাটি খরচ হয় প্রতিদিন, এবং এই কাজটা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করতে পারলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারা যাবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্ঘও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও সুন্দরভাবে বিস্তার লাভ করবে :...

রাজীব বাবু জমিদার। বালি খালের কাছে গঙ্গার ধারে প্রচুর জমি পড়ে আছে রাজীব বাবুর। ইঁটখোলা করবে বলে বহু ব্যবসায়ী তাঁর কাছে বহুদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে জমিটার জন্যে। রাজীব বাবু ধর্ম্মপ্রাণ লোক, তাঁর বিশ্বাস মাটি দগ্ধ করা পাপকর্ম্ম এবং সেই বিশ্বাসের বশে আজও কাউকে দেননি ইঁটখোলা করবার জন্যে। ইতিমধ্যে সুশান্ত রাজীব বাবুকে বাঙলার মাটি সমিতির অংশীদার করে নিয়েছে, এবং কলকাতায় বেশী মাটি সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয় বলে, যাতে কিছুদিন সমিতি বিনামূল্যে মাটি তোলবার অনুমতি পায় তাঁর জমি থেকে, সেই মর্ম্মে প্রস্তাব করেছে রাজীব বাবুর কাছে। বিনামূল্যে মাটি পেলে, কিছুদিন ঐরূপ বিনামূল্যে ট্রাক ও নৌকোর ব্যবস্থা করাও সম্ভব হতে পারবে, এবং বালি খাল থেকে সোজা চলে আসবে মাটি বিক্রীর জন্যে কলকাতা শহরে। রাজীব বাবু তো সম্মত হয়েছেন, তবে অন্দরমহলে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র বিধবা কন্যার কাছ থেকে ঐ ব্যাপারে একটু বাধা আসছে।

সে কথা সেদিন হাসতে হাসতে রাজীব বাবুই বলেছেন সুশান্তকে।
আজ খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা দমদমে রাজীব বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিল সুশান্ত, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের কাছে মাটির জন্যে দরবার করতে।

পূর্ব্বের সামান্য একটু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল বটে, তবু খুব সপ্রতিভ ভাবে কথা বললে রাজীব বাবুর বিধবা মেয়ে বহ্নি···মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এত নীচু ধারণা কেন? আমাদের কি আপনি কিছুই মনে করেন না?

এই রকম অপ্রত্যাশিত আক্রমণ একদিন বেলা করেছিল সুশান্তকে, অফিসে তার চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে। কেন দিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা?···কেন অমন করে অপমান করলেন আপনি? বহ্নির মুখে ঐ কথা শুনে হঠাৎ যেন সুশান্ত স্পষ্ট দেখতে পেলে রিভলভিং চেয়ারটাতে বসে বেলা দোল খাচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে।···

বহ্নি আবার বললে, বাবাকে মেম্বার করলেন আপনার সমিতির, অথচ আমাকে ও মাকে তো একদিনও বল্লেন না মেম্বার হতে। রাজীব বাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী আমি, বহ্নি···আমাদের মেম্বার না করলে এখান থেকে এক ছটাক মাটিও আমি কাউকে নিয়ে যেতে দেবো না।

রাজীব বাবুর স্ত্রী ও রাজীব বাবু নিজে হাহা করে হাসতে লাগলেন বহ্নির দু'পাশে, যেন আগুনের দু'পাশে হাহা করে ঝড় উঠেছে জেগে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাসতে লাগলেন অট্টহাসি, আর বলতে লাগলেন, শুনলে তো বাবা সুশান্ত, দেখলে তো মেয়ের কথার ছিরি।···

বহ্নি চুপ করে হাসে। বলে, জানেন সুশান্তদা এই বাবা মা-ই দু'জনে আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছেন। এগারো বচ্ছর বয়েসে তিন মাসের জন্যে বিয়ে হয়েছিল, তার মধ্যে শেষের দিন পনেরো শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম অসুখে সেবা করতে, তারপর থেকে এই পঁচিশ বছর বয়স হ'ল এই বাড়ীতেই আছি। এরা কি বলেন জানেন? গীতা পড়্, পূজো কর্, না হয় চল্ কাশীতে গিয়ে থাকি। আমি বলি, গীতা পড়লেই শুধু হবে? গীতার কাজ করতে দাও বাইরে বেরিয়ে। বাইরে বেরুবার কথা শুনলেই বাবা মা দু'জনেরই আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই আমি আপনাকে বলে রাখলুম, বাইরে বেরোবই আমি, ঠাকুর আমাকে বলছেন, ওরে বহ্নি বাইরে বেরো, বাইরে তোকে কেবলই ডাকছে হাত নেড়ে নেড়ে।···

একটু চুপ করে বহ্নি আবার বলে, এগারো বচ্ছর বয়সে যার গেল ঘর ভেঙে, বাইরেই তার আসল ঘর। তাকে কেবল বাবা মা বলবেন, ঘরে থাক্, পূজো কর্,···বাইরে বেরুস নি। শ্বশুরবাড়ীতে বাইরে বেরিয়ে, সেই বাড়ী থেকে অনেক দূরের শ্মশানে পাঠিয়ে দেয়নি বহ্নি মুখে আগুন ছুঁইয়ে তার স্বামীকে সব ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পথে? সেদিন থেকে বহ্নি জানে বহ্নির বাইরেই জায়গা···তা নয়, ঘরে থাক্, পূজো কর্, গীতা পড়্, ঘরে থাকলেই দুর্ব্বলতা আমার মনকে চেপে ধরে চতুর্দ্দিক থেকে।···বেশ তাই যদি করবো, ঘরকেই বড়ো করে মাথায় করে রাখবো,···বেশ, দাও তাহ'লে আবার নতুন করে বিয়ে।···

আবার হাহা করে হাসেন রাজীব ও তাঁর সহধর্ম্মিণী···দেখলে তো বাবা বহ্নির কথার ছিরি।···

সুশান্ত বলে, বেশ চলে আসুন বাইরে, কালই হয়ে পড়ুন আমাদের সমিতির সভ্যা।

দু'জনে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন স্বামী-স্ত্রীতে, রাজীবলোচন ও ক্ষমা। দাঁড়িয়ে ওঠেন দু'জনে: এগিয়ে যান বহ্নির দিকে। দু'জনে বহ্নির দুটো হাত ধরে একত্র করে দিয়ে দেন সেই হাত দুটো বিস্ময়াভি-ভূত সুশান্তর হাতে,···এই তোকে দিয়ে দিলুম তোর শান্তদাদার হাতে। মা ক্ষমা দেবী বলেন, একদিন দিয়েছিলুম স্বামীর হাতে, আজ আবার নতুন করে দিয়ে দিলুম দাদার হাতে। রাজীবলোচন বলেন, তোকে দিলুম আর তোর সঙ্গে দিয়ে দিলুম তোর শান্তদাদার হাতে, আমাকে ও তোর মাকে, আমাদের যা কিছু আছে সব, আমাদের তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। আর কখনো তোকে ঘরে থাকার কথা বলবো না বহ্নি···ঘর কতটুকু?···বাইরেটাই বড়ো, বাইরেটাই বিরাট। বেশ, বাইরেই পথের ধুলোর ওপর গ্রহণ করুন তোকে ভগবান।···

সেদিন বহ্নির বাড়ী থেকে বেরুতে কিছু দেরি হয়ে গেছে। তার

ওপরে পকেটের মধ্যে বহ্নি, রাজীবলোচন, ক্ষমা দেবী, ত্রিশলক্ষ টাকার ঘর বাড়ী, জমিদারী, এতগুলো ভারী ভারী জিনিস নিয়ে বাস্ ষ্টপ পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়া যেন দায় হয়ে এলো সুশান্তর। তারপর সারাটা পথ বাসে করে এসেছে, আর বারে বারে হাসি পেয়েছে এই কথা ভেবে যে, তার পকেটের ভারে বাসটাও যেন বেশ জোরে চলতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে যেন থেমে আসছে তার গতি।

মধুদের গলির সুমুখে মধুর সঙ্গে দেখা। মধু বল্লে, মামা, আফজল মাসী এসেছেন।

আফজল মাসী? তিনি আবার কে? জিজ্ঞেস করে সুশান্ত।

মধু বলে, আজ নতুন এসেছেন···আসুন না দেখবেন, ঠিক যেন রাণীর মত দেখতে।

সভানেত্রীর তখন শেষের বক্তৃতা চলছে: যে আশা নিয়ে আজ আমি যাচ্ছি এখান থেকে, মনের মধ্যে যে উদ্দীপনা নিয়ে,—আশা করি এমনি আশা ও উদ্দীপনা···সুশান্ত সভাগৃহে প্রবেশ করতেই আফজলের বক্তৃতা যেন অকস্মাৎ বিকল হয়ে-যাওয়া রেডিওর মত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। যেন দপ্ করে নিবে গেল প্রদীপটা। পলাশ গাছের মাথা থেকে হঠাৎ যেন উড়ে গেল হল্‌দে পাখীটা···তারপর হঠাৎ এলো একরাশ ঘননীল মেঘ, তার আড়ালে লুকিয়ে গেল চাঁদটা। আফজল তাড়াতাড়ি বোরকা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেল্লে।

সুলতা বুঝিয়ে দিলে: উনি পর্দানশিন, অপরিচিত পুরুষ মানুষের সুমুখে বেরোন না···তুমি আজকে সভায় উপস্থিত থেকো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বলে সুশান্ত বেরিয়ে গেল বটে, তবে তখন তার মুখের দিকে চাইলে সবাই বুঝতে পারতো যে শরীরের সমস্ত রক্ত গিয়ে ঠেলে উঠেছে তার মুখে।

সুশান্ত দেখতে পেলে তার চোখের সুমুখে ঘননীল বোরকায় যে মেয়েটা মুখ ঢাকলে সে বেলা।

—দশ—

পর্দানশিন আফজল উন্নেসার মর্য্যাদারক্ষা ও তার জন্যে স্বস্তিসৃষ্টি করে সভাস্থল থেকে সুশান্ত বেরিয়ে এল গলি দিয়ে বড় রাস্তার ওপরে। গলির মুখটা থেকে একটু দূরেই ছিল চায়ের দোকান "বসু কেবিন"। সেটাতে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লো সুশান্ত।—মুখের রক্ত নেবে গিয়ে এখন যেন কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখটা।

সচেতন মনটা থেকে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নেবে গিয়ে এখন সে যেন পৌঁছে গেছে অবচেতন মনের গুহার অতলে। সবার চেয়ে বড়ো এবং প্রবল হয়ে এই প্রশ্নটাই জাগছে মনে যে, শিবানন্দ বাবু কেমন করে মিথ্যেকথা বললেন। বেলা পাঁচ সাতদিন আগে প্লেনে করে এ্যামেরিকা চলে গেছে, এখন বিদ্যুৎ আছে এখানে, এই তো বলেছিলেন তিনি···তবে বেলা কি আজই ফিরে এসেছে আবার কলকাতায়? কিম্বা এমনও তো হতে পারে যে, বেলার কলকাতায় থাকার কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন আছে শিবানন্দ বাবুর···তিনি এবং তাঁর দল যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে ব্যাপৃত আছেন একথা তো শিবানন্দ ও রণেনের কথোপকথনে স্পষ্ট করেই জানতে পেরেছে সুশান্ত···আর তাছাড়া আফজল উন্নেসা হয়তো বেলা নয়, ও হয়তো বিদ্যুৎ। শেষের কথাটা মনে আসতেই হাসি পেলো সুশান্তর,··· তা কি কখনও হতে পারে? এতো বড়ো ভুল করা কি তার দ্বারা সম্ভব যে সে অন্য কাউকে বেলা বলে মনে করবে?

হোটেলের বয় বঙ্কু এসে জিজ্ঞেস করে—কি আনবো বাবু? গরম গরম ফাউল কাটলেট দেবো দু'খানা?

সুশান্ত বলে, দাও।

—একখানা ফাউল চপ? চিংড়ির কাটলেট একখানা? ডবল ডিমের মামলেট দেবো একটা?

সুশান্ত বিরক্ত হয়ে বলে, দাও, দাও, সব দাও।

বন্ধুর মনে হয় বাবু বোধ হয় একজন রামপেটুক…মিষ্টিও দেবো তো বাবু দু'খানা করে? একজোড়া ফুলকপির গরম সিঙ্গাড়া? হরিভোগ একটা?…

অন্যমনস্ক হয়ে সুশান্ত বলে, দাও।

…কিন্তু তাকে তো বেলা বন্ধু বলেই জানে, তবে তাকে দেখেই কেন অমন করে সে মুখ ঢেকে ফেল্লে বোরকাতে? তাহ'লে হয়তো কোন কারণ আছে যার জন্যে সে তার সঙ্গে এখন দেখা করতে চায় না। অফিস থেকে যাবার সময় বলেছিল, দরকার হলে সে নিজে এসেই দেখা করে যাবে তার সঙ্গে, সেই জন্যে বুঝি? এখনও দেখা কররার দরকার হয়নি তাই…তাই বুঝি দেখা দিলেনা বেলা? তাই বুঝি সভাগৃহে ঘননীল মেঘে ডুব দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল চাঁদটা?

টেবিলের ওপরে ছোট ছোট ছেঁদা করা নুন রাখবার পাত্রটাকে উপুড় করে সুশান্ত টেবিল ক্লথের ওপর অন্যমনস্ক ভাবে জোরে জোরে নাড়তে লাগল। সবুজ টেবিল ক্লথটার ওপর নুন পড়ছে ঝরঝর করে… বেশ তো বেলার প্রয়োজন না থাকে, তারও কোন দরকার নেই দেখা করবার…গয়না টাকাগুলো নিয়েই মুস্কিল, হোটেলে তার কাছে, কিম্বা শিবানন্দ বাবুর কাছে ঐ গুলো পৌঁছে দিতে পারলেই হয়।… তারপর, গয়না টাকা পৌঁছে দেবার পর, আর কোন প্রশ্নই থাকবে না বেলার সম্বন্ধে। তারপর যা পারে করুক ও…বোরকা পরে বেড়াক, কিম্বা সিগারেট খেয়ে বেড়াক রাস্তায় রাস্তায়, সুশান্তকে চিনতে পারুক আর নাই পারুক তাতে কিছু এসে যাবে না ভবিষ্যতে…সুশান্তর মনে হ'ল দেশসেবার কাজ করবার জন্যে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসার পথই ভালো…ও গুলি-গোলা বন্দুকে ও বিশ্বাস করে না, ও-পথে ও চলবে না, এবং কোন সম্পর্ক রাখবে না সে ও-পথের কোন পথিকের সঙ্গে।… সুশান্তর দৃঢ় বিশ্বাস, এক ঐ সমবায়ের রাস্তাতেই দেশসেবার চরম লক্ষ্যস্থলে ঠিক পৌছনো যাবে শেষ পর্য্যন্ত। সমবায় ছাড়া আমাদের দেশের অন্য কোন উপায় নেই।

একটা বড়ো ট্রেতে করে একগাদা খাবার নিয়ে আসে বন্ধু…

টেবিলের ওপর নুন পড়ে গেছে অনেকখানি...এতো নুন কি করে পড়লো বাবু? হাত দিয়ে নুনগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করে বঙ্কু।

চেয়ারে বসে সুশান্ত দেখতে পেলে সুলতা আর মনো একটা রিক্সা করে পূব দিকে চলে গেল। ওরা দু'জনে বাড়ী যাচ্ছে এবার। তারপর? তারপর আর দু'মিনিট পরেই ধ্বক ধ্বক করে জোরে জোরে বাজতে লাগল সুশান্তর বুকটা ..নীল বোরকা পরে আফজল উন্নেসা চলেছে তার দিকে পেছন করে, পূব দিকের রাস্তায়, পায়ে হেঁটে!

বঙ্কু বলে, এই যে বাবু খাবার এনেছি।

কিসের? অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করে সুশান্ত...একি...পাশের চেয়ারে এসে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ.. বলছেন, সুশান্ত অত খাবার যেন খেয়ে ফেলো না ভুল করে, অসুখ করবে। পূব দিকে তাকিয়ে দেখ, এই শোন আবির্ভাবের কবিতা :

কাছে এলে যবে হেরি অভিনব,
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ,
কোথা চম্পক আভরণ?

—খাবার এনেছি বাবু...আবার বলে বঙ্কু।

আরে সর্ব্বনাশ...সব রকমের এক একটা করে খাবার নিয়ে এসেছে বঙ্কু। এতো খাবার তো তিনদিনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না সুশান্ত। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে বঙ্কুকে, এ সব তোমাকে কে আনতে বললে?

বঙ্কুও আশ্চর্য্য হয়ে গেল...কেন বাবু আপনিই তো বললেন। খাবারের দাম মিটিয়ে দেয় সুশান্ত। বঙ্কুকে বলে, আমার যেন হঠাৎ কেমন গা-বমি করে উঠলো—ও খাবারগুলো তুমিই খেয়ে ফেলো।

বঙ্কুর সমস্ত মুখটা ভরে জল এসে পড়ে, কথাগুলো যেন জড়িয়ে যায় জিবে। হাতে করে দই খাবার মত কেমন একটা সুড়ুৎ করে শব্দ করে মুখের জলটা গিলে ফেলে বঙ্কু...একগাল হেসে বলে, আমার দাদার গেল মাসে বিয়ে হয়েছে...বৌদি ঐ সব খাবার খেতে খুব ভালবাসে,

···খাবারগুলো বাড়ী নিয়ে যাবো বাবু? আমি আর বৌদি দু'জনে খাবো?

—তাই যেও, বলে সুশান্ত বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

হাজার অঙ্ক কষলেও মানুষ তো তাই বলে অঙ্ক নয়? রাস্তায় বেরিয়ে জোরালো একটা জেদ উঠলো মাথায় চেপে···না, না, আর দেরি নয়, এক্ষুনি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে সে···চুরির গয়না টাকা আর একমিনিটও বাড়ীতে রাখা চলবে না···না, না, মনের ভেতরটায় কে যেন জোরে জোরে মাথা নাড়ে···না, না, তার সময় বড়ো খারাপ, খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে এখন, তা' না হ'লে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড বিপদের সম্ভাবনা আছে।

হন হন করে হেঁটে চলেছে সুশান্ত···আধুনিকা হোটেলেই যাচ্ছে বো'রকাপরা আফজল উন্নেসা, আজ সে যেমন করেই হ'ক দেখা করবেই তার সঙ্গে। না দেখা হয়, শিবানন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করবে, খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে তাঁকে কেন তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন···পরমাত্মীয় ভেবেছেন যাকে, যার সুমুখে রণেনকে বলতে পেরেছেন গোলাগুলি বন্দুকের গোপন কথাগুলো, তার কাছে বেলার কথাটা লুকোবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? না, না, হোক সমগ্র হিমালয়,···মিথ্যাচারী হিমালয় মাটির ঢিপির কাছে মাথা নীচু করবে।

ট্যাক্সি নিয়েছে সুশান্ত···ঠনঠনের কালো মেয়ের সুমুখে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে একটা বিকল হয়ে-যাওয়া লরীর জন্যে···সুশান্ত দু'হাত তুলে প্রণাম করলে কালোমেয়েকে। ট্যাক্সি থেকে শুধু উঁচু করা লাল টুকটুকে অভয় হাতটা দেখা যাচ্ছে।···

পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ নম্বর, পাশাপাশি দু'খানা ঘরে থাকেন শিবানন্দ বাবু, তেতালায়। দোতালার শেষের দিককার বাইশ নম্বর ঘরে থাকে বিদ্যুৎ। ম্যানেজারের কাছে খবর নিয়ে জানলে, বিদ্যুৎ দেবী ঘরেই আছেন, এক্ষুনি এসেছেন।

—তিনি কি বোরকা পরেন?

অম্বর উত্তর দিলে, হ্যাঁ, এখন তো বোরকা পরেই এলেন দেখলুম; তিনি যে কখন কি পরেন বুঝে ওঠাই ভার!···

—তুই থাম্ দিকিনি···কথা বলতে জানিস্‌না ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে, ধমকে ওঠে প্রণতি! প্রণতি রূপ দিয়ে কথা বলতে পারে একটু একটু। বললে—মশাই, বিদ্যুৎ দেবীর সমস্তটাই রোমান্টিক ব্যাপার, তিনি এসে পর্য্যন্ত সব সময়ই মনে হয় আমরা যেন সবাই আরব্য উপন্যাসের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি···আমরা যেন সবাই 'সিন্দবাদ দি সেলর'। কিন্তু আপনি যেন ও-সব কথা বলবেন না বিদ্যুৎ দেবীকে···আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কি দরকার মশাই ওসব কথাতে থাকা? পুলিস থেকে আরম্ভ করে দেশে যত বড়ো বড়ো প্রসিদ্ধ গুণ্ডা আছে, সব ঐ মেয়েটির মুঠোর মধ্যে!···

আসলে প্রণতি ভেবেছে সুশান্ত পুলিসের লোক, তাই ভয়ে ভয়ে ভাব করে নিচ্ছে সুশান্তর সঙ্গে। অম্বরটার মাথায় তো আস্ত গরু পোরা ···এ সব পলিটিক্স তো কিছুতেই ঢুকবে না ঐ মোটা খুলিতে। ও শুধু বাজার করাটা কেমন করে কায়েমী হয়ে থাকবে ওর হাতে ঐ নিয়েই আছে।···তারপর আজকাল আবার বাবুর শালী ললিতার ওপরে ডাইনের মায়া পড়েছে ওর। ললিতা ললিতা করে ধেই ধেই করে নাচছে দিনরাত্তির।···ওঃ লভে পড়েছেন বাবু ললিতার সঙ্গে·· হারামজাদ ···খুব একটা কামড়ানো চাউনি প্রণতি চাইলে অম্বরের দিকে।

সুশান্ত বাইশ নম্বরে কটকট করে কড়া নাড়ে।

—কে? বিদ্যুৎ খুলে দিলে দরজা।

—কে আপনি? ভেতরে আসুন···পা পর্য্যন্ত ছড়ানো চুল, লাল চিরুণী দিয়ে আঁচড়াচ্ছে বেলা। ভেতরে গিয়ে আলোতে দাঁড়ায় সুশান্ত বেলার সুমুখে। হেসে দু'হাত একত্র করে কপালে ঠেকায়,···নমস্কার বেলা দেবী···আমায় চিনতে পারেন? আফজল উন্নেসা হাসে, প্রতি নমস্কার করে বলে বসুন, আমার নাম তো বেলা নয়, আমার নাম বিদ্যুৎ। একটা ঢোঁক-গেলে মেয়েটা···আপনাকে তো কই চিনতে পারলুম না? অনুগ্রহ করে আপনার নামটা যদি বলেন।···

সুশান্ত বলে, আমায় নামটা পরে শুনলেও চলবে, কেননা আমার তো শুধু একটাই নাম। কিন্তু আপনার? আপনার কোন নামটা ঠিক? বেলা, বিদ্যুৎ, না আফজল?

দু'জনে বসে পড়ে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে। হিহি করে দুষ্টু হাসি হাসে মেয়েটা⋯কোন নামটা আপনার পছন্দ হয়?

সুশান্ত বলে, আমার তো বেলা নামটাই ভাল লাগে।

চোখ দুটো নীচু করে ফেলে বিদ্যুৎ⋯আফজল অবশ্য আমার ছদ্মনাম,⋯আমার ছদ্মনামের মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়⋯কিন্তু বেলা আমি কিছুতেই নই, আমি বিদ্যুৎ।

মাথাটা বিগড়ে উঠ্‌লো সুশান্তর,—চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিয়ে বেলার দুটো হাত ধরে ফেললে খপ্‌ করে⋯কেন আমার সঙ্গে এরকম অভিনয় কচ্ছেন? সেই যে অফিস থেকে চলে এলেন, তারপর কত যে দিন-রাত্তির খুঁজেছি আপনাকে, সে কথা বল্লে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? আমার ওপর দয়া করুন একটু⋯আপনার গয়না টাকা ফেরৎ নিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিন⋯ বলুন, কখন নিয়ে আসবো ওগুলো আপনার কাছে?⋯

হাত দুটো টেনে না নিয়েই বিদ্যুৎ বল্লে,—এবারে বুঝতে পেরেছি⋯ আপনি তাহ'লে দিদির বন্ধু সুশান্ত বাবু? একটু হাসে বিদ্যুৎ⋯আপনি খুঁজেছেন বেলাকে অর্থাৎ দিদিকে, আর আমি দিন-রাত্তির কাকে খুঁজেছি জানেন? খুব অস্থির হয়ে কেবল খুঁজেছি আপনাকে⋯আচ্ছা বসুন একটু, আমি আসছি⋯বিদ্যুৎ ঘরের বাইরে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরে এলো ঘরে, চাবি নিয়ে দেয়াল-আলমারীটা খুল্‌লো কট্‌ করে⋯কি একটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আলমারী বন্ধ করে আবার ফিরে এলো সুশান্তর সুমুখের চেয়ারে। বললে, এ্যামেরিকা যাবার আগে দিদি আমাকে দিয়ে গেছে এই তিনটে টাকা। অফিসের ঠিকানা দিয়েছিল, হারিয়ে ফেলেছি; বলেছিল এই তিনটে টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে মনে করে। হাতটা উপুড় করে তিনটে সিঁদুর মাখা টাকা রাখলে বিদ্যুৎ ঠক্‌ করে টেবিলটার ওপরে।⋯

দু'টাকা বারো আনার খাবার খাইয়েছিলেন দিদিকে, চার আনা বকশিশ্‌ দিয়েছিলেন দোকানের চাকরকে⋯সেই তিনটে লক্ষীর কৌটোর টাকা অনেক খোঁজ করে, যাবার আগের দিনই বার করতে পেরেছিল দিদি⋯এর জন্যে পাঁচ টাকা খরচ করতে হয়েছিল তাকে। তারপর

যাবার আগে ভার দিয়ে গেছে আমাকে, বলে গেছে সুশান্ত বাবুর লক্ষ্মীর কৌটোয় নিশ্চয় ফিরিয়ে দিয়ে আসিস ঐ টাকা তিনটে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিদ্যুৎ। বলে, আমরা যমজ বোন, দিদি আর আমি—বেলা আর বিদ্যুৎ।

সুশান্ত অস্থির হয়ে বলে, সত্যি? সত্যি ও-কথা? সত্যিই আপনি বেলা দেবী নন? কিন্তু চেহারাটা তো একেবারে একরকম দেখতে…উঃ কি ভয়ানক আশ্চর্য্য!…

হাসে বিদ্যুৎ। বলে, যমজ হবারতো ঐ মুস্কিল, মা-ই ভুল করতেন মাঝে মাঝে, বাবার এখনও ভুল হয়। অতএব আপনার পক্ষে ভুল হওয়াটা তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। একটু থেমে বিদ্যুৎ আবার বলে, দিদি আমার চেয়ে মাত্র তিন ঘণ্টার বড়ো · শুধু তিনটে ঘণ্টা, ঐ তিনটে সিঁদুর মাখা টাকার মত। আবার একটু চুপচাপ…আবার বলে বিদ্যুৎ …সবার প্রথম এসেছিল ঐ তিনটে সিঁদুর মাখা টাকা। আগের দিন রাত্তির থেকে কিছু খাবার জোটেনি পেটে…আস্তাবলের ঘোড়াটার খাবার থেকে কিছু ছোলা চুরি করে একমুঠো করে খেয়েছিলুম সেদ্ধ করে …বাবা আর আমরা সবাই। একটা ছোলাও দিদি মুখে দেয়নি। ঘোড়াটার পাশে বস্তার ভেতর ছিল ছোলা, আমি আর দিদি দু'জনে গিয়েছিলুম চুরি করতে…অনেক রাত্তির তখন…ঘোড়াটার চোখ দুটো জ্বলছিল ধক্ ধক্ করে অন্ধকারে·· সে জানতে পেরেছিল বোধ হয়… চিঁহি করে চেঁচিয়ে উঠেছিল একবার।…

সুশান্ত স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শুনছে…চমকে চমকে এগিয়ে চলে বিদ্যুৎ… তার পরের দিন সকালবেলা এলো আগে ঐ তিনটে সিঁদুর মাখা টাকা, তারপর দিদির জীবনে, আমাদের জীবনে এলো সুশান্ত…শাড়ীর আঁচলটা গলায় দেয় বিদ্যুৎ, মাটির ওপরে নত হয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়…দাদা, তোমাকে তুমি বলি?

আচ্ছা বেশতো, তাই বলো বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ বলে, তোমার সম্বন্ধে কত বড়ো ধারণা যে দিদির মনে,… দিদি যে কত ভালোবাসে, কত শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে তোমাকে, সে কথা শুধু আমি কেন, বাবাও সব জানেন।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কতদিনে ফিরবেন বেলা দেবী এ্যামেরিকা থেকে ?

বিদ্যুৎ বলে, এ্যামেরিকা থেকে ইউরোপ হয়ে ফিরতে অন্ততঃ মাস দুই তো লাগবেই…তারপরেও বোধ হয় তার ফিরে আসার দিন নানা কারণে অনির্দ্দিষ্ট।…

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে বসে, কেন ?

…যে কারণে বিদ্যুৎকে বোরকা পরে আফজল উন্নেসা সেজে বেড়াতে হয় ঠিক সেই কারণে…পুলিসের সুনজর আছে আমাদের সকলের ওপর, সে কথা কি দিদি তোমায় বলেনি ? আক্রোশটা দিদির ওপরেই সবার চেয়ে বেশী।

হোটেলের একটা বয় ট্রেতে করে কিছু আলু সেদ্ধ, কয়েকটা কাঁচা ডিম, কিছু কিমা করা মাংস, কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো ইত্যাদি রেখে গেল পাশের টিপয়টার ওপর। বল্লে, ফল, মিষ্টি উমেশ নিয়ে আসছে।…

যে টেবিলের সুমুখে সুশান্ত বসেছিল তার ওপরে ইলেক্ট্রীক ষ্টোভটা রেখে প্লাগটা লাগিয়ে দেয় বিদ্যুৎ।

বোকার মত সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, খাবার করবে বুঝি ?

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যুৎ…কি মনে হচ্ছে তোমার ? ষ্টোভ জ্বেলেছি, এবার তার সুমুখে বসে গান গাইব ?

সুশান্ত বলে, না মানে…আমি জিজ্ঞেস করেছি আমার জন্যে খাবার তৈরী করছো না তো ?…আমার কিন্তু এখন একটুও ক্ষিদে নেই।

ও কথার উত্তর দেয় না বিদ্যুৎ, সুশান্তর সুমুখে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর একটা প্লেটে করে সেদ্ধ আলুগুলোকে মাখতে থাকে হাত দিয়ে। বলে, কোন মেয়েকে কয়লার উনুনের সুমুখে বসে রান্না করতে দেখেছো? মেয়েদের মুখের ওপর উনুনের কবি-দৃষ্টি দেখতে ভাল লাগে না তোমার ? অগ্নি-পরীক্ষার সময় অগ্নিকুণ্ডের সুমুখে দাঁড়িয়ে সীতার মুখের ওপর ঠিক অমনি আভা ফুটে উঠেছিল…ভাল লাগেনা দেখতে ?

সুশান্ত বলে, ভাল লাগে।

আবার বলে বিদ্যুৎ, ভাল লাগে না দেখতে ? ওরকম কাউকে লুকিয়ে দেখেছো ? অর্থাৎ সে রান্না করছে, তার মুখের ওপরে জেগেছে

গম্‌গমে উনুনের অপূর্ব্ব আভা…তুমি দেখছো, দেখেই যাচ্ছো তুমি… অথচ সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না ?

সুশান্ত এক মুহূর্ত্ত ভেবে বলে, মনে পড়ছে না।

একটা ডিম ভেঙে চটকানো আলুতে ঢাললে বিদ্যুৎ প্লেটের ওপর। তাহ'লে কি মনে পড়ছে ? দিদিকে মনে পডছে ? বেলাকে ?

সুশান্ত উর্ত্তর করে : সে তো তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত সব সময়ই মনে পড়ছে।

আলুর সঙ্গে ভাঙা ডিমটাকে আবার চটকায় বিদ্যুৎ। ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে বলে, আজ দিদি থাকলে কি করতো জানো ? একঘর রান্না করে ফেলতো সুমুখে বসে বসে…তারপর কোন কথা শুনতো না, রাণীর মত তর্জ্জনী তুলে বল্‌তো খাও…আর টপ্‌ টপ্‌ করে লক্ষী ছেলের মত সব খেয়ে ফেলতো সুশান্ত। তবে, একটা ঢোঁক গেলে দুষ্টু মেয়েটা, এ মেয়েটা তো বেলা নয়, এ তো বিদ্যুৎ…তাই সুশান্ত বলছে আমার কিন্তু এখন একটুও ক্ষিদে নেই।…

সুশান্ত হাসে। বলে, বাঃ বেশ কথা বলছো তো…সে জন্যে কি ? সত্যি বলছি আজকে আমার মোটেই ক্ষিদে নেই।

ওকথার উত্তর দেয় না বিদ্যুৎ…এইবার মাংসের পুরগুলো নিয়ে কি জানি কি করছে · বলে, রান্না করে খাওয়াতে দিদি এতো ভালবাসে তা সে দিদি এলেই জানতে পারবে। আমি আবার অতখানি পারি না। বাবার আজকাল খাওয়াদাওয়ার বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

একটা প্লেটে করে উমেশ এসে কমলা লেবু, কলা, মিষ্টি রেখে গেল।

আবার আপত্তি জানায় সুশান্ত…এ তুমি কি করছো বিদ্যুৎ…আবার এক প্লেট খাবার এলো ? আমি কিন্তু তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমার মোটেই ক্ষিদে নেই পেটে।…

বিদ্যুৎ হাসে। জিজ্ঞেস করে পেটে না হয় ক্ষিদে নেই…মনে? মনেও নেই ক্ষিদে ? তারপর আবার বলে, না, না, আমিই ভুল করছি। একটু-নড়লে চড়লে যদি বা আসে পেটের ক্ষিদে, মনের ক্ষিদে আসবার তো কোন উপায়ই নেই সম্প্রতি…প্রবল হয়ে উঠতো মনের ক্ষিদে যদি বন্ধু এসে পড়তো এখানে হঠাৎ, যদি হুস্‌ করে এ্যামেরিকা থেকে

প্লেনটা এই ঘরের মধ্যে এসে, বেলাকে নাবিয়ে দিয়ে যেত, এই টেবিলের ওপর ষ্টোভটার পাশে।

সুশান্ত কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করে ওঠে একটু।

বিদ্যুৎ বলে, তার চেয়ে শোন খাবার করতে করতে একটা গল্প বলি : আমাদের এই হোটেলের যিনি মালিক—ভুবনমোহন বাবু—তাঁর একটি তরুণী অবিবাহিতা শালী আছে, বাপ মা হারিয়ে সম্প্রতি দিদির কাছে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। হোটেলের দু'জন ম্যানেজারের মধ্যে একজন অম্বর বাবু, তিনি মালিকের দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। তিনি ঐ তরুণী ললিতার ওপর প্রণয়াসক্ত হয়েছেন···বোধ হয় বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। ললিতার খুব আহামরি রূপ না থাকলেও তারুণ্য আছে, এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজারের সম্পত্তিও আছে টাকায় এবং জমিজমায়। ললিতা প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' পড়ে, মাঝে মাঝে আবৃত্তিও নাকি করে তাই থেকে, তাইতে অম্বর জানতে পেরেছেন যে ললিতা কবিতা ভালবাসে। আবার শোনা গেল যে, আর একজন ম্যানেজার প্রণতি বাবুও নাকি ঐ ললিতার ব্যাপারে অম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। রমেশদার কাছে সেদিন একটা কবিতা লিখে এনেছিলেন অম্বর বাবু, কবিতাটি প্রিয়া-মনোরঞ্জন করবার যোগ্য হয়েছে কিনা এই কথা জানবার জন্যে। রমেশদা আমাকে লেখাটা দেখিয়েছিলেন···কবিতাটা এতো ভালো লেগেছে আমার যে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। কবিতাটা হচ্ছে :

সেদিন তো গেলে ভিজে এলো চুলে,
বাথরুম থেকে সকালবেলাতে,
কি মধুর রূপ, মনের টেবুলে,
এলে উপরোধে রাবড়ী গেলাতে···
প্লেটে দিলে দুটো চপ,
আমি খাই নন্‌ষ্টপ্‌,
ধপ্‌ ধপ্‌ করে, প্রণতিটা এলো
পেছনে দাঁড়িয়ে পুচ্ছ দোলাতে···

হা হা করে হেসে ওঠে দু'জনে। বিদ্যুৎ বলে, ভাল লাগল না কবিতাটা? এটা হ'ল পেটুক হোটেল ম্যানেজারের প্রণয়লিপ্সা, একে

পৈটিক প্রেমও বলা যেতে পারে। আবার হাসে বিদ্যুৎ। বলে, আমি নাকি বিদ্যুৎ তাই, নাহ'লে আমার বদলে দিদি যদি আজ এমনি করে খাবার করে খাওয়াতো, তাহ'লে হয়তো কবিতাটা এখানেও সময়োপযোগী হ'ত।

কেবল বেলার দিকে টানাটানি করছে বিদ্যুৎ সুশান্তকে। আকাশের বিদ্যুতের মত কেবলই সে ইঙ্গিত করছে অনাগত ঝড় ও ঘন-বর্ষণের।

দুটো প্লেটে খাবার ফল, সাজিয়ে নিয়েছে বিদ্যুৎ। মেঝের ওপরে জল ছিটিয়ে আসন পেতে দিয়েছে···প্লেট দুটো আর কাঁচের গেলাসে জল রেখেছে আসনের সুমুখে।

বিদ্যুৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, এবার আমি তোমার বন্ধু অর্থাৎ দিদির অভিনয় করি: চলো সুশান্ত খাবার খাবে ···যদি সুশান্ত বলে, 'না', যদি বলে, আমার তো এখন মোটে ক্ষিদে নেই, তখন দিদি সেজে বিদ্যুৎ বলবে, তর্জনী তুলে চোখ পাকিয়ে, এসো বলছি; তাতেও যদি সুশান্ত 'না' বলে···না, সে বড় বাড়াবাড়ি ব্যাপার হয়ে যাবে কিন্তু···তার চেয়ে বিদ্যুৎ হয়েই কথা বলি: এসো দাদামণি, খাবে এসো, ছোটবোন খাবার করেছে, খাবে না? না খেলে সারা-রাত্তির কেঁদে কেঁদে ছোটবোন যে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে একেবারে···ওরকম করলে ভাইফোঁটার দিন খাবার খাওয়াবো না কিন্তু।···

মুখোমুখি মেঝের ওপরে ছড়িয়ে বসেছে বিদ্যুৎ পা'দুটো মুড়ে···সেই কখন ভাত খেয়েছে দিনের বেলায়, বেশ ক্ষিদে ছিল পেটে···কেন যে তবু ক্ষিদে নেই ক্ষিদে নেই বলে আপত্তি করছিলো সুশান্ত, সে কথা সে একটুও বুঝতে পারলে না খেতে বসে।

পূর্ণিমার আকাশটা চাঁদটাকে মাথায় নিয়ে যেন পাতের সুমুখে এসে বসেছে পা দুটো মুড়ে···প্লেটগুলো, গেলাসটা, গেলাসের ঢাকা, সুশান্ত ···ওরা সবাই যেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারা, সেই জ্যোৎস্না-আকাশটায়। সুশান্ত খাচ্ছে, তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে। বিদুৎ বলে, মা বলতেন মেয়েমানুষকে সকলের চেয়ে কখন সুন্দর দেখায় জানিস, যখন সে সুমুখে বসে অন্য কাউকে খাওয়ায়।···পুরুষদের সুমুখে বসে মেয়েরা যখন যত্ন করে, আদর করে খাওয়ায়; তখনই ঠিক জেগে ওঠে

অন্নপূর্ণার রূপ। মা বলতেন, আমার এত ভালো লাগে দেখতে, মনে হয় যেন ফটো তুলেনি। সুশান্ত চিবোতে চিবোতে হঠাৎ চোখ বুঁজে ফেললে। বিদ্যুৎ বলে, আমাকে কি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে? নেবো নাকি ফটোটা কাউকে ডাকিয়ে?

সুশান্ত বলে, নাও।

—না থাকগে, দিদি এলেই ফটো তুলো···কে জানে বাবু দিদি এসে যদি রাগ করে···যদি এসে বলে, আমি তুললুম না আর তুই-ই আগে ফটো তুলে ফেললি?

যাবার সময় সুশান্ত আবার তুললে গয়না টাকার কথাটা। বিদ্যুৎ বলে, এ-বিষয়ে দিদির পরিষ্কার নির্দ্দেশ আছে···ও সব এখন তোমার কাছেই থাকবে।

সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়ে যায়। বলে, কেন?

—দিদি বলে গেছে, কেউ যাতে আমাদের ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারে, তার জন্যে ভালোবাসা ও ভয় দুই-ই ভরে রাখবি বন্দুকে।

সুশান্ত প্রতিবাদ করে—না, না ভয় কিসের?

বিদ্যুৎ হাসে, যদি ভয় না হয় তাহ'লে নিশ্চয় ভালোবাসা। আর যদি ভালোবাসা হয়, তাহ'লে ও সব এখন তোমাকেই রাখতে হবে এই হ'ল দিদির নির্দ্দেশ।

সুশান্ত অনুনয় করে—না মানে, এটাতো ঠিক হচ্ছে না।

দু'হাত যোড় করে বিদ্যুৎ···একটু চমকে ওঠা ক্ষণ-অনুভূতি ··ছায় আমি বিদ্যুৎ···আমি শুধু দূতী···দিদির আজ্ঞা অমান্য করবার ক্ষমতা নেই তো বিদ্যুতের।

—এগারো—

আধুনিকা হোটেলের চাকর ভরত ছেলেমানুষ, বয়েস বারো-তেরোর বেশী নয়; তার চোর হিসেবে অতি-প্রসিদ্ধি আছে। অন্য সব বয়ের কাছে সে নিজেই বলেছে জোর করে, যা কিছু তাকে আনতে দেওয়া হবে বাজার থেকে কিনে, তা' থেকে সে নিশ্চয়ই চুরি করবে কিছু না কিছু পয়সা বা জিনিস। তার বিশ্বাস, ভগবানও যদি নেবে আসেন আকাশ থেকে, তাহ'লেও তিনি বন্ধ করতে পারবেন না ভরতের চুরি করা।

ললিতা শুনেছে উমেশের কাছে এককোঁটা ভরতের এই গৌরবময় ঘোষণার কথা; খুব হেসেছে সে ঐ কথা শুনে। ভরতকে ডেকে সেদিন জিজ্ঞেস করলে ললিতা, হ্যাঁরে ভরত, যা কিছু কিনতে দেওয়া হবে, তা থেকে তুই নাকি নিশ্চয়ই চুরি করতে পারিস?

একটু থতমত খেয়ে যায় ভরত প্রথমটা, পরে সামলে নিয়ে বলে, আজ্ঞা, তা পারি বৈকি দিদিমণি!

—আচ্ছা যা এই ছ'টা পয়সা নিয়ে দু'খানা পোষ্টকার্ড কিনে নিয়ে আয়··· এর থেকেও চুরি করবি তো?

—আজ্ঞা, হ্যাঁ দিদিমণি···

কিছুক্ষণ পরে পোষ্টকার্ড নিয়ে এল ভরত···ঠিক দু'খানাই এনেছে··· ললিতা জিজ্ঞেস করলো, চুরি করেছিস?

—আজ্ঞা হাঁ দিদিমণি।

—কেমন করে করলি?

ভরত বল্লে, আজ্ঞা, বুদ্ধি করে করনু···প্রথমে গেনু বাতাসার দোকানে···ছ'পয়সার বাতাসা কিননু। নেবার সময় চেকে দেখবার জন্যে দুটো বাতাসা নিয়ে দোকানীকে বলে একটা খেনু, একটা পুরে নিনু পকেটে···তারপর খানিকদূর গিয়ে একটু পরে আবার ফিরে গেনু সেই দোকানে···বনু, এ বাতাসা চলবেনি মোটে···দিদিমণি খেয়ে বল্লেন,

কেরাসিন তেলের গন্ধ বেরুচ্ছে···এই ফেরৎ নাও বাতাসা—পয়সা ফেরৎ দাও। বাতাসা ফেরৎ দেবার সময় চারটে বাতাসা কম দিনু দিদিমণি, দোকানী ঝগড়া করতে লাগলো, বনু দিদিমণি খেয়ে দেখেছেন চারটে বাতাসা···একখানা খেয়ে মনে হয়েছে গন্ধ, তারপর আরও খেতে হবে তো দু'চারখানা, তবে না গন্ধ বোঝা যাবে ঠিক করে···তারপর ডাকঘরে গিয়ে নিয়ে এনু আপনার পোষ্টোকার্ড···দোকানীকে কোলা দেখিয়ে ছ'টা বাতাসা চুরি করে নিনু···আত্মপ্রসাদে সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো ভরতের।

হি হি করে হাসে ললিতা, হি হি করে হাসেন বিমলা। বিমলা জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে ভরত কোথা থেকে শিখলি তুই এই বিদ্যে?

গম্ভীর হয়ে ভরত বলে, আজ্ঞা পিতা-মাতার কাছেই শিখেছি মাঠান।

ললিতা বলে, আচ্ছা যা এই আট আনা পয়সা নিয়ে দু'খানা অমিরৃতি কিনে আন্ ময়রার দোকান থেকে। বড়ো দেখে নিবি, চার আনা করে একখানা। এবারে পারবি চুরি করতে?

—আজ্ঞা হাঁ দিদিমণি।

ললিতা হাসে। বলে, এবারে কিন্তু অন্যরকম করে চুরি করতে হবে, ঐ রকম বাতাসার মত কোন জিনিস ফিনিস দিয়ে চুরি করলে চলবে না কিন্তু।

সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নাড়ে ভরত···আজ্ঞা আচ্ছা দিদিমণি···কি একটু ভাবে ভরত···কিন্তু জিনিস দিয়ে চুরি না করতে দিলে একটু মস্কিল আছে দিদিমণি।···

হেসে ললিতা বলে, সে আমি জানি না···তুই যে বলেছিস যেরকম করেই হোক চুরি করবিই তুই?

—আচ্ছা দিদিমণি···তাই করবো, কোন জিনিস দিয়ে চুরি করবো না।···

বিমলা ললিতাকে বলে ওঠেন: ওরকম সর্ত্ত করলেও কিন্তু ঠিক চেটে নিয়ে আসবে অমিরৃতি। সেই গজা চাটার গল্প জানিস না?

অনেকক্ষণ ভাবলে ভরত রাস্তায় দাঁড়িয়ে···তারপর হঠাৎ এল

মাথায় বুদ্ধি···মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো খুব···দুটো হাত বাজিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে উঠলো ভরত।

খানিক পরে দু'খানা বড়ো অমির্তি নিয়ে ফিরে এলো ভরত ছাতের ওপরে।

ললিতা, দিদির সঙ্গে চা খাচ্ছিল, বল্লে, এনেছিস্ অমির্তি?

—আজ্ঞা এনেছি দিদিমণি।

—চুরি করেছিস্? জিজ্ঞেস করেন বিমলা।

—আজ্ঞা মা, করেছি আপনার আশীর্ব্বাদে।

অমির্তির ঠোঙা হাতে নিয়ে একটা কামড়ে অর্দ্ধেকটা ভেঙে নেয় ললিতা। চিবোতে চিবোতে বলে, বল্ কি করে চুরি করলি···ভরত চোখে অন্ধকার দেখলে···যাঃ সব গোলমাল হয়ে গেল!···

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লে, আজ্ঞা দিদিমণি বড় ভয় করছে বলতে।—

সাহস দিয়ে ললিতা বলে, না, না ভয় নেই, বল সত্যি করে কেমন করে চুরি করলি?

ভয় ভাঙে না ভরতের—আজ্ঞা দিদিমণি চাকরী যাবে বল্লে পরে··· আপনি আমাকে মারবেন···কেঁদে ফেল্‌লে ভরত···বয়েস তো বেশী নয়, বারো-তেরোর বেশী হবে না। খুব ভয় পেয়ে গেছে ছেলেটা। বল্লে, না দিদিমণি এবারে আমি চুরি করতে পারিনি।

ধমক দেয় ললিতা: না বল্লে অম্বর বাবুকে বলে মার খাওয়াবো কিন্তু।

বিমলা বলেন, না, না সত্যি কথা বল, কেউ তোর কিছু করবে না আমি বলছি।

ভরত পা জড়িয়ে ধরে ললিতার···বড়ো অপরাধ করেছি দিদিমণি, ক্ষমা করুন আমাকে, এবারে আমি চুরি করতে পারিনি···তারপর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে বলে, আপনি তো বল্লেন দিদিমণি, ভরত তুই জিনিস এনে চুরি করতে পারবি না···বল্লেন না? তাই—তাই একটা ঢোক গেলে ভরত···তাই।···

—তাই কি? জিজ্ঞেস করে ললিতা।

তাই ভাবনু দিদিমণিকে গিয়ে বলবো যে অমির্তি দুটো রাস্তায়

আঁস্তাকুড়ে পড়ে গেছে হাত থেকে, তাহ'লে আপনি তো খাবেন না, ফেলে দিতে বলবেন, তারপর দুটো অমৃরিতিই আবার ফেরত দিয়ে চার আনা পয়সা নিয়ে নেবো চুরি করে…কিন্তু আপনি ও মা হাম্‌ড়ে খেয়ে ফেল্লেন অমিরৃতি দুটোকে।

তখন দু'খানা অমিরৃতিই চলে গেছে দু'বোনের পেটে…একখানা খেয়েছে ললিতা, আর একখানা খাইয়েছে বিমলাকে।

—এঁটো এঁটো ভীষণ বাতিক আছে বিমলার। ভরতের হাবভাব দেখে দারুণ সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। সত্যি কথা বল, চীৎকার করে ওঠেন বিমলা, তুই নিশ্চয়ই চেটেছিস্…আরে রাম রাম, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেল্‌লেন বিমলা…সন্থ ছোট জাতের এঁটোটা খেলুম …ও নিশ্চয় চেটেছে…ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে এলেন বিমলা।

ললিতা হি হি করে হাসতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বিমলাকে বল্লে: ও বলছে চাটেনি, তবু তুমি বিশ্বাস করবে না ওর কথা। আর তাছাড়া চেটেই যদি থাকে, অমন কত এঁটো তো আমরা খেয়েই থাকি, বেরালের, ইঁদুরের, উট্‌কো কুকুরের …এতো তবু মানুষের এঁটো। অনেক মানুষ ডাষ্টবিন থেকে এঁটো কুড়িয়ে খেয়ে বেঁচে আছে আজকাল।

বিমলা বল্লেন, দূর করে তাড়িয়ে দে ঐ চোরটাকে।

ভালোবাসার জোরে অম্বর এসে ললিতাকে বল্‌লে, তোমারও উচিত বৌদির মত গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলা!

ভ্রূভঙ্গী করে ললিতা জিজ্ঞেস করে, কেন ?

অম্বর বলে: আমি পছন্দ করিনা যে আমার, আমাদের ফ্যামিলির কেউ ঐ কুকুরটার এঁটো খায়। ও ব্যাটা ঠিক চেটেছে!

ফোঁস করে ওঠে ললিতা, আমিও পছন্দ করিনা যে কোন কুকুর এসে আমার সুমুখে মানুষকে কুকুর বলে ডাকে…আমার ব্যাপারে আপনি পছন্দ করবার কে ?

ধাক্কা খেয়ে একহাত পেছু হটে দাঁড়ায় অম্বর…ভরতকে ধরে নিয়ে যায় ভুবনমোহনের কাছে। কাঁচের গেলাস থেকে কি একটা ওষুধ ঢক্

করে গিলে, মুখখানা বিকৃত করে ফেললেন ভুবনমোহন। সব শুনলেন, শুনে, 'আও' করে একটা বড়ো ঢেকুর তুললেন। বেশ খুসী মেজাজে ছিলেন তখন ভুবনমোহন ; ইতিহাস ভুগোল সব তখন চোখের সুমুখে রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। ভরতকে বল্লেন, তোর নাম কি ?

ভরত আস্তে আস্তে বল্‌লো : ভরত।

ভুবনমোহন বল্লেন, ঠিক নামের মত কাজই করেছিস তুই। হাস্যমুখী ললিতাকে বল্‌লেন, জানো ললিতা পুরাণের ভরত, রামচন্দ্রের খড়ম সেই যে নিয়ে এলেন মাথায় করে, চিরদিন সেই খড়মের পূজোই করলেন তিনি···আমাদের ভরত সেই যে বললে চুরি করবেই, সেই চুরি করাটাই খড়মের মত মাথায় করে নিয়ে এলো শেষ পর্য্যন্ত···চুরি সে করলই শেষ পর্য্যন্ত জিব দিয়ে চেটে।

ভরত কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, আজ্ঞা বাবু আমি তো চাটিনি।

—বেশ তাহ'লে নামটা বদলে ফেল্‌, আজ থেকে তোর নাম হ'লো লর্ড ক্লাইভ। বিমলাকে ডাকলেন ভুবনমোহন। বল্লেন, লর্ড ক্লাইভ এমনি ধারা চুরি করতেন। বাপ মায়ে অতিষ্ঠ হয়ে বয়াটে ছেলে হিসেবে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে কেরানী করে। তারপর সুযোগ এলো ক্লাইভের জীবনে, তিনি হয়ে গেলেন এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা···ভরতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, ঠিক ঐ সোনা··· ঠিক আমাদের ভরতের মত। যাক আজ থেকে ওর নাম হবে লর্ড ক্লাইভ···এবার ওর মোড়টা ফিরিয়ে দিতে হ'বে। বিমলাকে বল্লেন, গলায় আঙ্গুল দিয়ে শুধু আদ্দেকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে···আজ রাত্তিরে ভাতগুলো গোবর মেখে খেও···ওর সঙ্গে ইয়ারকি কর, আর ও কিছু করলেই 'দূর করে বের করে দে ওকে'···মা ?

খুব জোরে জোরে হাসে ললিতা, অম্বর তার দিকে একটা আগুনের মত চাউনি চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভুবনমোহন লর্ড ক্লাইভকে বল্লেন, কখনো চুরি করবি না আর বুঝলি ? এবার থেকে নিজেকে বাঁচাতে শেখ্‌।

—আজ্ঞা হাঁ বাবুমশায়, অমিবৃত্তি হুটোর মত এবার থেকে বাঁচিয়ে নেবো নিজেকে···অমিবৃত্তি তো আমি চাটিনি।

বারো—

সেদিন রাত্তিরবেলা রঙ্গমঞ্চে আবার এসে পড়লেন খৃষ্টপূর্ব্ব। লীলার ভালোবাসা তাঁর জীবনে শেষের ফুল ফোটা, এ কথাটা শুধু সুশান্তকেই বলেননি তিনি, চাকর রাঁধুনি দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজাররা পর্য্যন্ত সবাই শুনেছিল সে কথা। লীলার ভালোবাসা যেন বঁড়শীর মত তাঁর গলায় গিয়েছিল বিঁধে, তাই যন্ত্রণায় তিনি সব সময় অস্থির হয়ে থাকতেন, এবং লঘুগুরু বিচার না করে সকলকেই শুনিয়ে দিতেন সেধে সেধে তাঁর বাষট্টি বছরের নবাঙ্কুরের কবিতা।

—লীলা দেবীর কাছে গিয়েছিলেন নাকি? প্রায়ই জিজ্ঞেস করে অম্বর।…

—লীলা দেবী কি বল্লেন?…বয়রা প্রশ্ন করে। দু'একবার লীলা দেবী নাকি হোটেলে এসেছেন, ওরা সব দেখেছে লীলা দেবীকে, এবং সেই চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে ওরা সবাই খুব মজা করে খৃষ্টপূর্ব্বর সঙ্গে। খৃষ্টপূর্ব্ব আয়না সুমুখে নিয়ে দাড়ী কামাচ্ছেন, অম্বর গিয়ে বললে, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে লীলা দেবী যাচ্ছেন। তাই নাকি? একগালে আধখানা কামানো হয়েছে, এবং অন্য গালে সবটা ফেনা-মাখা, সেই অবস্থায় খুরটা হাতে করেই লুঙ্গী পরে, খালি পায়ে নেবে যান খৃষ্টপূর্ব্ব রাস্তার ওপরে। অম্বর যে দিকে বলেছিল সে দিকে হনহন করে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে যান…তারপর একটু ঘুরে-ফিরে বিফলমনোরথ হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আবার ফিরে আসেন আধুনিকায়। হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞেস করেন অম্বরকে…এদিকে তাকাচ্ছিল নাকি লীলা? অম্বর বলে, সে কি যে সে চাউনি, একেবারে বাঘের মত তাকিয়ে ছিলেন আপনার ঘরের দিকে অনেকক্ষণ ধরে… তারপর এগিয়ে চলে গেলেন পশ্চিম দিকে। দাঁত খিঁচিয়ে বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব…যাকগে, মরুকগে, একেবারে নিমতলায় যাকনা চলে, আমার

কি দরকার? তারপর আবার বলেন অম্বরকে, এবারে এলে ছেঁড়া জুতো ছুঁড়ে দিও গায়ে এখান থেকে…হেঁ হেঁ করে দাঁত বার করে হাসে অম্বর…উনি তো প্রায়ই যান আজকাল এদিক দিয়ে, অত ছেঁড়া জুতো কোথায় পাওয়া যাবে বলুন রোজ রোজ? যা দিনকাল পড়েছে, যারা সরকারকে খাদ্য সাপ্লাই করে, তারা আজকাল বাজার থেকে ছেঁড়া জুতো খরিদ করে নিচ্ছে পাইকারি দরে। চিনিতে পাক করে এবার বোধ হয় ইরাকি খেজুরের মত জুতোগুলো মিশরী মোরব্বা বলে বিক্রি হবে।…

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, এখানে এলে এবার জুতো মেরে তাড়িয়ে দেবো, বলে, আধকামানো দাড়ী নিয়ে দক্ষিণাকালীর মত ডান পা এগিয়ে আর বাঁ পা পিছিয়ে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন দেয়ালের কাছে।

এমনি ধারা খাবার সময় খবর পেয়ে একদিন খাওয়া ছেড়ে এঁটোহাতে রাস্তায় দৌড়েছিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব।

বয় শ্রীপতি সেদিন এক কাপ চা এনে দিলে। খৃষ্টপূর্ব্ব তার ওপর খুসী হয়ে বল্লেন, দেখ্ শ্রীপতি তোর মুখটা অনেকটা লীলার মুখের মত দেখতে, সব বয়ের চেয়ে তোকেই আমার ভালোলাগে। তোকে একদিন মোটা বখশিশ্ দিয়ে দেবো, বুঝলি?

শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে, কবে বাবু?

খৃষ্টপূর্ব্ব উৎফুল্ল হয়ে বলেন—আজকাল রাত্তিরে আসন কচ্ছি আমি, জানিস্? যোগাসন…আসনে বসে নাক টিপে নিঃশ্বাস টানি আমি, বুঝলি? প্রানায়াম করি…ঐ রকম সাতরাত্তির করলে জানিস্ কি হবে? …লীলা কেন, তার ঘাড় বাধ্য হবে এখানে আসতে…তখন জানিস্? মোটা বখশিশ দিয়ে দেবো তোকে…

অর্থাৎ চাকরবাকর কারুর কাছে বাকী রাখেন নি খৃষ্টপূর্ব্ব ঢাক পিটোতে,…হোটেলময় একেবারে ভুরভুর করছে শেষ ফুলফোটার গন্ধ।

সেদিন রাত্তিরে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো: লীলা এসে খৃষ্টপূর্ব্বর অনুপস্থিতিতে ঘরের চাবি খুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে খৃষ্টপূর্ব্বর বিছানায়। খৃষ্টপূর্ব্ব সেদিন রাত্তির বারোটায় ফিরলেন, কার সঙ্গে গিয়েছিলেন

সিনেমা দেখতে। প্রণতি গিয়ে বল্‌লে, লীলা দেবী শুয়ে আছেন ঘরে, ঘুমুচ্ছেন আপনার বিছানায়…বলেছেন, কেউ যেন না ঘরে ঢোকে।

তাই নাকি? মুখের চেহারা যেন একলাফে তিনতলা থেকে একতলায় পড়ে গেল…কখন এলো? প্রশ্ন কল্লেন খৃষ্টপূর্ব্ব। প্রণতি বললে, প্রায় সাড়ে সাতটার সময়।…একলা? না সঙ্গে সেই রূপেনটা ছিল? প্রণতি বলে, না একলাই এসেছেন…বেজায় মদ খেয়েছেন, ভয়ানক গন্ধ বেরুচ্ছিল। বেশ মাতাল হয়ে গেছেন, কবিতা বলছিলেন একটা…আমার একটু মনে আছে…খৃষ্টপূর্ব্ব কি অপূর্ব্ব তুমি…

—তাই নাকি?…একবার আস্তে দোরটা একটু খুললেন খৃষ্টপূর্ব্ব। দোরের দিকে পেছন ফিরে লাল শাড়ী পরে, সত্যিই ঘুমুচ্ছে লীলা তাঁর লেপটা গায়ে দিয়ে। আবার দোর ভেজিয়ে দিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব।…কিছু খেয়েছে? প্রণতি বলে, না। বল্লেন, কিছু খাব না। খৃষ্টপূর্ব্ব বললেন, ঐ রূপেনটাই নিয়ে গিয়েছিল ওকে মদ গেলাতে, ঐ পাঠাবে ওকে জাহান্নমে। আচ্ছা দাঁড়াও, দুটো মুঠো পাকালেন খৃষ্টপূর্ব্ব। প্রণতি বলে, আপনি তাহ'লে আজ 'কমন রুমে'ই শোবেন চলুন…খৃষ্টপূর্ব্ব চমকে ওঠেন…না, না, প্রণতি আজ আর খাবোও না, ঘুমোবোও না। কত বড়ো দিন আজকে, এটা তো বুঝছোনা তুমি।…আজ বড়োদিন, খৃশ্‌মাস ডে…আজ যীশু এসেছেন রমেশ ঘোষালের কাছে…একটু চোখ বোজেন খৃষ্টপূর্ব্ব…একখানা সোফা, চেয়ার আনিয়ে দাও আমাকে এখানে, এই দরজাটার সুমুখে…না না, সোফায় ঘুম এসে যাবে, একটা শক্ত চেয়ারই আনিয়ে দাও—আমি তাতে বসে থাকবো সারা রাত্তির জেগে।…

—সারা রাত্তির জেগে বসে থাকবেন?

—হ্যাঁ, অন্ধকারের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে সুখে, আনন্দে। সারা রাত্তির পৃথিবীময় গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘণ্টা উঠবে বেজে…মসজিদে মসজিদে, মন্দিরে মন্দিরে সাড়া পড়ে যাবে বিশ্বময়, আজ লীলা এসেছে আমার ঘরে; যীশু ঘুমুচ্ছেন আজ রমেশ ঘোষালের বিছানায়!…এতদিন পরে পৃথিবীতে আজ হয়ে যাবে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়!…

মহা মুস্কিল…আধপাগলা লোকটা আজ যেন একবারে পাগল হয়ে গেছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে, জোর করে, ধস্তাধ্বস্তি করে প্রণতি

খাওয়ালে খৃষ্টপূর্ব্বকে 'কমন রুমে' নিয়ে গিয়ে···বেশী খেতে পারলেন না, একটু-আধটু মুখে দিলেন। বল্লেন, প্রণতি, তোমাদের কাছে আমার দেনা আছে বটে, দু'একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেবো···কিন্তু কাল সকালে যত ভালো ফুল, যত ভালো খাবার পাওয়া যায় কলকাতায়, সব নিয়ে আসতে হবে কিন্তু···একশো টাকা খরচ হয়ে যায় সেও ভালো।···

কারুর কথা শুনলেন না খৃষ্টপূর্ব্ব, কাঠের শক্ত চেয়ারে লীলার দরজার পাশে সারা রাত্তির জেগে বসে রইলেন। যদি লীলা জেগে ওঠে, যদি লীলার জল তেষ্টা পায়, কুঁজো থেকে জল ঢেলে দেবেন তিনি নিজের হাতে; সকালবেলা দোর খুললে ছুটে চলে যাবেন ঘরের ভেতর, হেসে বলবেন, কি লীলা এখন ভালো আছ তো? শরীরটা সুস্থ হয়েছে তো এখন?

নিজের মনে বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব ··এই তো চাই, এমনি ধারাই তো চাই তোমাকে, নিজের ঘরে নয়, পাশের ঘরে। রোজ সকালে দেখতে পাবো হাসিমুখ, রোজ সকালে হেসে জিজ্ঞেস করবো—কি লীলা ভাল আছ তো?

যেন হোটেলে কার অসুখ করেছে সেই রকম ভাবে সবাই জেগে বসে আছে 'কমন রুমে,' সব বয়েরা আর প্রণতি। ললিতার ওপর রাগ করে অম্বর সেদিন দেশে চলে গেছে, সে দেখে নেবে, সে না হলে কেমন করে চলে হোটেল। একটু একটু ভয় হয়েছে প্রণতির মনে, কে জানে পাগলাটা আবার কি হাঙ্গাম বাঁধিয়ে বসবে দুপুর রাত্তিরে।

চেয়ারে বসে বিড় বিড় করে বকেন খৃষ্টপূর্ব্ব···কি চেয়েছি লীলা? শরীরটা? শরীরটা আজই নষ্ট হয়ে যাক তোমার···আজই পুড়ে যাক ওটা নিমতলা ঘাটে, দাউ দাউ করে।

শ্মশানে দেখেছি আগুন জ্বলছে ধূ ধূ,
জ্বলছে অধর, পঞ্জর, পয়োধর,
ওটা কারটুন, বাঁকা চোখে দেখা শুধু,
ছাই-রঙা ওটা প্রিয়ার শোবার ঘর···

—ভালোবাসা চেয়েছি…ভালোবাসা, যেটা ফুলের গন্ধের মত, অনুভব করা যায়, ধরে রাখা যায় না। ভালোবেসে কি তৃপ্তি পাওয়া যায় কোন দিন?…না, না, ঘাড় নাড়েন খৃষ্টপূর্ব্ব, কেউ কি বলতে পারে, আমি সবটুকু, শেষ পর্য্যন্ত ভালো বাসতে পেরেছি? কেউ কি দিতে পারে ভালোবাসার পেয়ালায় শেষ চুমুক?

তবু ভালোবাসাই চেয়েছি · শেষ পাইনি ভালোবেসে, তবু চেয়েছি সেই শেষটুকুকে না পাওয়া।

খৃষ্টপূর্ব্বর জীবনে শেষ ফুল ফুটছে…অন্ধকার রাত্তিরে চুপি চুপি পাতা জড়িয়েছে ফুলকে…একটু একটু করে ফুটে উঠছে ফুলটা ঐ ঘরে, ঐ সবুজ লেপ-ঢাকা লাল শাড়ীটাকে জড়িয়ে।…

টং টং করে দুটো বেজে গেল ঘড়িতে। খৃষ্টপূর্ব্ব চেয়ারটাতে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছেন…অনেক আপত্তি, অনেক ঝগড়া করে, অনেক পায়ে ধরা, অনুনয়-বিনয়ের পর আজ এসেছে নূরজাহান জাহাঙ্গীরের ঘর করতে। কতদূরে, বাঙলাদেশের বর্দ্ধমানে লোক পাঠিয়ে হত্যা করাতে হয়েছিল তার স্বামীকে।…কি চেয়েছিল জাহাঙ্গীর? নূরজাহানের শরীরটা? ভুল ভুল, একেবারে ভুল…চোখ বুঁজে হেসে ফেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব।…

কোই হ্যায়?…তরুণী বাদী এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়। উর্দ্দু করে বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব…শের আফগান, মেহেরউন্নেসার স্বামী শের আফগান, তাকে ডেকে আনো।…

—সে মরে গেছে, কুতুবুদ্দিন তাকে হত্যা করেছে জাঁহাপনা।

—কুতুবুদ্দিন কোথায়?

—সে শুয়ে আছে শের আফগানের সঙ্গে পাশের কবরে, বাঙলা দেশের বর্দ্ধমান শহরে।

হাসি ফুটে ওঠে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মুখে…মৃত্যুর কোলে জুড়িয়ে গেছে সব দাহ। দু'জন দুরন্ত আততায়ী, পরম শত্রু দু জন বর-বধূর মত ঘুমিয়ে পড়েছে পাশাপাশি।

জ্বালানি কাঠের দালালি করে যে খাই,
কশাইখানায় দেখেছি মাংস কাটে…

বুকের, পায়ের পাশাপাশি মেলে ঠাঁই,
বর-বধূ যেন ফুলশয্যার খাটে—
ফিস্ ফিস্ বলে বুক,
শ্রীচরণেষু গো, এবারে শেষ চুমুক···

লাহোরে চলে গেছেন সম্রাট···রেল লাইনের পাশে নূরজাহানের কবর। অনেক দূরে সরে গেছে রাভী নদী হৃতশ্রী কবরটা থেকে।

তুটো কবর পাশাপাশি। একটা নূরজাহানের, আর একটা শের আফগানের পুত্রীর। নূরজাহান মরবার সময় বাদশা ছিলেন না বেঁচে। সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদা হারিয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, তাই আগের পক্ষের মেয়ের সঙ্গে কত সঙ্কোচে, কত লজ্জায় এই পাশাপাশি শেষের ঘুম।···

—কে তোমরা ? মর্ম্মর আসন থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে তু'জনে, নত হয়ে কুর্ণিশ করে সম্রাটকে···নূরজাহান আর আনারকলি।···অন্ধকার রাত্তিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ভয়ে, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সম্রাটের সুমুখে সম্রাটের তুই প্রেয়সী, নূরজাহান ও আনারকলি।···

আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল সম্রাট আকবরের হুকুমে। বাঁদীর মেয়ের উপর পড়েছিল তরুণ সেলিমের তুরন্ত ভালোবাসা···সে ভালোবাসায় বাধা দিতে পারেন নি সম্রাট। তারপর সেলিম যখন হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, তখন বসিয়ে দিলেন প্রকাণ্ড বাজার আনারকলির কবরের পাশে। আজও চলছে আনারকলির নাম, আজও বসে সেই প্রিয়ার নামের বাজার।···

তরুণী নর্ত্তকীর প্রস্ফুটিত অপরূপ শরীরটা থেকে প্রাণটাকে আগে বের করে দেওয়া হয়নি সেদিন সকালবেলা···সম্রাট আকবরের হুকুমে কবরে সমাহিত হবার পর তবে বেরিয়েছিল সেই অতৃপ্ত পিপাসার্ত্ত প্রাণটা, সতেরো বছরের কচি বুক থেকে।···

ওরা তু'জনে ঝগড়া করছে আর কাঁদছে·· নূরজাহান আর আনারকলি। সম্রাট কাকে বেশী ভালোবাসতেন তাই নিয়ে ছিল ঝগড়া।···

তু'জনে কুর্ণিশ করে বললে, আপনিই বলুন সম্রাট, কাকে বেশী ভালোবাসতেন, আপনিই মিটিয়ে দিন ঝগড়া।···

—সিরাজি লেআও, কোই হ্যায় ?···ঘুমের মধ্যে হেঁকে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব।

প্রণতি ভয় পেয়ে গেছে দস্তুরমত, খৃষ্টপূর্ব্বর চোখ মুখ যেন কিরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। রাত্তির তখন সাড়ে তিনটে।

—উঠে শুয়ে পড়ুন ঘরে ?

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব···শুয়ে পড়বো ? তাহ'লে লীলা কোথায় যাবে ?

—লীলা দেবী চলে গেছেন।

—চলে গেছে ? কই আমি তো দেখতে পেলুম না।

প্রণতি বলে, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, লীলা দেবী জাগাতে বারণ কল্লেন। বল্লেন, কাঁচা-ঘুম ভেঙে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয়, তাহ'লে তাঁর মনে বড় কষ্ট হবে।

—তাই নাকি ? বলেছে তার কষ্ট হবে ? বলবেই তো প্রণতি, ও কথা বলতে সে বাধ্য ; তুমি ভাবছ মদের নেশায় এসেছিল সে ? না, না, ও এসেছিল মনের নেশায়, ওর মনই হয়ে গেছে এখন মদ।···তা, সত্যিই চলে গেছে সে ?

—হ্যাঁ।

—তাহ'লে আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি কবরটার ওপর।

আসলে প্রণতিদেরই দোষ। লোকে কথায় বলে পাগলকে ঘাঁটাতে নেই কখনো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা খৃষ্টপূর্ব্বর অনুপস্থিতিতে একটা বড় পাশবালিশ জোগাড় করে, তাকে লাল একটা শাড়ী পরিয়ে, খৃষ্টপূর্ব্বর বিছানাতে তারই লেপ ঢাকা দিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল প্রণতির দল। তাই দোর খুলে দেখেছিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব লীলা পাশ ফিরে শুয়ে আছে।··· সকালবেলা সত্যি কথাটা ফাঁশ হয়ে গেলে হয়ত একেবারে উন্মাদ হয়ে যেতেন খৃষ্টপূর্ব্ব ; যে রকম হয়েছিল মুখ চোখের চেহারা ! যাক্ বুদ্ধি করে তবু ওরা ভালোয় ভালোয় তালটা সামলে নিয়েছে।

—তেরো—

নয়াদিল্লীর অশোক রোডের একটা বড় বাগানওয়ালা বাংলো। ব্রেক-ফাষ্টের পর ড্রইং রুমে চেয়ারে বসে স্কার্ফ বুনছে উমা ত্রিবেদী। উমার স্বামী ভবেশ ত্রিবেদী এইমাত্র আফিসে বেরিয়ে গেল খুব সকাল সকাল। আজ রবিবার তবু অত্যন্ত জরুরী কতকগুলো কাজ আছে আজ; কাল অফিস বসবার আগেই শেষ করে রাখতে হবে। ভবেশ ত্রিবেদী ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ অফিসার।

ভবেশ পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ, উমা বর্দ্ধমানের কায়স্থ বংশসম্ভূতা বাঙ্গালী মেয়ে। বিলেতে দু'জনের প্রণয় হয় এবং সেইখানেই হয়েছে বিবাহ। ভবেশ আই. সি. এস এবং উমা ডাক্তার, লণ্ডনের এফ. আর. সি. এস।

ভবেশ উমাকে প্র্যাকটিস্ করতে দেয় না। স্থানীয় এবং বাইরের নারী ও শিশু-মঙ্গলের কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে উমা ত্রিবেদী। ভবেশ বলে, অত পয়সা রোজগার করে কি হবে? তার চেয়ে পয়সা খরচ করি এসো।

পয়সা রোজগার না করলে কেমন করে খরচ করব? প্রশ্ন করে উমা।

ভবেশ বলে, তোমার তো অনেক টাকা আছে; তাছাড়া আমিও মাসে মাসে মোটা টাকা মাইনে পাই।

তা সে কথা সত্যি। বিপুল অর্থবান বিপত্নীক ব্যারিষ্টারের একমাত্র কন্যা উমা ত্রিবেদী। একটি ভাই ছিল, তার চেয়ে দু'বছরের ছোট, অশোক; সে পাইলট হবার শিক্ষা নিতে নিতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় ফ্রান্সে। তারপর বাবাও মারা গেছেন। অশোককে হারিয়ে এখন উমাই বেঁচে আছে, প্রেম-পরিণয়লব্ধ ভবেশকে এবং পিতৃদত্ত বিপুল টাকা ও সম্পত্তি নিয়ে।

অমৃতসরের নিষ্ঠাবান দরিদ্র বংশে জন্মেছিলেন ভবেশ ত্রিবেদী। অর্থ ছিল না, ছিল অপূর্ব্ব মেধা···তারই জোরে আজ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় কখনো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নি তিনি।

শিবানন্দ বাবুর কাছ থেকে কি একটা গোপনীয় সংবাদ নিয়ে রণেন পৌঁচেছে ওদের বাড়ীতে আজ তিন চারদিন আগে।

ভবেশ ও উমা শ্রমিক আন্দোলনের দরদী বন্ধু। পৃথিবীব্যাপী আজ যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছে সর্ব্বহারা শ্রমিকদের, নয়া-দিল্লীতে এই দু'জন স্বামী-স্ত্রী সেই আন্দোলনের নীরব অথচ সতেজ কর্ম্মী।

উমা সেদিন সকালে স্কার্ফ বুনছে, সুমুখের চেয়ারে রণেন বসে আছে।

—তুমি এসে পর্য্যন্ত কেমন যেন বেসুরো বাজছে মনের ভেতরটাতে। বোনা থেকে চোখ তুলে মন্তব্য করে উমা।

রণেন হাসে—তাই নাকি? তাহ'লে বলো আজই চলে যাই।

আবার একবার চোখ তোলে উমা—বেসুরো বাজলেই চলে যেতে হবে এর কি মানে আছে? আমি তো সংঘর্ষই ভালোবাসি।

রণেন জিজ্ঞেস করে, কিসের সংঘর্ষ?

চোখ না তুলেই আবার বলে উমা, আগে বিরোধী-সংজ্ঞার সৃষ্টি, তারপর সংঘর্ষ···তারপর সংমিশ্রণ···ইংরেজীতে যাকে তোমরা বলো, থিসিস্. এ্যন্টিথিসিস্, সিনথিসিস্।···কিসের সংঘর্ষ?···দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে উমার মুখে,—যদি বলি আমাকে নিয়ে সংঘর্ষ, দু'জন পুরুষের মধ্যে, ভবেশ আর রণেনের মধ্যে? কলেজে পড়বার সময় কলকাতায় সেই যে ভালোবাসতে, সে কথা আজ মনে পড়ে?

সিগারেটে জোরে একটা টান দেয় রণেন। বলে, দিল্লীতে এই কবরের দেশে আজকে সেই কথাটাকে কবর দিতেই এসেছি উমা··· আজকে সেই পুরোনো কাসন্দি ঘাঁটবার কোন প্রয়োজন নেই আমার।

খানিকটা তৈরী স্কার্ফটাকে টেবিলের ওপর রেখে দেয় উমা। বলে, তোমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার আছে।

—কেন?

উমা হাসে—সেদিন সেই কলেজ জীবনে তুমি ভালোবাসতে আমাকে, আমি বাসতুম না। আর আজ···একটা ঢোঁক গেলে উমা, আজ আমি তোমায় ভালোবাসি, আর তুমি আমায় ভালোবাসো না এখন হ'ল উল্টোরথের গল্প।

রণেন বলে, আগের কথাটা তুমিই জানো, শেষের কথাটা কিন্তু সত্যি, যে আমি তোমায় ভালোবাসি না।

উমা বলে, অথচ বিলেতে ভবেশকে আমি ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলুম। তারপর এখন প্রায় দু'বচ্ছর হ'ল মা হয়েছি আমি ভবেশের সন্তানের···আজ কি মনে হচ্ছে জানো?

মনে হচ্ছে: এখন আমরা যেন দু'জনকে ঠকাচ্ছি দিনরাত্তির, ভবেশ ও আমি। এখন মনে হয়, আমরা আর ভালোবাসিনা পরস্পরকে। ওর চেয়েও বড় কথা আছে ঐ ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে এই যে, আর ভালো-বাসবার দরকার নেই আমাদের।

রণেন চুপ করে আর একটা সিগারেট ধরায়, ফ্যাঁস করে দেশলাই জ্বেলে।

উমা আবার তুলে নেয় আধবোনা স্কার্ফটা···জানো, আমি জড়বাদী মেয়ে···ভালোবাসা কেন, কোন ব্যাপারেই আমরা কোন ধোঁয়াটে যুক্তিকে গ্রহণ করি না···বাঁচতে চাই, তাই ভালোবাসতে চাই, ভালো-বাসতে চাই, তাই বাঁচতে চাই। এর জন্যে একবার কেন, যদি একশোবার ভালোবাসতে হয় তাকেও মিথ্যে বলে ধরবে না যে জীবনে জড়বাদকে সত্যি করে উপলব্ধি করতে পেরেছে। একটা নিঃশ্বাস চাপে উমা··· ঘর আমার জন্যে আমি ঘরের জন্যে নই···আমার জন্যে যতবার ইচ্ছে ততবার ভেঙে ফেলবো আমার ঘর, যেটুকু আমি সমষ্টির, শুধু সেইটুকু আমি নিজের।···বেসুরো বাজছে? কেন বলছিলুম জানো? বলছিলুম এই জন্যে যে, তুমি এসেছ কাকাবাবু অর্থাৎ শিবানন্দ বাবুর কাছ থেকে সমস্ত শরীর মনে ধোঁয়াটে দুর্ব্বলতার বীজাণু নিয়ে। প্লেগের রুগীর মত তোমাকে ছুঁতে, তোমার পাশে বসতে ভয় করছে আমার।

জোরে হেসে ওঠে রণেন···ও তাই বুঝি? তা, কি রকম ধোঁয়াটে দুর্ব্বলতা শুনি?

কাকাবাবু সব কথা গাঁজার ধোঁয়ায় শেষ করে দেবেন, গীতার গাঁজা ; 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'···শরীরের সঙ্গে যে হত হয় না, সেই আত্মা, সেই দেহী···অতএব শরীরটা একেবারেই গৌণ কথা। আমি বলি যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেটাই আমাদের কাছে সত্যি, শরীর হত হলে আত্মা যে আবার অন্য দেহে গিয়ে আশ্রয় নেয় এটা তো একটা সংজ্ঞা নয়, এ একটা প্রমাণসাপেক্ষ থিওরী। অথচ আমরা চোখ দিয়ে, মন দিয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে পাই, শরীরটা নষ্ট হয়ে যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বক ধ্বক করছে বুকের মধ্যে যে প্রাণটা, সেটাও। কাকাবাবুকে আমি অনেকবার বলেছি যে ঐটেই সত্যি আমাদের কাছে···ওর আড়ালে যদি থাকেন ভগবান, যদি থাকেন আত্মা, তা বেশ থাকুন···তবে তাঁরা আছেন কি না আছেন এ-নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

রণেন বলে, কাকাবাবু কি বলেন জানো ? ঐ কাপুরুষের মতবাদ, ঐ এ্যগনষ্টিসিজমের পাশ ঘেঁষা মন, ওর স্থান ইহলোকেও নেই, পরলোকেও নেই। ও মতবাদ যার সে হ'ল ধোপার কুকুর, ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়।

চেয়ারে হেলান দিয়েছিল, এখন সোজা হয়ে উঠে বসে উমা। বলে, বেশ তাহ'লে সোজাসুজিই কথা বলবো···ও সব আত্মা-ফাত্মা, ভগবান-টগবান ওসব কিছু নেই···এই সত্যটাই ধরবো আঁকড়ে। কাকাবাবু বলেন আমরা জড়বাদী···জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমরা জীবনবাদী।

কথা লুফে নেয় রণেন···হ্যাঁ জীবনবাদী, তবে শুধু মৃত্যু পর্য্যন্ত। কিন্তু তার পরেও কথা আছে, তার পরেও আছে অস্তিত্ব···তার রূপকে কাকাবাবু উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেন, জড়বাদীর দর্শন মৃত্যুকে মেনে নেয় সত্য বলে, fact বলে—অথচ মৃত্যু হিসেবে মৃত্যুটা হ'ল একটা মিথ্যা, একটা fiction. ও মৃত্যু নয় অমৃত, ও শুধু সত্য-সুন্দরের পথে ঝনাৎ করে একটা বড়ো সিংহদ্বার খুলে যাওয়ার শব্দ।

—ওরে বাবা, এতখানি ? তুমিও বিশ্বাস কর ঐ সত্য-সুন্দরকে ? তোমারও নাকি ঐ মত ? যে মৃত্যু একটা fiction, মৃত্যু, মৃত্যু নয় ; অমৃত ?

রণেন তীব্রভাবে তাকায় উমার দুটো চোখে, যেন ভেতরটা সে সবটা দেখতে পাচ্ছে। বলে, তাই তো বিশ্বাস করি উমা।

উমা আবার সুরু করে বোনা·· অমৃত ? উমার ভালোবাসার চেয়েও বড় অমৃত ?

রণেন হাসে···যদি অমৃত নাও হয়, যে কোন অবস্থাতেই হোক উমার ভালোবাসার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়তর।

উমা স্কার্ফটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় টেবিলটার ওপর···কি করেছি বলতো তোমার, যে এসে পর্য্যন্ত আমাকে কেবল তুমি অপমান করছ ? রণুদা, এখনও অভিমান ভোলনি ?

রণেন সিগারেটের ছাইটা ফেলে দেয় এ্যাসট্রেতে···অভিমান ? কার ওপর ?

—আমার ওপর ? বলে উমা।

—তোমার ওপর অভিমান করব কেন ?

উমা বলে, তোমার ভালোবাসা গ্রহণ করিনি বলে।

—তাতে কি এসে যায় ? ওপরের দিকে ধোঁয়া ছাড়ে রণেন।

উমা জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে ও কথা বললে কেন অমন করে ? কেন বললে যে, যে কোন অবস্থাতেই হোক উমার ভালোবাসার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়তর ?

রণেন বলে, উমার ভালোবাসা মাটির ভালোবাসা বলে।

—হতে পারে মাটির, কিন্তু কার ভালোবাসার চেয়ে ছোট ? তোমাদের সীতার ভালোবাসার চেয়ে ছোট কি উমার ভালোবাসা, কোন হিসেবে ? বলনা ? তাই বলে কারুর কথায় উঠবে বসবে কি উমা ? উমা কি কারুর সাম্রাজ্য ?

রণেন হাসে—এ কথার কি উত্তর দেবো বলো ?

আবার বোনা সুরু করে ঐ জড়বাদী মেয়েটা। বলে, জীবন থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের মাংসল মনের যে উচ্চ স্তরটা, যেটা তোমাদের অমৃতের ঠিক আগেকার ইষ্টিশান, সেটার কি কোন মূল্য নেই ? যে মনটা নির্ব্বিচারে সকলকে ভালবাসে একভাবে, যে মনটা শান্তিকামী, খাওয়া-পরা থেকে আরম্ভ করে প্রেমিক রসিক মানুষের

উচ্চস্তরটা পর্য্যন্ত স্বীকার করে নেয় যে মন, ধ্যান এবং গানের ওপর সব মানুষের সমান অধিকারের মিষ্টি গানটা যে মনটা গায় সব সময়, সুর কাজে...মাটির মন, মাংসল মন বলে সেটা বুঝি কিছু নয়? অথচ তোমাদের মতে তারও ওপরের যে মন, মৃত্যুর পরেও যে অস্তিত্বের কথা তোমরা বল...সেই কথা সেই ভাবের সুযোগ নিয়েই তো মানুষের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসে, সব সুবিধাবাদীই জনসাধারণের জৈব ও সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাহত ও সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করেছে, তাদের সম্পত্তি শোষণ করে।

রণেন প্রতিবাদ করে...অতীতের ইতিহাসে শোষণের ও দারিদ্র্যের নজীর সব জায়গায় খুব স্পষ্ট নয়, আর তা হলেও, হয়েও যদি থাকে শোষণ, তাহ'লে যারা শোষক, তারাই দায়ী সেই শোষণের জন্যে। দায়ী হয়ত তাদের তৈরী সমাজ-ব্যবস্থাটা, কিন্তু সেজন্যে মানুষের সম্বন্ধে যেটা চরম সত্যাসত্য সেটা এতটুকুও বিকৃত হয়নি। পাপ এসেছিল, লোভ এসেছিল তাই বোধ হয় আজকের মত শোষণ করে থাকবে মানুষ মানুষকে, অতীতে কোনদিন। কিন্তু উমা তোমরা জড়বাদীরাই যে পারবে এই অর্থ নৈতিক শোষণ বন্ধ করতে তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? তোমাদের প্রচেষ্টাটাও তো এখনও প্রমাণসাপেক্ষ, এখনও experimental.

উমা বলে, অঙ্ক কষলে উত্তর তো এইটেই পাওয়া যায় যে, ঐ পথে নিশ্চয় আসবে সিদ্ধি, অতএব প্রজ্ঞালব্ধ ঐ অঙ্ককে আশ্রয় করে চেষ্টা তো করতে হবে?

রণেন একটু যেন অস্থির হয়ে ওঠে...কিন্তু অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সাম্য আনবার জন্যে জড়বাদই মানতে হবে কেন মানুষকে? অন্য কোন সমাজব্যবস্থা দিয়েও তো আনতে পারা যাবে ঐ অতি প্রয়োজনীয় সমতা?

রাগ করে উমা...এই বৃত্তের ওপর দৌড়ে দৌড়ে কেন হাঁফিয়ে মরছি আমরা? তার চেয়ে তুমি থাকো তোমার ঐ অধ্যাত্মবাদকে নিয়ে।...

—তাতো থাকবোই।

—উঠে দাঁড়ায় উমা, রণেনের হাত ধরে টেনে ওঠায় চেয়ারটা থেকে। বলে, তার চেয়ে চলো যাই বাগানে বসি।

একটা বড় গাছের তলায় বেতের চেয়ার রয়েছে তিন চারখানা, একখানা রয়েছে বেতের টেবিল। ছুটো চেয়ারে বসে পড়ে ওরা পাশাপাশি।

খুব শীত পড়েছে দিল্লীতে···রোদ্দুরে. টেনে নেয় উমা নিজের চেয়ারটাকে। বলে, শীত করছে না? রোদ্দুরে সরে এসো।

বড় একটা হলদে ফুলের ওপরে তিনটে মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে গুনগুন করে···মাঝে মাঝে গিয়ে বসছে ফুলটার ওপর।

উমা ফুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসে বলে, ঐ দেখছো, একটা ফুলের ওপর ঘুরছে তিনটে মৌমাছি?

রণেন বলে, দেখছি।

উমা বলে, জৈব-জীবনের ঐ হ'ল সত্যরূপ, একটা ফুলের পেছুনে তিনটে মৌমাছি, একটা মৌমাছির পেছুনে তিনটে ফুল। ও ছবিটা মানুষের সম্বন্ধেও সত্যি···মানুষ বহু-বিবাহ কামী।

রণেন বলে, ও সত্যটা আজও উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি···প্রথম যৌবনের অতি-উচ্ছ্বাসের সময় হয়তো কোন মানুষের মনে আসে বহু-বিবাহের মদের নেশা···কিন্তু নেশার অবস্থায় যেটা সত্যি, সেটা তো শাশ্বত সত্যি নয়, নেশা কেটে গেলে তার অস্তিত্ব ফুরিয়ে যায়।

একটা নিঃশ্বাস চাপে উমা···ক'টা ধোপ সহ্য করতে পারবে জামাটা এটা বড় কথা না, একটা ধোপেও যদি ছিঁড়ে যায় সেটা, তবু, তবু আমার জামাটা পরতে ভাল লাগছে···এই কথাটাই বড়?

রণেন হাসে। বলে, তোমাদের অর্থনীতির হিসেবে ও ছুটোই সত্যি, ভালোও লাগা চাই, ধোপেও টেঁকা চাই।

উমা চোখ টেনে বলে, ক্ষণভঙ্গুর যেটা, তার তাহ'লে কোন মূল্য নেই?

রণেন উত্তর দেয়, আমাদের কাছে তো ক্ষণভঙ্গুর বলে কোন বস্তু নেই···'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—এটা মানুষের সম্বন্ধেও যত সত্যি, ফুলের সম্বন্ধেও ঠিক ততখানি সত্যি।

আবার আসছে সেই বৃত্তটার ওপর ছোটাছুটির সম্ভাবনা।

উমা হেসে বলে, তুমি দেখছি অনেক ওপরে উঠে গেছ রন্টুদা, তোমাকে আর ছোঁবারই জো নেই!

রণেন বলে, তাহ'লে ছুঁয়োনা।

—তুমি বুঝি ঐ অধ্যাত্মবাদ নিয়েই থাকবে এবার? উমাকে বুঝি একলা ছেড়ে দেবে রেলগাড়ীর কামরায়?…একলা ছেড়ে দেবে পথে?

রণেন হাসে…অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি উমাকে।

টেবিলের ওপর ফুলদানীতে ছিল একটা বড় রক্ত গোলাপ, উমা সেটাকে নিয়ে একবার শুঁকলে মুখের কাছে তুলে, তারপর কুঁচি কুঁচি করে ছড়িয়ে দিলে ফুলটা একটা লাইন করে তার পায়ের তলায়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, বেশ তাই ভালো, ঐ দেখ ঐ চলেছে আমার পাপড়ীর রেলগাড়ী। একলা বসে আছে উমা ঐ একটা পাপড়ীতে…আগে রণেন এসেছিল একদিন, ভালো লাগেনি রণেনকে… তারপর রণেন নেবে গেল গাড়ী থেকে, একটা ইষ্টিশানে, রাত্তির বেলা। …ঢং ঢং করে বাজলো ঘণ্টা, গার্ড সাহেব বাজালে বাঁশী, দেখালে সবুজ আলোর সঙ্কেত…আবার চললো গাড়ী পরের ইষ্টিশানে…সেখানে এলো ভবেশ। ভালো লাগলো তাকে, খুব জমলো তার সঙ্গে গান, খুব ঘনালো ভাব ও বন্ধুত্ব…তারপর তাকে তো আর ভালো লাগছে না মোটে।…

রণেন বলে, যদি তাকেই ভালোলাগে আবার?

উমা ময়ূরের মত ঘাড় বাঁকায়…তাহ'লে তাকে নিয়েই চলে যাব একেবারে শেষের ইষ্টিশানে; তাহ'লে সীতার মত রামচন্দ্রকে নিয়েই আজীবন ঘর করবে উমা…ফলে ফুলে ভরে উঠবে উমার ঘর, উমার জীবন…সব রাবণকে পদাঘাতে তাড়িয়ে দেবে উমা।…কিন্তু রন্টুদা, আর যদি ভালো না লাগে ভবেশকে?

রণেন জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে?

উমা বলে, তাহ'লে আবার হয়ত আসবে রণেন পরের ইষ্টিশানে, তখন আবার বাঁধবে উমা রণেনের সঙ্গে ঘর। আবার ফেনিয়ে উঠবে

সত্যি, জীবন্ত ভালোবাসা ; রণেনকে নিয়ে আবার ফুটবে উমার ঘরে ফুল ফল, আবার গেয়ে উঠবে ডালে ডালে সুরে-মাতাল কোকিল পাখীটা।…

—তখন কোথায় থাকবে ভবেশের সন্তান ? জিজ্ঞেস করে রণেন।

দু'চোখ বন্ধ করে উমা বলে, রাষ্ট্রের কাছে, নয়ত ভবেশের কাছে… তার জীবনেও হয়ত আবার আসবে নতুন ভালোবাসা…তখন যদি ভবেশ এসে কোনদিন জিজ্ঞেস করে আমার ভালোবাসার কথা, তখন তাকে কি বলবো জানো ? বলবো, তোমায় ভালোবেসেছিলুম ঠিক সীতার মত।…

রণেন বলে, তারপর যদি রণেন এসে জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে ?

—তাহ'লে ? আবার পাখীর মত ঘাড় বাঁকায় উমা,—তাহ'লে তাকেও বলবো, তোমাকেও ভালোবাসি সীতার মত…উমা তো কারুর সাম্রাজ্য নয় যে বুর্জোয়া-পত্নী হতে যাবে কারুর ?…যতক্ষণ ভালো লাগবে ততক্ষণ ভালোবাসবে উমা…মন প্রাণ সব দিয়ে সীতার মত ভালোবাসবে। তারপর যখন ফুরিয়ে যাবে সে ভালোবাসা,…তুমি কি ভাবছ তখন উমা কাঁদতে বসবে,—রুক্ষ চুলে, বক্ষে করাঘাত করে ? না না, ঢং ঢং করে বাজবে ঘণ্টা. সবুজ আলো উঠবে জেগে…আবার ছেড়ে যাবে গাড়ীটা অন্য ইষ্টিশানের জন্যে।…রন্টুদা, একদিন ভালোবাসতে তো ? সেই ভালোবাসার কথাটা একটু মনে করে নাও চেষ্টা করে, সেই ভালোবাসা, সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি নিয়ে আজকে কামনা কর আমার জন্যে, এমনিই যেন এগিয়ে চলে উমা, জীবন উপলব্ধির পথে, ইষ্টিশানের পর ইষ্টিশানে, এই ভালোবাসার রেলগাড়ীতে। বলো, ঝরা-ফুল জিন্দাবাদ… এমনি চলুক উমার জীবনে ঝরা-পাপড়ীর লাল মিছিল !…

* * * *

সেদিন দিল্লীতে বাগানে বসে যখন কথা কইছে উমা আর রণেন তখন প্রায় বেলা দশটা। তখন আধুনিকা হোটেলের দশ নম্বর ঘরে চলিত ভাষায় যাকে বলে, চড়াইভাতি, অর্থাৎ একটা খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হচ্ছে।

দশ নম্বর ঘরে থাকে সুশোভন মুখোপাধ্যায়, এই সবে সেদিন সে অর্থনীতিতে এম, এ পাশ করেছে। সুশোভনের অর্থনীতির ওপরে

লেখা ভালো একটা প্রবন্ধ স্থানীয় একটা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেদিন, এবং সেই জন্যে সুশোভন সেই প্রবন্ধের দাম হিসেবে কুড়ি টাকা পেয়েছে সংবাদপত্রের অফিস থেকে। সুশোভনের সাংবাদিকতার এই হ'ল প্রথম উপার্জ্জন, অতএব বন্ধুদের জিবে জেগেছে নায়গারার জলপ্রপাত।

ছাত্রাবস্থার বন্ধু, সব ক'জনই ছাত্র, সবাই এম. এ ক্লাসে পড়ে। পৃথিবীকে, জীবনকে দেখার ভঙ্গী ওদের নতুন ধরণের; ছোপান শাড়ীপরা তরুণীর মত ওদের ভবিষ্যতটা ওদের চোখে উত্তেজনা ও বিচিত্র সম্ভাবনাময়। বই পড়া, ছবি দেখা, খেলা দেখা, নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও রস সংগ্রহ করার চেষ্টা করা, ও চেষ্টা করার ভান করা,—নতুন কিছু অসাধ্য সাধন করার ইচ্ছা, নাস্তিকতা ও বিগ্রহ চূর্ণ করার তরুণ বয়সের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি, খেয়ে বেড়ানো ও উদরাময়, এই ক'টা কথা দিয়ে মোটামুটি বুঝতে পারা যাবে ওদের ভেতরকার রূপ।

ভিলা, টুনা, সিধু, ভুন্নু ও যোগেশ এই পাঁচজন হ'ল চড়াইভাতির নিমন্ত্রিত বন্ধু। সুশোভন নেমন্তন্ন করবার সময় চড়াইভাতি কথাটা ব্যবহার করেছিল···আজ হোটেলে চড়াইভাতিতে তোমাদের পাঁচজনের নেমন্তন্ন। ভিলা আপত্তি করে কথাটায়···ও ভাষার অপব্যবহার সহ্য করতে পারে না। ভিলা বলে,—চড়াইভাতি আজকাল আর কেউ বলে না, ওর কোন শাব্দিক অর্থও বর্ত্তমানে নেই। তার চেয়ে বল্ খাওয়াদাওয়া কিম্বা আনন্দভোজ।

টুনার প্রত্নতাত্ত্বিক মন, সে ভিলার কথার উত্তর দিলে: ওটা হ'ল নদীবহুল দেশের কথা, বোধ হয় পূর্ববঙ্গের। ঘরবাড়ীর অতি-পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে মানুষের পলায়নধর্ম্মী মন নিয়ে যেত সবাইকে, নদীর কোন নতুন অজানা চড়ায়···সেইখানেই হ'ত গান, গল্প, খাওয়াদাওয়া। অতএব আমাদের আজকে মনে করে নিতে হবে যে সুশোভনের হোটেলের ঘরটা হচ্ছে দশদিন আগে যে নতুন চড়াটা উঠেছে পদ্মার বুকে···সেইটে। সিধু অত্যন্ত বেশী সুপুরি খায়, পকেট থেকে খানিক সুপুরি বার করে মুখে ফেলে দেয়। বলে, হ্যাঁ, তা তো

বটেই, সেটা তো বটেই…পদ্মানদীর চড়াতো বটেই, আর তার ওপরে ঘন সুপুরির বন।…

যোগেশ সঙ্গীতজ্ঞ, সে দাঁত দিয়ে নখ কাটে কামড়ে কামড়ে। একটা বাছুর যাচ্ছিল রাস্তায় সুমুখ দিয়ে, যোগেশ ভিলাকে বল্লে, ছাখ্ ঐ বাছুরের মুখটা ঠিক যেন প্রবোধ বাবুর মুখের মত দেখতে, না? প্রবোধ বাবু হোটেলের একজন বোর্ডার, গান শেখেন যোগেশের কাছে।

অর্থাৎ খাওয়া হবে এইটেই বড় কথা, এবং অন্য কিছু হোক না হোক মাংস খাওয়া হবে, এইটেই হ'ল আরো বড় কথা। সুশোভনের পাশের ঘরে তার দেশের একজন পরিচিত ভদ্রলোক সমরদা ও তার স্ত্রী নমিতা থাকে, তাদের তিনটি সন্তান নিয়ে। সমরদা এখানে কোন একটা সদাগরী অফিসে মোটা মাইনের চাকরি করে। সুশোভনের অনুরোধে নমিতা সম্মত হয়েছে সেদিনকার চড়াইভাতির মাংসাদি রন্ধন করে দিতে। নমিতারা ছেলেপিলে নিয়ে পাঁচজন, আর সুশোভনরা ছ'জন: তারপর দুটো বয় রাজী হয়েছে বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, দোকান থেকে জিনিসপত্তর আনা ইত্যাদি করতে, তাদের নিয়ে তেরো জনের খাওয়া…তিনসের মাংসতো লাগবেই,—নাকি চারসের? নমিতা সুশোভনকে বল্লে, চারসের তো লাগবেই, বরং পাঁচসের আনাই ভালো …তোমার দাদার লগ্নে রাহু কিনা, উনিই তো দেড়সের মাংস শুধু মুখেই খেয়ে ফেলতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে, তোমরা যদি বল, তাহ'লে আরো বেশী খেতে পারেন।…সুশোভন ও তার পাঁচজন বন্ধুরই মুখ শুকিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে খাওয়া কমাও আন্দোলনের কথা এসে পড়ে। ভুন্নু বলে, এই দুর্দ্দিনে খাদ্য নিয়ে এরকম বিলাসিতা করতে দেওয়াই উচিৎ নয়…একজন লোকেই দেড়সের মাংস খেয়ে ফেলবে? এ একেবারে অসহ্য।…

ভিলা বলে, তারপর ওতো হ'ল সমরদার কথা, তারপর বৌদিরওতো বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, উনিই বা কোন সেরটাক না খেয়ে ফেলবেন?

মাংস কেনার ব্যাপার নিয়ে সেদিন সকালবেলা বেশ গোলমাল লাগলো ওদের ছ'জনের মধ্যে। সকাল সাতটায় সুশোভনের ঘরে

বসেছে ওদের মাংস কেনার মিটিং···সমরদা'র সম্বন্ধে টুনা মন্তব্য করলে: ঐ হচ্ছে ঠিক ক্যাপিট্যালিষ্টের রূপ—সব কিছু নিজেই খেয়ে ফেলবো, শুধু মুখেই দেড় সের চাই।···

ভিলা বুদ্ধি করে বলে, ওদের ওখানে রান্না বন্ধ করে দিলে হয় না? পাঁচ সের মাংস কিনতে হলে তো পনেরো টাকা, তারপর আর সব? পাঁচ টাকা রাখতে হবে তো আবার, সিনেমা দেখার জন্যে? তার চেয়ে ওদের ওখানে রান্না বন্ধ করে দেওয়া হোক···তারপর হতাশ ভিলা গান গাইতে লাগলো শুয়ে শুয়ে···'যাত্রা হ'ল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার'।···

সুশোভন ওকথায় রাজী হ'ল না। বল্লে, তা কি হয়? একবার বলেছি, এখন বন্ধ করলে পিতা, মাতা ও সন্তানদের মুখে মাংসের স্বপ্নে যত জল জমেছে এসে, তাতে স্নান করলেও আমাদের মুক্তি হবে না।···যাক স্থির হ'ল পাঁচ সের মাংসই আনা হবে ··আর যা কিছু বেশী খরচ হবে ধারধোর করে চালিয়ে নেবে সুশোভন।

ভুমু বল্লে, এই তো চাই, আরম্ভ করে আবার ভাবনা করো কেন? গান গেয়ে ওঠে ভুমু···'ওগো মহারাজ কেন মিছে হাত টানো'।···

হোটেল থেকে সামান্য একটু দূরে মাংসর দোকান···পাশে দু'চার-খানা দোকানের পর একটা রেঁস্তোরাতে রেডিও বাজছে···জনপ্রিয় একটা ছায়াচিত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা হিন্দি গান···ঘুরে-ফিরে গান ফিরে আসছে বারে বারে একটা কলিতে: 'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা'।··· রেডিও শুনতে ছোটখাটো ভীড় জমে গেছে রেঁস্তোরাটার আশপাশে, ফুটপাথের ওপর।

মাংস কাটতে কাটতে তালে তালে মাংসওয়ালা গাইছে, 'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা'।···একটা বেঁটে দাড়ীওয়ালা লোক ডান হাতে একটা বড় বাতাবীলেবু নিয়ে ফুটপাথের ওপরে প্রায় নাচতে আরম্ভ করেছে ঐ কলিটা গেয়ে গেয়ে। মাংস কিনতে এসেছেন আর একটি ভদ্রলোক, তিনি বিজ্ঞের মত বলছেন, কি অপূর্ব্ব এই গান···এই সিনেমা-থিয়েটার ছিল বলেই আজকের মানুষ এই পরমানন্দ ভোগ করতে পারছে··· তা' না হলে বাধ্য হয়ে হয়তো অনেক নিকৃষ্ট আনন্দের পেছুনে ছুটতে হ'ত তাকে···আর একজন বল্লে, তা বুঝি জানেন না? যদি গভর্ণমেণ্ট

হঠাৎ বন্ধ করে দেয় সব থিয়েটার সিনেমা, দেখবেন কলকাতার সব লোক উন্মাদ হয়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়!···

যোগেশ দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে নখ কামড়াচ্ছে বাঁ হাতের।··· ক্ষ্যাপা নদীর মত ছুটছে সুরের স্রোত রেডিওতে রেডিওতে···'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা'···আয়েগা মানে তো আসবে, কে আসবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে, আসবে, ঐ এলো বলে···ঐ বোধ হয় এসে পড়েছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সমষ্টিগত মৃত্যু!' বহু পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে পৃথিবীতে, ঐ বোধ হয় লক্ষ্মীছাড়ার রথ এসে পড়লো!···

অমারাত্তির বুকেজাগা টুক্‌রো সকালবেলা,
কাস্তে-চাঁদে আসে, আসে মধ্যদিনের মেলা;
আসে আসে, টাঙি হাতে চলে আসার পথ,
নরমুণ্ডের খোয়া ঢেলে করাই মেরামত,
জ্যান্ত মানুষ শুইয়ে পথে রোলার চালাই জোরে,
এক্ষুনি যে পৌছে যাবে লক্ষ্মীছাড়ার রথ।···

—'আয়েগা আয়েগা আয়েগা'···এবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব পাপ, সব গ্লানি···পৃথিবীতে আর কোন অন্যায়, কোন অসাম্য থাকবে না · তারপর আবার আসবে শান্তি ও কল্যাণ।···

দুনিয়াতে থাকবে নাকো একচোখো সে লক্ষ্মী,
যক্ষির ধন থাকবে নাকো, থাকবে নাকো যক্ষি,
শোক কিসে তা জানতে পাবে অশোক বনের চক্র,
গিলিয়ে দেবে লক্ষ্মীছাড়া গেলাস গেলাস তক্র···
জন্মেছে তো অনেক গ্লানি, এবার বহু কমবে,
কচ্‌কচিয়ে কাটতে জানে কাস্তে শশী বক্র।···

—কিন্তু সবাই তো আর এক মানে করে না। আধুনিকা হোটেলে রেডিও বাজছে···সমরদা আর নমিতা বৌদি হয়তো ভাবছে: আয়েগা, আয়েগা, মাংস্‌ আয়েগা।

সুশোভনের দল মাংসর দোকানে দাঁড়িয়ে হয়তো ভাবছে: 'আয়েগা কিন্তু সমরটাই তো সব খায়েগা।

খৃষ্টপূর্ব্ব হয়তো ভাবছেন···আয়েগা, আয়েগা, লীলা আয়েগা।

পাঁচসের মাংস তোয়ালেতে বেঁধে হাতে করে ঝুলিয়ে আনছে ওরা। মায়ের মত পরম স্নেহে পালা করে এক একজন করে বইছে, অত্যন্ত প্রিয় সেই রক্ত-মাংস-ভরা হাতের পোঁটলাটা।

চার পাঁচজন রুক্ষ গোছের লোক এগিয়ে আসে ওদের সুমুখে। বলে, কই যান মাংস লইয়া?

আশ্চর্য্য হয়ে যায় ওরা। টুমা প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো? আপনার তাতে কি দরকার?

লোকটা বলে, দরকার আছে মশয়, আমরা হইলাম রিফিউজি, জানেন? মাংস খাইতে পাইনা। আপনারাই নাকি একলা খাইবেন মাংস? ঐ মাংস আজ আমাগো ছাইড়া দ্যান্।···

মাংস তখন ভুদুর হাতে। ওরা সবাই হাতগুটিয়ে দাঁড়িয়ে যায়; মাইরি আর কি? দিয়ে দেবে পুঁটুলিটা···একেবারে মামার বাড়ীর আব্দার পেয়েছে!

রিফিউজিদের মধ্যে একজন ষণ্ডা গোছের লোক বলে, আমরাও খাইতে জানি মাংস, বলে হঠাৎ ছোঁ-মেরে ভুদুর হাত থেকে মাংসর পুটুলিটা নিয়ে নেয়, তারপর পাঁই পাঁই করে ছুটতে ছুটতে ওরা ঢোকে একটা গলির মধ্যে···সুশোভনের দলও ছুটতে থাকে পেছুনে পেছুনে। কাপুরুষের মত পেছিয়ে যাবে কি ওরা? ছিঃ ছি কাঁচা মাংসও চুরি হচ্ছে আজকাল কলকাতায় দিনদুপুরে!

চোর, মাংস-চোর, চেঁচিয়ে উঠল কে একজন···তারপর ওদের সঙ্গে ছোটবার দলে জুটেছে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন মাংস-লোভীর দল···অনেক দোকান থেকে সব বেরিয়ে বেরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

যোগেশের মনে শিল্পীর অনাশক্তি—সে দৌড়োচ্ছে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের নখ কামড়াচ্ছে আর দেখছে ওদের দৌড়োনো·· মনে মনে বলছে, ও মাংস কি আর পাওয়া যাবে? ও এক্ষুনি কার বোগনোর ভেতর সেদ্ধ হবে টগ্‌বগ্ করে!···

রেডিওতে গান চলেছে স্রোতের মত: 'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা'।···

মাংস-চোরদের দেখা পাওয়া গেল না। উল্টে পুলিস এসে পশ্চাৎধাবনকারী সকলকে কম্যুনিষ্ট ভেবে গ্রেপ্তার করে ফেললে। কাঁচা মাংস চুরি ? এ নিশ্চয় কম্যুনিষ্টের কাজ।

যোগেশ ছাড়া স্থশোভনের দলের সবাইকে যেতে হ'ল থানায়। ছাড়া পেতে বেজে গেল বেলা প্রায় তিনটে। ওদিকে মুখ শুকিয়ে বসে আছে ঘরে সারাবেলা সমরদা, নমিতা বৌদি ও ছেলেপিলের দল। স্থশোভনরা আসবে আসবে করে হোটেলের খাওয়াটাও খায়নি ওরা বেলা তিনটে পর্য্যন্ত।

তারপর যেন মড়া পুড়িয়ে ফিরছে এমন অবস্থায় একলা স্থশোভন ফিরলো হোটেলে।

—চোদ্দ—

স্থশান্তর বন্ধুরা প্রায়ই বলতো, মুখোশটা খুলে একদিনও তোমার মুখটা দেখালে না। আসলে তুমি যে কি, সেটা আজও বুঝলো না কেউ।

স্থশান্ত হেসে জিজ্ঞেস করতো, কেন ?

বন্ধুরা বলতো, কেন কি ? তুমি মুসলীম লীগকে চাঁদা দেবে, হিন্দু-মহাসভাকে চাঁদা দেবে, কংগ্রেসকে, কম্যুনিষ্ট পার্টিকে, ফরওয়ার্ড ব্লককে, সবাইকে চাঁদা দেবে স্থমুখে এলেই···এটা কিরকম কথা? তোমার নিজস্ব মত কি কিছুই নেই ?

স্থশান্ত হাসে। বলে, আমার নিজস্ব মত হলো এই যে, শেষ পর্যন্ত কালো মেয়ে, অর্থাৎ সত্যই জয়ী হবে চিরদিন। সে সত্যের রূপটা কি তা' নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনা আমি···শিবের সঙ্গে অশিব শক্তিকেও সাধ্যমত অর্থ দিয়ে সেবা করি আমি এই জন্যে, যে বিরোধী শক্তি, অর্থাৎ তোমরা যেটাকে এ্যান্টিথিসিস্ বলো, সেটারও যুদ্ধের শক্তি বাড়িয়ে দিলে, যুদ্ধটা শীগগির শীগগির এগিয়ে আসবে, এবং যুদ্ধের পরের কথা তো ভাববার কিছু নেই, যেহেতু শিবের জয় অবশ্যম্ভাবী। আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় স্থশান্ত···মা সেই ছেলেবেলা যে কথাটা মনের

মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র—সেইটেই হ'ল আমার কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা···ঐ মন্ত্রের ধ্যান করলে তো মনের মধ্যে ভেদাভেদের অনুভূতি থাকবার কথা নয়।

সহপাঠী মহেশ ও জিতেন সেদিন সকালবেলা এসেছিল সুশান্তর বাড়ীতে, সেদিন কথা উঠতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ দর্শন-ঘেঁষা যুক্তিগুলো বন্ধুদের শুনিয়ে দিলে সুশান্ত।

মহেশের তোতলা জিভটা রাগ হ'লে বিশেষ করে 'ত', 'থ', এবং 'জ' এই তিনটে অক্ষরের ওপর হোঁচট খায় বারে বারে। সেদিন রেগে উঠলো মহেশ, তা—তা হ'লে তো—তোমার কাছে সব স—সমান? যে সাধু, আর যে—যে—যে চুরি করেছে, সেও? আমি হলে চোরকে জু—জু—জুতো মেরে তা' তাড়িয়ে দিতুম!

তারপর প্রশ্রয় কথাটায় এসে বড়ো আটকে গেছে মহেশ···চোখ, মুখ অনেক বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, তারপর বেরুলো প্রশ্রয় কথাটা; অর্থাৎ মহেশ জিজ্ঞেস করলে, চোর যে, তাকে সুশান্ত কেন প্রশ্রয় দেবে?

সুশান্ত হাসে। বলে, চোর বা সাধুর ওপর জজিয়তি করার আমি কে? বিশেষ করে আমি যখন নিজেই বড় চোর। লোকে নিজে থেকে কখনো চুরি করেনা. চুরির কারণ অর্থাৎ তার প্রবৃত্তিটা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তবে চুরি-করার কারণ আর চোর এক জিনিস নয়।···আমার মত কি জানো? আমার মতে পৃথিবীতে কেউ খারাপ লোক নেই।

আরো রেগে ওঠে মহেশ,—বেশ, তা—তাহ'লে থা—থা—থাকো তোমার মত নিয়ে।···

সিগারেটে একটা টান দিয়ে জিতেন বলে, আসলে তুমি ব্যবসাদার নও। টাকা রোজগার করলেই তো শুধু হোল না, ব্যবসাদারকে টাকা জমাতেও হবে।

সুশান্ত হাসে···ওটা খুব সত্যি কথা, যে আমি ব্যবসাদার নই···আমি তো ব্যবসা করিনি, আমি ভালোবেসেছি; কালো মেয়ে যাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুমুখে তাকেই ভালোবেসেছি, তারই করেছি সেবা। একটু থামে সুশান্ত, একমুহূর্ত্তের জন্যে কি যেন একটা ভেবে নেয় একটু··· তারপর বলে, আমার জীবনের রূপটা শুধু খরস্রোতের, শুধু এগিয়ে চলার

রূপ···নদীর জল অনেক ঘাটে ভাসিয়ে দেওয়া সব ফুলগুলোকে এক সঙ্গে চায় একভাবে···আমি সবাইকে চেয়েছিলুম একসঙ্গে, সবাই চেয়েছিল আমাকে ঘরের মধ্যে, একেবারে একলা নিজস্ব করে।

মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও চা খাবার খাওয়ালে সুলতা। চলে গেল জিতেন আর তোতলা মহেশ···সকাল তখন ন'টা। কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে সুশান্ত বাইরের ঘরে।

প্রদীপের আলো কমে এলে মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে উস্‌কে দিতে হয় সল্‌তেটাকে···মোনোর বেলাতেও ঐ উপমাটা খাটে, মাঝে মাঝে কে এসে যেন উস্‌কে দিয়ে যায় ওর হাসিটা।

সেদিন সকালবেলা মহেশের তোতলামী বেশ করে উস্‌কে দিয়ে গেছে ওর হাসি···সুলতাও যোগ দিয়েছে সেই উস্কুনিতে; মহেশ ও জিতেন চলে যাবার পর ঘরের মধ্যে বসে ওরা অভিনয় করছে মহেশের তোতলামীর। সুলতা বলছে জানো মোনো, আমি হলে চোরকে জু—জু—জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতুম। কিছুতেই প্র—প্র—প্রশ্রয় দিতুম না।···

হাসতে হাসতে প্রায় বেঁকে যাচ্ছে মোনো বসে বসে···হা-হা-হা-হা! সুরমা দৌড়ে বাইরের ঘরে গেল সুশান্তকে ডাকতে·· বাবা এচো শীগ্‌গির, মোনোদিদি ছুদা হাঁচি হাঁচ্ছে।···

সুশান্তর সঙ্গে বিদ্যুৎ এসে দাঁড়ালো সুলতার ঘরে।

সুশান্ত বলে, লতা, এই দেখ কে এসেছে।

মাটির ওপর নত হয়ে সুলতার পায়ের ধুলো নিলে বিদ্যুৎ। বল্লে, বৌদি, আমি বিদ্যুৎ।

—আসুন, আসুন, বসুন—দাঁড়িয়ে উঠে সম্বর্দ্ধনা করলে লতা। হেসে বল্লে, আজ বিদ্যুৎ, কিন্তু সেদিন কি ছিলেন? 'বাঙ্গালার মাটি' সমিতির সভায়? সেদিন তো বোরকা-পরা আফজলউন্নেশা? বাবা, এতও পারেন আপনি,···হা হা করে হেসে ওঠে সবাই।

হাসির বেগকে কোনরকমে ভেতরে ঠেলে দিয়ে মোনো পুতুলের মত উঠে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। পুতুলের মত এই জন্যে বলছি যে, ভয়ে তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে একেবারে। ভয় আফজলউন্নেশাকে নয়, ভয় শুধু এই ভেবে যে তোতলা মহেশ

সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে আবার যদি তোতলামী আরম্ভ করে দেয়, তাহ'লে সৌজন্য ও শিষ্টতা রক্ষা করা দায় হয়ে পড়বে

সুলতা পরিচয় করিয়ে দেয় : মোনো, মনোলতা, আপনার দাদার ভাইঝি···ও কিন্তু ভায়ানক দুষ্টু মেয়ে, একবার হাসতে আরম্ভ করলে কিছুতে থামবে না, ওকে ভুলেও কখনো প্র-প্র-প্রশ্রয় দেবেন না।···

—ওরে সর্ব্বনাশ, আর কি রক্ষে আছে ? হা-হা-হা-হা,—আবার ফেটে পডলো হাসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোনো ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে, যেন হাসির ধাক্কায় শিরদাঁড়াটা ভেঙে গেছে পটাস্‌ করে।···

সুশান্ত বুঝিয়ে দিলে···মোনোর হাসি ভূমার হাসি। যাকে বলে ষোল আনা হাসি, এ ঠিক তাই ! কেউ তোতলামী করলে, কারুর মুখে হাঁ-করা অবস্থায় ঝাঁটার তাড়া খেয়ে আরশুলা গেল ঢুকে, কোথায় কীর্ত্তনের সভায় খোল বাজাতে বাজাতে কে টুলের ওপর থেকে হঠাৎ খোলটাসুদ্ধু উল্টে পড়ে গেল···এই রকম সব ব্যাপারে জেগে ওঠে মোনোর হাসি·· সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হাসি। যে হাসিতে ব্যক্তিগত কোন জমাখরচ নেই, যে হাসিতে নেই কোন নিজস্ব সুখ বা দুঃখ, যেটা শুধু নিছক আনন্দের বিশুদ্ধ হাসি···সেই হ'ল মোনোর হাসি।

তারপর হাসিমুখে সুলতা জুগিয়ে দেয় কথা···যে হাসি একবার আরম্ভ হ'লে কিছুতেই থামতে চায় না, ফিটের মত মুখে চোখে জল দিতে, বাতাস করতে হয় যে হাসিতে, সেটাই হ'ল মোনোর হাসি।

মোনো তখন কলতলায় গিয়ে ঢুকেছে চোখে মুখে জল দিতে।

বিদ্যুৎ বল্লে, ওঁকে তো দেখেছি সেদিন 'বাঙলার মাটি' সমিতিতে।

লতা ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ মোনোও গিয়েছিল সেদিন আমার সঙ্গে। কিন্তু সেদিন তো হাসি শোনেন নি আপনি।

হাত দিয়ে লতার মুখ চেপে ধরে বিদ্যুৎ···বৌদি বলে ডাকলুম, পায়ের ধূলো নিলুম, তবে কেন অপমান করে আপনি বলে ডাকছো ? তুমি বল। বল, বিদ্যুৎ ঠাকুরঝি, খাবার খাবেনা তুমি ?

—ও তাইতো ! ব্যস্ত হয়ে উঠতে যায় লতা। ছোট ননদ এসেছে আপনা থেকে অনাহুতের মত···তাকে আদর-যত্ন করতে হবে তো ? ভাল করে খাবার খাওয়াতে হবে তো তাকে ?

হাত ধরে টেনে বসায় বিদ্যুৎ লতাকে···খাবার আমি খেয়ে এসেছি ভাই বৌদি···আজতো পোষ-পার্ব্বণ···পিঠে, পুলি, পায়েস, এ-সব যদি খাওয়াও তো খেতে পারি···তবে এক সর্ত্তে···তোমাদের সঙ্গে আমিও তৈরী করবো আজ পোষ-পার্ব্বণের খাবার।

'সাধু সাধু', বলে হেসে ওঠে সুশান্ত আর সুলতা।

বিদ্যুৎ বলে, জানো বৌদি, আমি বাঙাল দেশের মেয়ে। তুমি হলে ঘটি···একদল মাতাল লোক আজকের বাঙালীর এই অবস্থাতেও বাঙাল ঘটি নিয়ে মারামারি করছে।···বাঙাল ঘটিতে আজকে হোক পিঠে তৈরী করার প্রতিযোগিতা। দাদা হবেন বিচারক, আমপায়ার···কি দাদা টানবে তো ছোট বোনের দিকে ? না হলে ভাইফোঁটার দিন খাবার খাওয়াবো না কিন্তু।

দুপুর বেলা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছে সুলতারা···বেলার কথা উঠেছে। সুলতা হেসে বলে, কিছুদিন আগে সদানন্দ ঘোষ সেজে টেলিফোন করেছিল কে একটা মেয়ে, আমার মনে হয়েছিল ঠিক তোমার দিদি, নেমন্তন্ন করেছিলুম, তাতে বলেছিল একপাতে খেতে হবে।

বিদ্যুৎ হেসে উত্তর দেয় : তাই নাকি ? তা' হতে পারে···দিদি খুব আমুদে···চব্বিশ ঘণ্টা হাসিখুশি নিয়েই থাকে···জীবনে শুধু দু'একবার গম্ভীর হতে দেখেছি তাকে···দিদি এ্যামেরিকা গেছে, ফিরে এসেই তো দিদির বিয়ে।

সুলতা বলে, তাই নাকি ? তা' কার সঙ্গে বিয়ে ?

বিদ্যুৎ বলে যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তিনি এখন বিলেতে। এ্যামেরিকা থেকে দিদি বিলেত হয়ে ফিরবে। আমার মনে মনে ভয় হচ্ছে, দিদি আবার ওখানেই না সেরে নেয় বিয়েটা···তাহ'লে বিনা নেমন্তন্নেই আমাদের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করতে হবে।

চমকে চমকে এগিয়ে চলে বিদ্যুৎ···শশাঙ্ক রায়, কেমব্রিজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন আর্টস্-এ, এই বচ্ছর ব্যারিষ্টার হয়ে বেরুবেন। দিদির অনেক দিনের বন্ধু, ঢাকায় এক কলেজে পড়তেন, তারপর পড়তে

পড়তে···একটা অর্থপূর্ণ ঝাঁকুনি দেয় বিদ্যুৎ ঘাড়টাকে···বাকী টুকু উহ্যই রয়ে গেল।

সুলতা হাসে···ও বুঝেছি···তা' বড়বোনের কথা তো শুনলুম, এখন শুনতে চাই বিদ্যুতের প্রণয়ীর কথা।···

—তুমি বাজে কথা বকবেনা বৌদি, চোখ টেনে বলে বিদ্যুৎ···ওসব কথা বললে আর কোনদিন আসবো না কিন্তু তোমার কাছে।

—কেন দোষ কি ? উস্কুনি দেয় লতা।

—যাও, যাও,—রক্ত-অধর স্ফুরিত হয়ে ওঠে বিদ্যুতের। বলে, বিদ্যুৎ তা'বলে তোমাদের মত অত ডেঁপো নয়···তোমার বিয়েও বুঝি লভে পড়ে হয়েছিল ? এই একটা ঢং হয়েছে আজকালকার মেয়েদের···কোমর বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে সব মনের মতন বর জুটিয়ে আনছে লভ করে।

আলো-হাসির বন্যা বয়ে গেছে সেদিন সুশান্তর বাড়ীতে। মোনোর হাসি জেগে উঠেছে···সুলতা ভেংচেছে তোতলা মহেশকে। তারপর ঐ যে এসেছে গনেশ জননীর মত অদ্ভুত মেয়েটা, ওর প্রতি ইঞ্চি যেন হাসিতে ভরা। এমন সরল আমুদে কথাবার্ত্তা, এমন ঝরণা-ঝরার মত প্রাণখোলা উচ্ছ্বসিত হাসি···এমন পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির আবেগ ! ইলেক্ট্রিক হিটারের মত এ যেন কে বসিয়ে দিয়েছে আজকে সুশান্তদের রেডিওর কাছে, একটা হাসি গান ছড়াবার র‍্যাডিয়েটর। সুশান্তর মনে হ'ল পৃথিবীর সমস্ত কোকিলগুলো বুঝি একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে সব ডালে ডালে।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুর বেলা বসেছে পিঠে করার আসর। সুলতা বলেছে বিদ্যুতের পিঠে আলাদা হবে, সুলতা করবে আলাদা, তা' না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল বিচার হবে কেমন করে ?

বিদ্যুৎ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুরের ওপর যে গান জন্মায় ভালবাসার, সে বলিষ্ঠ ভালবাসার গান। সুলতা ও বিদ্যুতের মধ্যে বলিষ্ঠ ভালবাসার আসন পাতবার জন্যেই ঘরে ঢুকেই বিদ্যুৎ তুলেছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। বৌদিকে বলেছিল তাল ঠুকে : আমি বড···যাতে বৌদি আসবে কোমর বেঁধে বিদ্যুৎকে ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিতে। এখন তো নিয়েছ ভাই বৌদিকে জয় করে, এখন আর আলাদা করে পিঠে করবো কেন ?

এখন এক সঙ্গে করবো, তারপর ভালো লাগলে দাদা যখন জিজ্ঞেস করবেন কে করেছে পিঠে ? তখন তোমার মুখ চেপে ধরে বলবো বিদ্যুৎ ...বিদ্যুৎ-ই তো করেছে সবকিছু, বৌদি শুধু ঘুরেছে-ফিরেছে আর চেকেছে খাবারগুলো।

সুলতাদের একটা পোষা কাবুলি বেরাল ছিল। মাছ দুধ খেয়ে খেয়ে বেশ মোটাসোটা ক্যাপিট্যালিষ্টের মত চেহারা। কি একটা বিরাট আবিষ্কারের আনন্দ চোখে মুখে নিয়ে সুরমা এসে বসেছে নতুন পিসীমার কোলে, হাত ধরে টানাটানি করছে, আর বলছে : এসো না, এসো, দেখবে এচো পিচীমা।...

—কি দেখবে কি ? জিজ্ঞেস করে সুলতা।

—দেখবে এচো হাচি কি করছে।

হাসি হ'ল সেই কাবুলি বেরালটার নাম।

পাশের ঘরে কড়িকাঠের কাছে দেয়ালের দু'দিকে রয়েছে দু'টো টিকটিকি, আর হাসি মুখ উঁচু করে তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ন্যাজ নাড়ছে আর অত্যন্ত করুণভাবে ম্যাও ম্যাও করে কাঁদছে। ভাবখানা যেন টিকটিকিদের বলছে : বন্ধুদ্বয় কেন রয়েছ নাগালের বাইরে ? এত করে কেঁদে কেঁদে ডাকছি একটুও কি মায়া নেই প্রাণে ? এসো, আমার মুখের মধ্যে চলে এসো, তোমাদের ভক্ষণ করে আমি পরমানন্দ পাই। যাকে হত্যা করে খেতে হবে, তার মনে করুণ রস জাগাবার প্রচেষ্টা...হাসির ছবিই বটে...খুব হাসলে সবাই...ভাগ্যে মোনো তখন সেখানে ছিলনা।

বিদ্যুৎ বল্লে, বৌদির বেরাল যেন কারখানর মালিক...শ্রমিকরা একটু নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টা করছে...আর করুণ সুরে ম্যাও, ম্যাও করে কেঁদে, হাসি আহ্বান করছে ওদের নিজের উদরে...বৈষ্ণব কবিতার অশ্রুসজল আকুতি ঐ ম্যাও ম্যাও কান্নায়।

ও বাবা, মোনো এসে দাঁড়িয়েছে পেছুনে ! আজকে মোনোর হাসির বান ডাকার দিন...সকাল থেকে বান এসেছে জোরে...কিছুক্ষণ বেড়ালটাকে দেখে, আত্মজয় করবার অনেক চেষ্টার পর আবার সেই

হা-হা-হা-হা…আবার ঝুঁকে পড়েছে সুমুখের দিকে…আবার যেন ভেঙে গেছে শিরদাঁড়াটা।

মোনোর হাসিতে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সুলতার সেই পুংমার্জ্জার 'হাসি'…কারখানার ধনী মালিক ভেসে চলে গেল মোনোর হাসির প্রচণ্ড তোড়ে।

খুব ঝাঁপাই ঝুড়লে সুলতা বিদ্যুৎ আবার দমকা হাসির শ্রাবণ-নদীতে নেবে। সুরমা লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে হাসতে লাগল।

যা ভালবাসে সুশান্ত মোনোকে, সে ছিলনা সেখানে তাই, থাকলে আবার নিশ্চয় বলতো : কোরিয়ার আটত্রিশ অক্ষরেখার ওপর একদিন জাগবে মোনোর হাসি, তারপর পৃথিবীতে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না।

পরের দিন ডাকবাক্সে ফেলিয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ, হোটেল থেকে খামে করে এই কবিতাটা সুলতার ঠিকানায় :—

ভ্রাতৃজায়ার ঐ পুংমার্জ্জার
কাঁদছে যে ম্যাও ম্যাও কান্না,
পোষের শেষের দিনে ভাই-ভার্য্যার
চলে ঐ পিঠে-পুলি রান্না…
এ্যাংলো ও এ্যামেরিকা মার্জ্জার পুং
টিকটিকি দুটো মানে যাও সে তুং।

কোরিয়াতে করে রণ পুংমার্জ্জার
করে রণ টিকিটিকি লালেরা,
'সবাইকে টিকে দিও যে যার যার
সারা পৃথিবীতে এলো কলেরা…
এ্যাংলো ও এ্যামেরিকা মার্জার পুং
টিকটিকি দুটো মানে যাও সে তুং।

কোরিয়া চায়না রণ, তবু খায় গুলি,
দুটো দল কষে গুলি ছুঁড়ছে

ভয়ে কাঁপে পুঁজিদার, মোটা বাড়ীউলী,
শকুন আকাশে রোজ উড়ছে…
ভ্রাতৃজায়ার ঐ পুংমার্জার
বিপদ না ডেকে আনে ভাই-ভার্য্যার।

—পনেরো—

সেদিন রাত্রে পোষ-পার্ব্বণের পিঠে-পুলি-পায়েস খেয়ে বিদায় নেবার সময় বিদ্যুৎ বলে এসেছিল সুশান্ত ও সুলতাকে, পরের দিন রাত্তিরের ট্রেনে সে কলকাতার বাইরে চলে যাবে চার পাঁচ দিনের জন্যে। তাই সুশান্ত ভেবেছিল বিদ্যুৎ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তার বোধ হয় আর আধুনিকায় যাবার প্রয়োজন হবে না। অথচ সেদিন দমদমে বহ্নির বাড়ী গিয়ে সেই বেরিয়ে-যাওয়া মেয়েটাকে শিবানন্দের সুমুখে হাজির করে দেবার খুব ইচ্ছে হ'ল সুশান্তর। মনে হ'ল বহ্নির মনের এই যে ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব সেটা বোধ হয় শিবানন্দ বাবুই পারবেন ঠিক করে মিটিয়ে দিতে। সেদিন বাসে করে দমদম যেতে যেতে সুশান্তর কেবলই মনে আসতে লাগল মহাজন পদাবলীর লাইন দুটো: 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।'

নতুনকে মানুষ ভালবাসে যত ভয়ও করে ততো। যাকে জানিনা, অথচ যাকে জানতে হ'বে, যা নাকি আসন্ন, এই এলো বলে, তারই ওপরে মানুষের মনে সবার চেয়ে বড় আসক্তি, তাকেই সবার চেয়ে বড ভয়। সুশান্তর মনে পড়লো গত যুদ্ধের সময় বোমা পড়বে এই ভয়ে যত লোক পালিয়েছিল কলকাতা থেকে, তার সিকি লোকও পালালো না তখন, যখন সত্যিই পড়লো বোমা,—সত্যিই পরিচয় হয়ে গেল সবার সেই নতুন পরিস্থিতিটার সঙ্গে। বাইরে বেরুচ্ছে বহ্নি, পথের ধুলোয় দাঁড়িয়ে গীতার কাজ করবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে…সুশান্ত যেন বেশ বুঝতে পারছে, এই ব্যাপারে বহ্নি থেকে আরম্ভ করে, তার আশেপাশে যারা আছেন, রাজীবলোচন, ক্ষমা দেবী এমন কি সুশান্ত নিজেও,

সকলেরই মনে জেগেছে অজানার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের শঙ্কা। সুশান্তর মনে পড়লো গীতাঞ্জলির গান :—

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই···

—সত্যিই তো, পরিস্থিতি তো ক্ষণচঞ্চল, চির পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু কালো মেয়ে? সুশান্ত হাসে···কালো মেয়ে শান্ত, অক্ষর, শাশ্বত। কালো মেয়ে চির পুরাতন!···

সেদিন বহ্নির শরীরটা ভালো ছিল না, ঠাণ্ডা লেগে একটু সর্দ্দি জ্বরের মত হয়েছিল দু দিন থেকে। স্নান করেনি সেদিন, রুক্ষ চুলে বসেছিল মার পাশে পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে পেছন করে, রকের ওপর একটা শতরঞ্জি পেতে।···সুশান্ত বসেছে সেখানে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর। বহ্নির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষমা দেবী বলেন: তুইতো চললি পথের ওপর, আমরাও চল্লুম তোর সঙ্গে সঙ্গে, এখন এত বড় বাড়ী ঘর, এ রেখে আর কি হবে? শান্তদাকে বলে এখন এ ঘর বাড়ী বেচে ফেলার ব্যবস্থা কর্।···

বহ্নি হাসে। ঘাড় নেড়ে বলে, আমি করবো সেবা, বাড়ীটা হবে আমার সেবাসদন। এখানে খুলে দেবো মাতৃমন্দির, যারা মা হবে তাদের এখানে করবো পরিচর্য্যা। দক্ষিণদিকের মহলটাতে বসিয়ে দেবো একটা মেয়েদের স্কুল আর কলেজ···লেখাপড়া শিখবে মেয়েরা, তাদের মনে বহ্নি জ্বালবে জ্ঞানের আলো।···

—তুমি বুঝি প্রিন্সিপ্যাল হবে কলেজের? হেসে জিজ্ঞেস করে সুশান্ত। বহ্নি বলে, সে সব তো তুমি জানো শান্তদা···মা বাবা তো তোমার হাতেই দিয়ে দিয়েছেন সব। এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রাইভেটে পড়ে গত বৎসর বহ্নি বি. এ. পাশ করেছে, সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে।

বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদে রাজীবলোচন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন গাছ পালাগুলোর আশপাশে। কেমন যেন তন্ময়ের মত হয়ে ঘুরছিলেন

তিনি বাগানের মধ্যে ; তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল সব যেন কেমনধারা ওলটপালট হয়ে গেছে চতুর্দ্দিকে। মনে হচ্ছিল, আজকে বেলা ডুবে যাবার পর কাল সকাল থেকে আর বুঝি কোনদিন সূর্য্য উঠবে না আকাশে আগের মত ; সেও বোধ হয় বহ্নির মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে বাইরের পথে। একটা একটা গাছের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তিনি, আর মনে হচ্ছে গাছগুলো যেন ফিসফিস করে বহ্নির কথাই বলছে বারে বারে,—ওরে বহ্নি, বাইরে বেরো···বাইরেটা কেবলই ডাকছে তোকে হাত নেড়ে নেড়ে।···

খড়ম দুটোর খট্ খট্ শব্দ করে বাড়ীর ভেতর এসে পড়লেন রাজীবলোচন বহ্নির কাছে। আর একটা চেয়ার আনিয়ে বসলেন সুশান্তর পাশে। বললেন, এবার তো তাহ'লে একটা লেখাপড়া করে ফেলার দরকার। কার নামে লেখাপড়া করে দেবো এই টাকাকড়ি, বাড়ী-ঘর জমিদারী, এটা তো ঠিক হওয়া দরকার সকলের আগে ?

সুশান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, বহ্নির সম্পত্তি, বহ্নি ছাড়া আবার কার নামে লেখাপড়া করে দেবেন ?

বহ্নি প্রতিবাদ করে···না, না বহ্নির নামে কিছুতেই চলবে না লেখাপড়া করা। না শান্তদা আমি কিছুতেই পথের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারবো না···আমি চাই, পথে যে দিন গিয়ে দাঁড়াবো, সেদিন যেন ঠিক পথে দাঁড়ানোর মত করেই দাঁড়াতে পারি। পরনে একখানা থান কাপড় ছাড়া আর কিছু থাকবে না বহ্নির, আঁচলে একটাও পয়সা থাকবে না বাঁধা···শুধু থাকবে চোখের সুমুখে সেই পথ, যার শেষ নেই, আর হাতের মধ্যে থাকবে তোমার হাত শান্তদা !···

হা হা করে হেসে ওঠেন রাজীবলোচন ও ক্ষমা দেবী। বলেন, আর থাকবে পিঠের ওপর এই দুটো বুড়ো-বুড়ি···তোর বাবা আর মা। বহ্নি সব রেখে যাস পেছুনে ফেলে, সব ফেলে দিস্ ছুঁড়ে ছুঁড়ে, শুধু যতদিন আছি, আমাদের যেন ফেলে দিস্‌নে মা! বড় করুণ হয়ে উঠেছে দু'জনের মুখ, রাজীবলোচন আর ক্ষমা দেবীর···কে জানে যদি বহ্নি মঞ্জুর না করে তাঁদের দরখাস্ত ?

বহ্নি বলে, ঘর-বাড়ী, জমিদারী, গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি, হীরে, জহরৎ সব লিখে দাও শান্তদাদার নামে।…

সুশান্ত অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, না না, সে কি হয়? আমার নামে কেন হবে লেখাপড়া?—না না, আমার নামে নয়। তারপর ক্ষমা দেবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, বহ্নির পরে আর কি আপনাদের কেউ নেই?

ক্ষমা দেবী বলেন, বহ্নির একজন পিসতুতো বোন আছে।…

বহ্নি লুফে নেয় কথাটা… কতদিন ধরে, দরিদ্রের রক্তে শোষণ করে গড়ে উঠেছে এই জমিদারী, এই টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী সম্পত্তি…যাদের রক্ত দিয়ে তৈরী এ সব, আসল দাবী তাদেরই এ সম্পত্তিতে।…শুধু আমাদের বংশে জন্ম বলে কারুর ব্যক্তিগত ভোগের অধিকার থাকার তো কথা নয় এ পাপের সম্পত্তির ওপর?…তাছাড়া যাঁর কথা বলছ তাঁর তো গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নেই। জোরে ঘাড় নাড়ে বহ্নি…না না, ও সব অন্য কারুর নামে লেখাপড়া করে দেওয়া হতেই পারবে না কখনো। এ সব জগন্নাথের জিনিস। জগন্নাথ কাঙালের ঠাকুর—যার কিছু নেই, যে খেতে পায় না, পরতে পায় না, এ হবে তাদের সম্পত্তি…এ সব শান্তদাদার নামেই লেখাপড়া করে দাও বাবা। একটু চুপ করে বহ্নি বলে, ঠাকুর বলেন, নায্য গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া কোন মানুষের কোন অধিকার নেই কোন সম্পত্তির ওপরে—আমারও নেই, মারও নেই, বাবারও নেই…এই হ'ল আমাদের দেশের খাঁটি কম্যুনিজমের কথা। এতদিন অনেক পাপ করেছি আমরা শুধু নিজেরা এই সম্পত্তি ভোগ করে, এই সোনাদানা, খাট-পালঙ্ক, গাড়ী-ঘোড়া। টেনে টেনে হি হি করে হাসে বহ্নি …জানো শান্তদা, মানুষের আভিজাত্যের দম্ভ মড়ার সঙ্গে শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছে যায় তাকে কাঁধে করে। সেদিন নিমতলা ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলুম বাবা মার সঙ্গে,…সিল্কের পোষাক পরে একজন বড়লোকের মড়া এলো অনেক লোকজন নিয়ে, বোম্বাই খাটের ওপর চড়ে। ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সমস্ত খাটটা, খই ছড়াচ্ছে, পয়সা ছড়াচ্ছে, কীর্ত্তন করছে। একটা পাগলী ছিল বসে, হি হি করে খুব জোরে হেসে উঠল; ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, বাবু বুঝি মস্ত বড়লোক? কত টাকার

বাড়ী থেকে বেরিয়েছে ঐ বোম্বাই খাটটা ? ওদের লোকটা বল্লে, দশ লক্ষ টাকার বাড়ী। আরও জোরে হাসতে লাগল পাগলীটা। তারপর বল্লে, এবার কি হবে ? ··এবার কোথায় থাকবে ঐ দশ লক্ষ টাকার বাড়ীটা, আর ঐ চকচকে বোম্বাই খাট ? এবার তো চিতার ওপর শুইয়ে বাঁশ দিয়ে ফাটাতে হবে বাবুর মাথাটা, কুলি মজুরের মাথার মত !···আমরা সেদিন কতো হাসি হেসেছিলুম ঐ পাগলীটার কথা শুনে,···না, মা ?

হা হা করে আবার জোরে জোরে হাসেন রাজীবলোচন আর ক্ষমা দেবী। বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব হেসেছিলুম সেদিন। ক্ষমা দেবী বলেন, এবার তো কেবলই হাসব আমরা যখন-তখন ঐ পাগলীটার মত, ঐ রকম প্রাণ খোলা হাসি, আর তো বন্ধ হয়ে থাকব না ঘরের মধ্যে ! রাজীবলোচন বলেন, ঘরেই শুধু ভারী-মুখ, ঘরেই শুধু বোম্বাই খাট···বাইরে চিতার ওপরে কেবল হাসি, কেবল আগুনের দাউ দাউ আলো !

আবার ওঠে সম্পত্তি লেখাপড়া করার কথা। সুশান্ত মনে মনে অত্যন্ত আকুল হয়ে অব্যাহতি খুঁজছিল এই অবস্থা থেকে। হঠাৎ চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো শিবানন্দ বাবুর প্রসন্ন মুখটা। একটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সুশান্ত। বল্লে, এ-বিষয়ে আমাদের শীর্ষস্থানীয় যিনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পাচ্ছি না।

—কে তিনি ? জিজ্ঞেস করে বহ্নি।

সুশান্ত বহ্নিকে শিবানন্দ বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই শোনেন শিবানন্দ বাবুর পরিচয়।

ক্ষমা দেবী বলেন, বেশ তো বাবা, চলনা আমরা সবাই গিয়ে এখানেই নিয়ে আসি তাঁকে মাথায় করে ? আমাদের বাড়ীতে কি তিনি পায়ের ধুলো দেবেন না ? তিনি এলে আমরাও তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ পরামর্শ করে নিতে পারবো।

চারজনে বেরিয়ে পড়লো ওরা, রাজীবলোচনের গাড়ীতে। বহ্নি ড্রাইভ কচ্ছে গাড়ী, পাশে বসেছে সুশান্ত···বেলাটা তখন একেবারে শুয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশের জবাফুলের স্তূপে।

ড্রাইভারটা তাঁদের পেছনে আসছে মোটর সাইকেলে চড়ে। ওটা

রাজীবলোচনের ব্যবস্থা, বহ্নি ড্রাইভ করলেই মোটর সাইকেলে পেছুন পেছুন যাওয়া চাই ড্রাইভারের। পথে বিপদআপদ হতে পারে তো?

গাড়ীটা কিছুদূর গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ···ভালো গাড়ীটাকে কারখানায় দেওয়া হয়েছে তেল বদলাবার জন্যে, এটা পুরোনো গাড়ী, মেরামত হয়ে এসেছে সেদিনই সকালবেলা। সেদিনই মেরামত হয়ে এসেছে, তবে গাড়ী বন্ধ হয়ে গেল কেন? ড্রাইভার নেবে পড়েছে মোটর সাইকেল থেকে।

—রতনদা? বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে বহ্নি···আপনি যে বললেন, গাড়ী ভালো মেরামত হয়েছে, ঠিক চলবে?

হাফপ্যাণ্ট-পরা, ছোটখাটো লোকটি, রতন দাস। হাওড়া জেলায় বাড়ী, বেশ ভালো ড্রাইভার। তাছাড়া বেশ মিষ্টি করে কথা বলতে পারে। হেসে বল্লে, দিদি, কারখানাওলাদের ব্যাপার বোঝাই ভার। এই কান মুলছি আমি, আর কখনও কারখানওলাকে বিশ্বাস করবো না। দুটো হাত তুলে কান দুটো স্পর্শ করে রতন।—তবে আমি তো দেখে নিয়েছিলুম···আমি তো অনেকখানি চাইলেই দেখে নিয়েছি গাড়ী, বেশ চলছে ইঞ্জিন, তবে মাঝে মাঝে ঐ কেমন যেন ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পাগলের মতন।···

হেসে ফেল্লে বহ্নি···ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে গেলে কেমন করে মেরামত হ'ল গাড়ী?

রতন আবার হাসলে। বল্লে, দিদি ইঞ্জিনটা নতুন পাল্‌টানো হয়েছে কিনা, তাই ঐ রকম হচ্ছে ··আর তাছাড়া ইঞ্জিন কি মানুষ যে কথা শুনবে? ইঞ্জিন ও ঠিক নিজের মতেই চলবে সব সময়, যতই ভালো মেরামত হোকনা কেন, ও যখন চাইবে তখনই বন্ধ হয়ে যাবে মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে···ও সব বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছে।···

হাহা করে হেসে উঠেন রাজীবলোচন ও ক্ষমা দেবী পেছনের সিট থেকে। ক্ষমা বলেন, দেখলি তো বহ্নি, রতনের কথার ছিরি, তা হাসার মত কথাই বটে, যতই ভালো মেরামত হোক ইঞ্জিন, নিজের মতই চলবে সব সময়···দরকার হলে ও নাকি মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে

বন্ধ হয়ে যাবেই নিশ্চয়। ও সব নাকি বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছে। বেশ মজার কথা যা হোক, তাহ'লে মেরামত করবার দরকার কি?

ভাগ্যে একখানা ট্যাক্সি আসছিল পেছুনে যশোর রোড থেকে··· সবাই গাড়ী থেকে নেবে উঠে পড়লেন সেই ট্যাক্সিতে। রতন রইল গাড়ীর হেপাজতে।

ওদের গাড়ী বেরিয়ে গেলে নাচের ভঙ্গীতে গান গেয়ে উঠলো রতন ···না ন্না, না ন্না না; নান্না, নান্না না।···

—রতন তুই গান গাইছিস? নিজেই জিজ্ঞেস করে রতন নিজেকে।

—কিছু মনে করিসনি রতন, আমার স্বভাবটাই এমনি। ও একটু গান-বাজনা না হলে আমার রেতে ঘুম হয় না। না হলে এখন কি আমার গান গাইবার সময়? দিদি বিরক্ত হলেন, তা' না হয় দিদির কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ালেই সব মিটে যাবে। কিন্তু এই মোটর সাইকেল আর মোটর গাড়ী, এ দুটো জিনিস এক সঙ্গে কি করে ম্যানেজ করি বল্‌তো? এ যেন বউ যা বল্‌তো তাই, হয় তুমি আমাকে ছাড়ো, নয় ছাড়ো যাত্রা করা···ও দুটো গাড়ী কিছুতেই একসঙ্গে চলবেনে।

এদিকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আধুনিকা হোটেলে রীতিমত হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেছে। ডাকপিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেছে—ম্যানেজারের নামে, হাজারিবাগ থেকে আসছে। প্রণতি এখন ম্যানেজার, সেই খুলেছে চিঠিখানা। চিঠিতে লেখা :—

মহাশয়,

একুশ বৎসরের ছেলে এবং আঠারো বৎসরের মেয়ে স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। সংবাদ লইয়া যতদূর জানা গেল, তাহাতে মনে হয় তাহারা কলিকাতাতেই যাইবে। মেয়েটির পরনে ঘন নীল রঙ-এর শাড়ী, ছেলেটির গায়ে বুস কোট ও হাফ প্যান্ট। মেয়েটি খুব সুন্দরী, তাহার সুটকেশের এক কোণে ইংরেজীতে 'সি' লেখা একটি কমলানেবু রঙ-এর শাড়ী আছে। মেয়েটির ডাক নাম চম্পা এবং ভালো নাম অপরাজিতা। ছেলেটির নাম সতীশ। আপনাদের হোটেলে পৌঁছিলেই তৎক্ষণাৎ পুলিসের হাতে দিয়া দিবেন.

এবং অনুগ্রহ করিয়া এই ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। নমস্কার লইবেন। ইতি—

ভবদীয়—

এস. ব্যানার্জ্জি

অম্বর নেই, তারপর এরকম একখানা চিঠি পাওয়া গেছে হাতে; ললিতার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুটো রোম্যান্টিক কথা কইবার এই এসেছে প্রণতির কপালে প্রথম সুবর্ণ সুযোগ। ললিতা বিকেলবেলা ছাতের পশ্চিম দিকের আলসের কাছে একলা বসে একখানা বই পড়ছে, এবং চুল শুকোচ্ছে পড়ন্ত রোদ্দুরে। প্রণতি গিয়ে বসে পড়লো তার কাছে, মাদুরের ওপরে।

বই থেকে মুখ তুলে ললিতা জিজ্ঞেস করলে, কি খবর প্রণতিদা?

প্রণতি হেসে ফেললে একগাল হাসি···না, মানে অস্ত যাবার আগেকার সূর্য্য কিনা।···

ললিতা বুঝতে পারলে না কথাটা, তবু একটু হেসে জিজ্ঞেস করলে, অস্ত যাবার আগেকার সূর্য্য? সে আবার কে? আপনি—আপনি বুঝি এবার অস্ত যাবেন?

একি অম্বর, যে কথা কইতে পারবে না কবিত্ব করে? অম্বরটা হলে হয়তো এমন সময়েও বলে বসতো: ললিতা, বাজারকরাটা আমার হাতেই থাকবে তো কায়েমী হয়ে? এ তো অম্বর নয়, এ হ'ল প্রণতি···এ হ'ল নারীচিত্তজয়ী আলেকজান্দার!

প্রণতি বল্লে, না না, আমি নই? আমি কেন অস্ত যাবো তোমার সুমুখে; আমি বরং উদিত হব···ঐ যে ঐ···ঐ তোমার ছড়ানো চুলের ওপর অস্ত যাবার আগেকার সূর্য্য কত সুন্দর, কত রোমান্টিক!···

ললিতা মুখ টিপে হাসলে। বল্লে, তারপর?

ললিতা তাহ'লে হেসেছে মুখ-টিপে? কি সুন্দর ঐ হাসিটুকু···ইঙ্গিত করছে তাহ'লে ললিতা? প্রণতির ইচ্ছে হ'ল আর একটু ঘেঁষে গিয়ে বসে ওর কাছে।

একটা ঢোঁক গিলে প্রণতি বল্লে, তারপর আরও রোমান্টিক খবর

আছে। একখানা ওয়াণ্ডারফুল চিঠি এসেছে···শুনবে? খাম থেকে চিঠি-খানা খুলে পড়তে লাগলো প্রণতি।

ললিতা শুনলে সব চিঠিটা। শুনে, জোরে হেসে উঠলো। বললে, বেশতো এতো খুব ভালো কথা। তাহ'লে আপনি এখন কি করবেন?

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে প্রণতি—আমি? আমি কি করবো?

ললিতা হাসে। বলে, আসুন একটা কাজ করি···কাউকে বলবেন না কিন্তু!···

প্রণতি কিছু বুঝতে পারে না, অথচ কত কি আশা করে ফেলে মনে মনে। আশ্বাস দিয়ে বলে—বলে দেবো! ছ্যা ছ্যা, তুমি আমায় কি মনে কর ললিতা? এসব কথা কাউকে বলে কখনো?

হেসে জিজ্ঞেস করে ললিতা, কি সব কথা?

প্রণতি বলে, এই যে, যে সব কথা তুমি বলছ?

—কই আমি তো কিছু বলিনি।

জিব শুকিয়ে আসে প্রণতির··হ্যাঁ, কিছু বলনি বৈকি···হ্যাঁ বলেছ, নিশ্চয় বলেছ অনেক কিছু···স্পষ্ট করে না বল্লেও কি কিছু বলা যায় না? তুমি একেবারে বড্ডো রোমান্টিক।

ললিতা বলে, আপনার তো খুব বুদ্ধি আছে দেখছি? ঠিক ধরে ফেলেছেন আমার মনের কথাটা। আমি বলছিলুম কি জানেন? ঐ চিঠির চম্পা আর সতীশের মত আমরাও যদি পালিয়ে যাই? আপনি আর আমি?

আল জিবটা কেমন যেন খুস্ খুস্ করে ওঠে প্রণতির; লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে খক্ খক্ করে কেশে ফেলে খানিকটা। বলে, তাহ'লে? তাহ'লে আমি এক্ষুনি বাপের ভিটে বেচে ফেলবো।

হি হি করে হেসে ওঠে ললিতা···বাপের ভিটে বেচে ফেলবেন কেন?

প্রণতি বলে, খরচ চালাতে হবে তো তোমার আমার···একি অম্বর পেয়েছ? যেমন মুর্গীর মত চেহারা, তেমনি মুর্গীর মত হৃদয়···বেশ করেছিলে, সেদিন ওকে কুকুর বলে ডেকে···ও নেড়ি কুত্তার চেয়েও অধম।

বেশ আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে ললিতা—অম্বর বাবুকে কুকুর বলেছিলুম, সে একজন নিরপরাধ মানুষকে কুকুর বলে ডেকেছিল বলে। ও রকম বলাটা উচিৎ হয়নি আমার, তিনি এলে ক্ষমা চাইব তাঁর কাছে। অথচ তাঁকে কুকুর বলেছিলুম শুনে আপনি দেখছি খুব আনন্দ পেয়েছেন। অম্বর বাবু না হয় নেড়ী কুত্তারও অধম···আপনি কি ফক্সটেরিয়ার?

—যাঃ সব গোলমাল হয়ে গেল দেখছি। ঘুড়িখানা যেন হঠাৎ একটা গোত্তা খেয়ে ধপ করে পড়ে গেল আকাশ থেকে মাটির ওপর। তবু অভিমানের সুরে প্রণতি বলে, তুমি আমাকেও কুকুর বললে?

ললিতা হাসে···আপনি কুকুর না হলেও ঠাকুর নন। যাক, তার চেয়ে উঠে যান এখান থেকে। এরকম ভাবে আর গায়ে-পড়ে ভালোবাসা জানাতে আসবেন না কখনও। ওতে বিপদ হতে পারে আপনার। যান ঐ চিঠিখানা জামাইবাবুকে দিয়ে তারপর ঐ চম্পা আর সতীশকে পুলিসে দেবার ব্যবস্থা করুনগে। তবে মনে রাখবেন আজকে আপনার এই ভালোবাসা জানানোর ব্যাপারে ললিতাও পারে আপনাকে পুলিসে দিয়ে দিতে। সব দিক না জেনে কাউকে পুলিসে দেবার চেষ্টা করবেন না যেন।

—পনেরো—

সকাল সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে দিবালাঘাট ষ্টেশনে একলা নেবে পড়লো ট্রাউজার-পরা বিদ্যুৎ। তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি···একটু একটু অন্ধকার রয়েছে। সঙ্গে ছোট একটা সুটকেশ, একটা ছোট বেডিং আর একটা চামড়ার ঝোলানো হ্যাণ্ডব্যাগ। একটা কুলির মাথায় সুটকেশ ও বেডিংটা চাপিয়ে দিয়ে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে হ্যাণ্ডব্যাগ।

রেল লাইন পার হয়েই মিষ্টার রবার্টসের বাংলো। সেই বাংলোর বাগানের কাঠের ফটকটা খুলতেই বাংলোর বারান্দা থকে নেবে ছুটতে

ছুটতে রবার্টস্‌দম্পতি এসে পড়লেন বিদ্যুতের কাছে। ইংরেজীতে আসুন আসুন বলে করমর্দ্দন করলেন দু'জনে বিদ্যুতের সঙ্গে।

মিঃ রবার্টস্‌ ঐ অঞ্চলের রেল লাইনের সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাপত্তা সম্বন্ধে তদারক করেন এবং সেই নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করেন নিজের স্কন্ধে। তিনি ঐ বিভাগের পি. ডবলু. আই, অর্থাৎ স্থায়ী রেলপথের তদারককারী।

—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? জিজ্ঞেস করেন মিঃ রবার্টস্‌। রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন তো একটু? প্রশ্ন করেন রবার্টস্‌-পত্নী। তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়ে মার্থা এবং সাত বছরের ছেলে ডেভিডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বিদ্যুতের, মিসেস্‌ রবার্টস্‌.···তোমাদের আন্টি মিস্‌ ইসাবেলা। মাসীর মত হবার চেষ্টা কর···সি ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

মার্থা ও ডেভিডকে কোলের কাছে টেনে নেয় বিদ্যুৎ···কত আদর করে দু'জনকে···তারপর দাঁড়িয়ে উঠে কাঁধে তুলে নেয় মার্থাকে। মার্থা গাইছে কাঁধের ওপর থেকে, মাটির ওপরে হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায় বিদ্যুৎ আর ডেভিড একটা ইংরেজী গানের ছোট্ট কলি:

And she came, she came.
The blooming flower maid.···
She came when the blossoms were dead.

হাসি গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ঐ বাগান-ঘেরা রেলের বাংলোটা। ব্রেক্‌ফাষ্টের পর খুব জমেছে ওদের গান-বাজনা-হাসি···দার্জ্জিলিং-এ আলাপ হয়েছিল বিদ্যুতের এই ভদ্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারটির সঙ্গে, বেশ কিছুদিন আগে···এরা তখন খুব ছোট ছোট ছিল, ডেভিড আর মার্থা···বোধ হয় দু'বচ্ছর আর চার বচ্ছর বয়স হবে তখন ওদের দু'জনের।

খানিকক্ষণ পরে ট্রলিতে করে লাইন পরিদর্শনের কাজে বেরিয়ে গেলেন মিঃ রবার্টস্‌···বিদ্যুৎ বোধ হয় কখনও ট্রলি চড়ে বেড়ায়নি, সেও গেল রবার্টসের সঙ্গে। ডেভিড ও মার্থাকে বলে গেল ড্যাডির সঙ্গে একটু

বেড়িয়ে আসছে সে ট্রলিতে করে, তারপর ফিরে এসে তাদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলবে বাগানে।

যেখানে লাইন ছুটো বাঁকের মুখে একেবারে নদীর ধারে গিয়ে পড়েছে, সেইখানে এসে একবার থামলো ট্রলিটা…সেখানে নেবে পড়লো এরা…রবার্টস্ আর বিদ্যুৎ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ট্রলিম্যান, যারা ট্রলিটাকে ঠেলে আনছিল এতক্ষণ। সাহেব একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন লাইন দুটোকে। ট্রলিতে চুনের বস্তা ছিল, ট্রলিম্যান দুটোকে বলে অনেকখানি চুন গুলিয়ে, লাইনের দু'ধারে খোয়ার ও পাথরের ওপর প্রায় পাঁচ সাত হাত জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ালেন ঐ ঘন করে গোলা চুন।

প্রায় দুশো ফুট দূরে একটা ছোট পুলের নীচে খালের মত একটা নদী। গঙ্গা থেকে বর্ষাকালে সেই নদী দিয়ে পশ্চিম দিকে বেরিয়ে যায় বন্যার জল। শীতের নদী, অনেক জায়গায় চড়া পড়ে গেছে নদীতে, তবু দেখলে মনে হয় খালে এখনও প্রচুর জল আছে। খালের মুখের কাছে গঙ্গাতে, এবং খালের মধ্যে জেলেদের অনেক ছোট ও মাঝারি নৌকো চলে বেড়াচ্ছে মৎস্য-হস্তা অনেক বেহারী জেলেকে নিয়ে।

রবার্টস লাইনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন, বিদ্যুৎ দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। ও জায়গার নদীটা বেশী চওড়া নয়। খুব কাছেই, রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চড়া, ধূ ধূ করছে চোখের সুমুখে। ঐ ধূ ধূ ধূ ধূ নদীর চড়ায় সেদিনকার মধ্যাহ্নে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বিদ্যুৎ। লালগোলাঘাটের সেই কাছারী-বাড়ীটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার। একবার পাঁচ ছ'মাস ওরা সবাই ছিল পদ্মার ওপরে সেই সুন্দর বাড়ীটায়। মনে পড়ে গেল কেমন সেই সকাল থেকে গভীর রাত্তির পর্য্যন্ত অবিশ্রাম টেনে রাখতো বিদ্যুতের মনকে ঐ রাক্ষুসী নদীটা। রাক্ষুসী বটে, তবে সুন্দরী রাক্ষুসী। মনে পড়ে গভীর রাত্তিরে এক একদিন ঘুম ভেঙে যেত অকস্মাৎ…কানে আসতো হু হু হু হু জল-প্রবাহের শব্দ…বিছানায় উঠে বসে ব্যথিয়ে উঠতো বুকটা, মনে হতো বুঝি পদ্মা ডাকছে বাইরে, একেবারে জলের

কাছে। কতো রাত্তির এমনিধারা শুধু একলাই বেরিয়ে গেছে সে বিছানা ছেড়ে বাড়ীর বাইরে···বাড়ীতে খোঁজাখুজি পড়ে গিয়েছিল একবার। বাবা মা ব্যস্ত হয়ে চাকরবাকর আলো লণ্ঠন নিয়ে নদীর তীরে খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে একলা।

তারপর মনে পড়ে আর একদিনের ঝড়-লাগা নদী···বিকালবেলা থেকে মেঘে মেঘে ভীষণ কালো হয়ে গিয়েছিল সমস্ত পৃথিবীটা, তারপর অন্ধকারে উঠলো ঝড। সে যে কি ব্যাপার তা ঠিক করে বুঝিয়ে বলতে পরবে না বিদ্যুৎ। সেটা কাউকে বলবার কথাও নয় ···চুপি চুপি অত্যন্ত সঙ্গোপনে সেদিন সে যেন পেয়েছিল ঝড়ের সুমুখে মনের অতল তলে দুরন্ত প্রেমিক পুরুষের প্রথম কর-পরশ। সে কথা কি কাউকে বলবার? সে যে একান্তভাবে বিদ্যুতের নিজস্ব সম্পদ। কবিরা যে বলেন, প্রথম পরশ থর থর থর উতলা কুমারীর কথা সেই রকম···পুরুষের প্রথম পরশ পাওয়া কুমারীর মতই বোধ হয় সেদিন তীব্র উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তার সমস্ত দেহমন— খুব শীত লাগলে যেমন কাঁপে থর থর করে শরীরটা, তেমনি করে জেগেছিল কেমন একটা অপূর্ব্ব বেপথুব ভাব তার সমস্ত শরীর মনে। বিদ্যুৎ যেন থমকে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড আম গাছটার তলায়, সেই রেল লাইনের সুমুখে···না, না, কেন বোলবো তোমাকে? কেন বোলবো তোমায় আমার সেই সন্ধ্যাবেলার পরম আনন্দময় অনুভূতির কথাটা?

আবার ফিরে আসে বিদ্যুৎ রবার্টসের বাংলোতে। লাঞ্চ খাবার তখনো দেরি আছে কিছু, বিদ্যুৎ মার্থা আর ডেভিড তিনটে প্রজাপতির মত ছুটোছুটি করছে বাগানের আলোছায়ায়···মার্থা বললে, আন্টি আমরা সবাই আজ বিকালবেলার ট্রেনে ঝাঁন্সী চলে যাবো বেড়াতে, সেখানে আছেন আমাদের আর একজন মাসী, ডরোথি।

—আমাকেও নিয়ে যাবে? জিজ্ঞেস করে বিদ্যুৎ। উৎফুল্ল হয়ে দু'জনে দুটো হাত ধরেছে বিদ্যুতের, ডেভিড আর মার্থা। বলে, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। চল না আন্টি, যাবে? ডরেথি মাসী এতো সুন্দর কেক্ তৈরী করতে পারেন, খেলে বুঝবে হাউ ফাইন। তারপর আবার

গান গাইছে ওরা নেচে নেচে···she came when all the blossoms were dead.···

বাক্স বিছানা সব বাঁধাই ছিল, ওরা সব চলে গেল বিকেল চারটের ট্রেনে। বিদ্যুৎ ওদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এলো; গার্ড সাহেব বাজালে বাঁশী, নাড়লে সবুজ পাখাটা···আস্তে আস্তে গাড়ী এগিয়ে চল্‌লো প্লাটফরম্ ছেড়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মার্থা গাইলে ট্রেন ছাড়ার সময়, And she came, she came, the blooming flower maid.···

একলা ফিরে এলো বিদ্যুৎ বাংলোতে আবার। খানসামা এসে চা দিয়ে গেল বেতের টেবিলের ওপর। বেলা পড়ে আসছে, বিদ্যুৎ বসে বসে চা খাচ্ছে একলা, আর চোখ বোলাচ্ছে একটা ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ওপর।

ফটকটা খুলে বাগানে ঢুকেছে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক, বেশ সুন্দর একটা সুট পরে। মাল গাড়ীর ব্রেকভ্যানে চড়ে ও এসেছে পশ্চিম দিকের আগের ষ্টেশন থেকে, এক্ষুনি। একেবারে একলা রয়েছে বিদ্যুৎ বাংলোতে, খানসামা চাপরাশী ছাড়া আর কেউ নেই। ও আবার কে জুটলো এসে? কেমন যেন টলে টলে চলছে বোধ হয় ঐ লোকটা। মাতাল নয়তো?

হাসে বিদ্যুৎ মুখ টিপে টিপে···লোকটা কাছে এলে জিজ্ঞেস করলে, কি রনুদা' কেমন আছো? কবে এলে দিল্লী থেকে?

পাশের চেয়ারে বসে পড়লো রণেন···দিল্লী থেকে ফিরেছি পরশু প্লেনে করে, পাটনায়।

চা ঢালে বিদ্যুৎ আর একটা কাপে···এগিয়ে দেয় রণেনের কাছে, ···চা খাও। ক্ষিদে পেয়েছে নাকি? আর কিছু খাবে? আজ গেছে কিছু পেটে, না'হরি-মটর?

ঘাড় নেড়ে হাসে রণেন···না, আজকে ঢেকুর উঠছে এখনো। খুব খেয়েছি আজ।

* * * *

অমাবস্যার দু'একদিন আগেকার কালো অন্ধকার রাত্রি; কাছের মানুষ চোখে দেখা যায় না। হু হু করে বইছে শীতের হাওয়া, দাঁতে দাঁতে

লেগে ঠক ঠক করে কাঁপছে ওরা, খোলা মাঠে নদীর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

এগারোজন মুখোস-পরা লোক, অন্ধকারে ভূতের মত দেখাচ্ছে।

দুটো ছাপান্ন মিনিটে আসবে ফ্রন্টিয়ার মেল। কে একজন ওদের মধ্যে টর্চ জ্বেলে একবার হাতঘড়িটা দেখলে। দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ; আর সময় নেই. দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে।

সেই চুনগোলা ছড়ানো জায়গাটা…উবু হয়ে বসে লাইনটা খুলে ফেলছে ওরা, তিনজন মুখোস-পরা লোক। ফিস ফিস করে কি কথা কইছে দু'জনে, বোধ হয় বিদ্যুৎ ও রণেন।

—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্…ঐ আসছে ফ্রন্টিয়ার মেল। হাওয়ার মত ছুটে আসছে প্রচণ্ড গতিতে।

বেশ খানিকটা দূরে, ছোট নদীর পুলটার নীচে, প্রায় জলের কাছে উবু হয়ে বসে আছে ওরা এগারো জন মুখোস-পরা লোক। যেন এগারো জন বাঘ বসে আছে ওত পেতে।

উঃ কি প্রচণ্ড আওয়াজ…রণেনের মনে হ'ল বোধ হয় পাঁচমাইল দূরের লোকও শুনতে পেয়ে থাকবে শব্দটা। লাইন থেকে বেরিয়ে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর ফুট দূরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে বিরাট ইঞ্জিনটা, মাটিতে বসে গেছে একদিককার চাকাগুলো।

চারখানা বড়ো বড়ো কামরা বেরিয়ে গেছে লাইন থেকে…তার মধ্যে দু'খানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ঠিক দেশলাই কাঠির মত!

গাড়ীর দু'জন রাইফেলধারী নেপালী পকেট থেকে টর্চ জ্বেলে খুলে দিলে মেল ভ্যানটা…গাড়ীর সব আলো তখন নিবে গেছে, চতুর্দ্দিকে ঘুট্ ঘুট্ করছে অন্ধকার!

রণেন আর পঁচিশ জন স্থানীয় কুলি উঠে পড়েছে মেল ভ্যানে। কাদের অনেক টাকা যাচ্ছে পাঁচ ছ'টা সিন্দুক ভর্ত্তি হয়ে। কুলিদের একজন চীৎকার করে উঠলো অন্ধকারে : ভুখা বাচ্চা জিন্নাবাদ!

ছ'টা সিন্দুক নাবিয়ে নিলে বিদ্যুতের দল। তারপর শীগগির

করো শীগগির···গাড়ীতে লুঠ করে বেড়াচ্ছে ওরা প্যাসেঞ্জারদের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি।···একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠেছে বিদ্যুৎ আর রণেন···ভেতরে ভেঙেচুরে একেবারে একাকার কাণ্ড!

টর্চ জ্বেলে একটা মরা স্ত্রীলোক আর একটা মুমূর্ষু পুরুষকে ডিঙিয়ে বিদ্যুৎ চলে গেল কামরার ওদিককার দেওয়ালের কাছে। নীচের বাঙ্কে কে একজন শুয়ে রয়েছে বাঙ্গালীর মত।

ওপরের বাঙ্কটা দু'আধখানা হয়ে ভেঙে গিয়ে আধখানা বাঙ্ক ও তার ওপরকার হলদে রংয়ের শাড়ী-পরা মেয়েটা এসে পড়েছে নীচের ভদ্রলোকের কোমরের ওপরে। মেয়েটা আধখানা বেঞ্চির ওপর আর আধখানা মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তার মুখ দিয়ে ভল্ ভল্ করে বেরুচ্ছে প্রচুর রক্ত!···

কোমর পর্য্যন্ত থেঁতো হয়ে গেছে একেবারে; নীচের বাঙ্কের শোয়া ভদ্রলোকটির,···তবু প্রাণটা এখনও বেরোয়নি। তবে ছোট ছোট ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইছে, সব যেন ঝিমিয়ে আসছে সমস্ত শরীরের। অন্ধকারে দেখা গেল না তাই, না হ'লে মুখের চেহারা দেখলে দেখা যেত, শিয়রে বসে মৃত্যু তার মাথায় হাত বুলোচ্ছে, মায়ের মত। খুব একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ভাঁটার টানটা।···

বিদ্যুৎ টর্চ জ্বাললে···চীৎকার করে উঠেছে ঐ কোমর থঁ্যাৎলানো লোকটা,···উঠে বসবার চেষ্টা করছে ভাঙা কোমরটার ওপর।

—বেলা! বড় পরিচিত গলা। টর্চ জ্বেলে বিদ্যুৎ বলে উঠল, অজিতদা! তৎক্ষণাৎ মুখোসটা খুলে ফেললে বিদ্যুৎ।···

কথা কইতে পাচ্ছেন না, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ অজিতদা।' মাথার বালিশের তলায় দু'হাজার টাকা আছে নিও··· একটু জল পাওয়া যাবে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই অজিতদা, এই অজিতদা দিদিকে ভালোবাসতো। বিদ্যুৎ নিশ্চয় করে জানে সে কথাটা। তারপর বিয়েই করেনি অজিতদা ···ঘর-বাড়ী ছেড়ে, বিদেশে চলে গেল কোথায়, দিদির সম্মতি না পেয়ে। কত সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছিল অজিতদা, বেলার

প্রত্যাখানে ব্যাথা পেয়ে। বিদ্যুৎ একদিন লুকিয়ে প'ড়েছিল অজিতদার খাতাটা।

দিদি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল অজিতদাকে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজের মত।

দিদির কাজ ছিল, অনেক কাজ ছিল করবার, ভালো-বাসবার অবসর ছিল না।

না, না, দিদি ভালোবাসেনি···দিদি নিষ্ঠুর পাষাণ, দিদি কখনোও ভালোবাসতে পারবে না কাউকে।

আরও ছটো কথা কইতে পারতেন অজিতদা···হয়তো বলতেন, বেলা আমায় মেরে ফেলো···কিন্তু সে সময় দিলে না বিদ্যুৎ।···

বিদ্যুতের মনে হ'ল উঃ বড়ো কষ্ট হচ্ছে···টর্চ্চটা জ্বেলেই রেখেছে বিদ্যুৎ। বল্লে, আর তো তোমার কষ্ট দেখতে পাচ্ছিনা অজিতদা' !···

অত কথা শুনতে পেলেন কি অজিতদা? বোঝবার সময় পাওয়া গেলনা, বিদ্যুৎ হাতের রিভলভারটা তাঁর কপালের ওপর ঠেকালে, তারপর দুম করে একটা শব্দ হ'ল।

*　　*　　*　　*

শীতের গহন রাত্রিটা পাশ ফিরে শুলো···প্রায় চারটে বাজে। একটা মাঝারি নৌকো সিন্দুকগুলো নিয়ে নদীর বুকে উত্তর দিকে খুব জোরে জোরে এগিয়ে চলেছে। নৌকোর ওপরে বসে বিদ্যুৎ আর রণেন, আর একজন, মিশ্রাজী।

চার মাইল দূরে অম্বরপুরের চর। বেহারীরা তাকে ভুতাহা চর বলে। নাকি ভুত আছে সেখানে, তাই ঐ নাম, ভুতাহা চর।

প্রকাণ্ড চর, প্রায় দশমাইল লম্বা···আঠারো বছরেরও ওপর আছে চড়াটা, নদীটা ওখানে বেঁকে অন্য পথ ধরেছে পশ্চিম পাশে। বুনো ঝাউগাছ, তেঁতুল, কুল, আরও অনেক রকমের বুনো গাছের নিবিড় বন। লোকে বলে ঐ চরে নাকি বুনো শুয়োর থাকে।

শেষ রাত্তিরের চাঁদ উঠেছে। মাথার ওপর অন্ধকারে ঝক ঝক করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। খুব কুয়াশা করেছে চতুর্দ্দিকে। অনেক দূরে

একটা ষ্টীমারের লাল আলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে, ওপর নীচে দুটো।

নৌকোর ওপরে তার বিছানায় শুয়ে রয়েছে অজিতদা…তার পাশেই মেঝের ওপর বসে তার খানিক খানিক ভেঙে-যাওয়া মাথাটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে রয়েছে বিদ্যুৎ… কিছু ভাবছে নাকি অজিতদা শুয়ে শুয়ে? হয়তো ভাবছে বেলা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার মাথায় আদর করে।

ওকি, বিদ্যুতের চোখে জল বুঝি? কেমন যেন চক চক করে উঠলো ওর চোখ দুটো।

ভোঁ করে দূরের ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠলো…শব্দটা গিয়ে থামলো যেন ঐ শেষরাত্তিরের চাঁদটার বুকে। নৌকো এসে ভিড়লো ভূতাহা চরে।

বিদ্যুৎ বল্লে, রণুদা মত পরিবর্ত্তন করলুম। কবর দেবো না বা পোড়াবো না অজিতদার শরীরটাকে। এসো জলে ভাসিয়ে দিই অজিতদাকে…তবু মাছের কুমীরের সেবায় লেগে যাবে ওঁর জ্বালার মাংসটা। রণেন আর বিদ্যুৎ অজিতদাকে মুড়ে দু'দিকে ধরে ঝপাৎ করে বিছানাটা জলে ফেলে দিলে। বোধ হয় একটা শাদা রঙ-এর পাখী ফরফর করে উড়ে গেল ভূতাহা চরের একটা গাছ থেকে।

—ষোলো—

চিঠি আসার 'পরের দিন, সকালবেলা আধুনিকায় এসে পড়লো সেই উড়ো পাখী দুটো হাজারিবাগ থেকে, অপরাজিতা আর সতীশ। সতীশ কিছুদিন আগে আধুনিকায় এসে অনেকদিন ছিল দাদা-বৌদিদির সঙ্গে। দাদা এসেছিলেন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে টনসিল অপরেসান করাতে।

অম্বর প্রণতি দু'জনের সঙ্গে সতীশের ছিল বেশ ভালো রকম জানা-

শোনা···ওদের পঁচিশ নম্বর ঘরে জায়গা দিলে প্রণতি। পঁচিশ নম্বর ডবল সিটের ঘর।

মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের বেশ মানানসই চেহারা···লাল জমির ওপর ছোট ছোট অনেকগুলো সবুজ বৃত্ত আঁকা একটা ছাপা সিল্কের শাড়ী পরে এসেছে অপরাজিতা। যিনি চিঠি লিখে জানিয়েছেন ওদের আসার কথা, তিনি লিখেছিলেন, অপরাজিতা নাকি খুব সুন্দরী। গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু প্রণতির মনে হ'ল কপালটা যেন একটু বেশী চওড়া। তাছাড়া চোখ দুটো বড়ো বড়ো ভাসা ভাসা হলেও, চোখের কোল যেন বসা বসা, বড়ো বেশী যেন কালী পড়া!

প্রণতি সতীশকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিঠিটা দেখালে, কাঁধে হাত দিয়ে হেসে বল্লে, কিছু ভাববেন না। ভালোবাসলে যে কি অবস্থা হয় আমি তা' বুঝি। আমি সব ম্যানেজ করে নেব, কোন বিপদ হবে না আপনার। তবে আমাদেরও দেখবেন একটু, বুঝলেন?

অর্থাৎ এই সুযোগে যদি দুটো পয়সা বাগিয়ে নিতে পারা যায় প্রণতি সেই চেষ্টাই কচ্ছে। ঘরের মেয়ে বার করে এনেছে, এই তো হচ্ছে ঠিক কাপ্তেন লোক। তারপর এই চিঠিটা রয়েছে, ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করবে।···আরে বাপু প্রেম তো বড় জিনিস বুঝলুম, কিন্তু পুলিসে যাবার ভয়ও মোক্ষম ভয়। ঐ ভয়ে মরা মানুষ পুড়তে পুড়তে চিতা থেকে উঠে টাকা বার করে দেয় পকেট থেকে।

হাজারিবাগের চিঠিটা ভুবনমোহনকে দিয়েছিল প্রণতি। তিনি পত্রপাঠ খৃষ্টপূর্ব্বকে ডাকিয়ে পাঠালেন। সেদিন সকাল থেকে তাঁর মাথার দিন। বড় যেন বন বন করে ঘুরছিল সেদিন মাথাটা। মাথার ভেতরটা ঘুরলে আজকাল মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় মাথার বাইরেটাও বুঝি ঘুরছে। সেদিনও তাই মনে হচ্ছিল তাঁর।

ললিতা এখন ভুবনমোহনের অসুখের ব্যাপারটা বেশ বুঝে নিয়েছে। যতবড় অসম্ভব ব্যাপারই হ'ক না কেন, তাঁর কথায় হ্যাঁ বলতেই হবে। তাঁকে প্রতিবাদ করলে তাঁর জেদ আরও চড়ে যায়, রোগটাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে। তিনি সেদিনও ডাকলেন ললিতাকে।—ললিতা, দেখ

তো মাথার বাইরেটা ঘুরছে কিনা? শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভুবনমোহন।

একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ছিল টেবিলের ওপর, সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে ললিতা বল্লে,—উঠে বসুন, তবে তো বোঝা যাবে··· যতবারই দেখেছি আপনার মাথার বাইরেটা ঘুরছে, ততবারই দেখেছি আপনি বসে আছেন। শুয়ে শুয়ে শুধু ভেতরটাই ঘোরে!

উঠে বসলেন ভুবনমোহন। বেশ গম্ভীরভাবে কাঁচের ভেতর দিয়ে তাঁর মাথার দিকে তাকিয়ে ললিতা বল্লে, ঠিক বলেছেন আপনি। ঐ তো ঘুরছে খুলিটা আস্তে আস্তে। স্কুলে ভূগোল পড়বার সময় গ্লোব ঘুরিয়ে দেখাতেন মাষ্টার মশাই, এ ঠিক সেই গ্লোবের মত দেখাচ্ছে।

মাথার উপরে হাত বুলিয়ে খুশী হয়ে ভুবনমোহন বল্লেন, তুমিই ঠিক বুঝতে পারো ললিতা, তোমার মত কেউ পারে না। তোমার দিদি তো হেসেই উড়িয়ে দেয় ও-কথা। বলে, মাথার ভেতরটা না হয় ঘোরে, সে রকম না হয় মাঝে মাঝে আমাদেরও ঘোরে, কিন্তু মাথার বাইরেটা আবার ঘোরে নাকি কখনো? একদিন বললুম, কাছে এসে ভালো করে ঐ কাঁচ দিয়ে দেখ···খানিকক্ষণ দেখে বল্লে, এই তো অনেকক্ষণ দেখলুম, টাক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। শুনলে তো কথা!···

ললিতা মুখ টিপে হেসে বলে, আসলে দিদির বোধ হয় চোখ-খারাপ হয়েছে, চশমা করিয়ে দিন দিদিকে।

ভুবনমোহন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আবার বলেন, কিন্তু আমি হাত দিয়ে তো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না যে ঘুরছে?

ললিতা বুঝিয়ে দেয়—হাত দিলে ঘোরাটা কেমন করে বোঝা যাবে বলুন? ঘুরন্ত লাট্টুতে হাত দিলে সে কি আর ঘোরে? ঝপ করে বন্ধ হয়ে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে যায় মাটির ওপরে।···

—তা বটে, তা বটে,—হা হা করে হেসে ওঠেন ভুবনমোহন।

খৃষ্টপূর্ব্ব বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন···ভেতরে আসতে পারি কি?

—আসুন আসুন, বলে আহ্বান করেন ভুবনমোহন, তারপর টাকের ওপরে ঘুরন্ত লাট্টুটাকে আবার নিরস্ত করেন মাথায় হাত বুলিয়ে, অন্য হাতে চেয়ার দেখিয়ে খৃষ্টপূর্ব্বকে বলেন, বসুন।

ললিতা ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। ভুবনমোহন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এখনও চিকিৎসা করেন?

খৃষ্টপূর্ব্ব মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেন, মনে হ'ল এতদিন পরে ভুবনমোহনের চিকিৎসার ভার বুঝি এসে পড়লো তাঁরই হাতে। অনেকদিন থেকে অম্বর প্রণতিকে দিয়ে বলেছিলেন তিনি ভুবনমোহনকে; কিন্তু ভুবনমোহন কোনদিনই আমল দেননি খৃষ্টপূর্ব্বকে। একদিন ভুবনমোহন অফিসের কাজকর্ম্ম তদারক করতে নীচে গিয়েছিলেন দোতলায়, তখন নিজেও বলেছিলেন খৃষ্টপূর্ব্ব…একবার আমার চিকিৎসাটা দেখুন না পরখ করে? সেদিন ভুবনমোহন বড় কাঠখোট্টার মত কথা বলেছিলেন…আমার চিকিৎসার জন্যে ভাববেন না মোটেই, আমাদের পাওনা টাকাটা শীগ্‌গির করে দিয়ে ফেলুন দেখি। যাক্, খৃষ্টপূর্ব্বর মনে হ'ল এতদিনে বুঝি সুমতি হয়েছে ভুবনমোহনের, এইবার লক্ষ্মীর কৃপায় কিছু পয়সা এসে ঢুকবে খৃষ্টপূর্ব্বর পকেটে। নিজের মর্য্যাদা-বোধে খৃষ্টপূর্ব্বর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, হ্যাঁ চিকিৎসা করি বৈকি…চিকিৎসা তো বেশ জমে উঠছে দিন দিন…আজই তো প্রায় তিনজন রুগীকে।…

বাধা দিয়ে ভুবনমোহন বলেন, আপনি শুনলুম ভালোবাসা দিয়ে চিকিৎসা করেন। সে কি রকম? ভালোবাসা দিয়ে কি করে চিকিৎসা হবে?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, ভালোবাসার মন্ত্র হোমিওপ্যাথিকে মিশিয়ে, সেই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি আমি।

ভুবনমোহন জিজ্ঞেস করেন,—তাহ'লে আপনার চিকিৎসা, করতে হলে রুগীকে ভালোবাসতে হবে বলুন?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, হ্যাঁ আমাকে ভালোবাসতে হবে।

—আপনাকে ভালোবাসতে হবে? ভুবনমোহনের বাইরের মাথাটা যেন আবার ঘুরে উঠলো বন বন করে, আবার মাথায় হাত বুলিয়ে

নিরস্ত করলেন লাট্টুটাকে, আবার বললেন,—আপনাকে ভালোবাসতে হবে ?

খৃষ্টপূর্ব্বর কাছে অপরিচিত তরুণী থাকলে সমস্ত মাধ্যাকর্ষণটা থাকে সেই তরুণীর কাছে, সেই সময় খৃষ্টপূর্ব্ব সমাধিস্থ হবার বড একটা সুযোগ পান না। ললিতার সঙ্গে আজও আলাপ হয়নি খৃষ্টপূর্ব্বর··· তার পেছনে চেয়ারে বসে আছে ললিতা, খৃষ্টপূর্ব্বর সমস্ত মনটা তাঁর পিঠ ফুঁড়ে চলে গেছে ঐ চেয়ারে-বসা মেয়েটার কাছে। ভুবনমোহনের কথার উত্তরে খৃষ্টপূর্ব্ব বল্লেন, হ্যাঁ, আমাকেই ভালোবাসতে হবে। তবে ভালোবাসার প্রকারভেদ আছে ; যেমন, আপনি যদি আমাকে ভালোবাসেন তাহ'লে আপনাকে কল্পনা করে নিতে হবে যে আমি একটি ষোড়শী তরুণী, এবং সেই ভেবে আমাকে ভালোবাসতে হবে। ললিতা মুখে কাপড দিয়ে হাসে।···আর আর—পেছন ফিরে ললিতার দিকে তাকিয়ে আবার বল্লেন, আর ধরুন যদি ওঁর হয়ে থাকে অসুখ, তাহ'লে ওঁকে কল্পনা করে নিতে হবে যে, আমি একজন বিশ-বাইশ বছরের নব্য যুবক, এবং সেই ভেবে আমাকে ভালোবাসতে হবে।···

তারপর খৃষ্টপূর্ব্ব নিজের চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন। বল্লেন, প্রতিদিনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ভিন্ন রকমের, তবে সাপ্তাহিক চিকিৎসার জন্যে রুগীর একখানা ফটো থাকবে আমার কাছে, আর আমার একখানা ফটো থাকবে রুগীর কাছে। প্রতি শুক্রবারে রাত্তির সাড়ে তিনটেয় উঠে, আমার ফটো নিয়ে প্রত্যেক রুগী যে যার ঘরে আসন করে বসবে ; আমিও বসবো সেই সময় আমার ঘরে সব রুগীর ফটো নিয়ে সুমুখে ; রুগীরা আমার ভ্রূমধ্যে তাকিয়ে ভাববে আর বলবে, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমিও তেমনি এক একজন করে রুগীদের ভুরুর মধ্যিখানে তাকিয়ে ভাববো আর বলবো আমি তোমায় ভালোবাসি। তবে, শুধু মুখে বল্লেই হবে না, সত্যি করেই ভালোবাসতে হবে, কিম্বা অন্ততঃ চেষ্টা করতে হবে ভালোবাসবার।···

ভুবনমোহন টেবিলের ওপর থেকে কি একটা গুলি মুখে ফেলে দিয়ে জল খেলেন গেলাস থেকে। বললেন, তারপর কি হবে ?

খৃষ্টপূর্ব্ব বল্লেন, প্রকৃতির যত শক্তি আছে তার মধ্যে ভালোবাসাই বড়ো শক্তি। তাছাড়া এ কি ভালোবাসা জানেন তো? এ চণ্ডীদাসের—'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'…এ সেই ভালোবাসা! এ ভালোবাসায় মাংসর গন্ধ নেই এতটুকু।…

তারপর ব্যাপারটা খুলে বললেন ভুবনমোহন। তাঁর নিজের রোগটাতো খুব জটিল, মাথার বাইরেটাও ঘোরে বন বন করে লাট্টুর মত, ও রোগ একশোটা খৃষ্টপূর্ব্ব এলেও সারাতে পারবেন না সাতজন্মে। অপরাজিতা ও সতীশ, ঐ যে দু'জন এসেছে স্বামী-স্ত্রী সেজে বাড়ী থেকে পালিয়ে…ভুবনমোহন জিজ্ঞেস করলেন, ওদের দু'জনের অসুখটা সারাতে পারেন কি?

ললিতা চলে গেছে চেয়ার থেকে উঠে ঘরের বাইরে, অতএব মাধ্যাকর্ষণ ফিরে এসেছে খৃষ্টপূর্ব্বর কাছে। আবার এসেছে গভীর ভাবসমাধি…সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হয়ে শক্ত হয়ে গেছে চেয়ারের ওপর।

প্রণতি খৃষ্টপূর্ব্বকে হাজারিবাগের সেই চিঠিটা দেখিয়েছিল, বড় আনন্দ হয়েছিল রমেশ ঘোষালের চিঠিটা পড়ে। মেয়েটার পরনে একটা ঘন নীল শাড়ীর কথা ছিল চিঠিটাতে। এখন ভুবনমোহনের সুমুখে সেই শাড়ীটার কথা মনে পড়ে গেল খৃষ্টপূর্ব্বর। মনে হল যেন অপরাজিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সুমুখে সেই নীল শাড়ী পরে। তিনি বসে বসে আওড়াতে লাগলেন মহাজন কবিতা : 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।'…

ভুবনমোহন আবার জিজ্ঞেস করলেন, পারবেন ওদের চিকিৎসা করতে?

চমকে ফিরে এলেন খৃষ্টপূর্ব্ব নিজের কাছে…ওদের চিকিৎসা? ওদের চিকিৎসা তো শেষ হয়ে গেছে। যারা পালিয়ে এসেছে সব বাধা অস্বীকার করে, সব বেড়া ডিঙিয়ে, তারা তো নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই ফেলেছে সেরে। না, না ওদের চিকিৎসা আমি করবো না, ওদের দিয়েই আমি করাবো লীলার চিকিৎসা।…

যেন প্রকাণ্ড আবিষ্কার করে ফেলেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব, তন্ময় অবস্থাতেই

উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। ভুবনমোহনকে বল্লেন, আচ্ছা আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি করছি সব ব্যবস্থা। এবারে পেয়েছি লীলার রোগের মোক্ষম ওষুধ···বিদ্যাসাগর-চটি ফট্ ফট্ করে নেবে গেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব, একেবারে সোজা সতীশ ও অপরাজিতার ঘরে।

রমেশ ঘোষাল আলাপ জমাতে সিদ্ধহস্ত। যার-তার সঙ্গে একেবারে বিনা পরিচয়েই তিনি এক মিনিটেই আলাপ করে নিতে পারেন। পঁচিশ নম্বর ঘরে কড়া খট্ খট্ করতেই সতীশ এলো বেরিয়ে। যেন কতদিনের পরিচয় সেই ভাব নিয়ে খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে বললেন, এই যে, নমস্কার সতীশ বাবু। সতীশ নমস্কার করলে বটে, তবে বললে, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না। খৃষ্টপূর্ব্ব উড়িয়ে দিলেন কথাটা, চেনা-চিনির কোন প্রয়োজন নেই ভাই, আমি ও ভালোবাসি, তুমিও ভালোবাসো···ব্যস্ মিটে গেল, দুই-ই এক ঝাঁকের পাখী। তার ওপরে আরো একটা বড় কথা আছে, তুমি প্রেমিক, অতএব All the world loves a lover,···পৃথিবীর সব মানুষই প্রেমিককে ভালবাসে। খৃষ্টপূর্ব্বর সরল কথাবার্ত্তায় সতীশ যেন প্রচুর আনন্দ পেলো মনে মনে। বললে, আসুন, ভেতরে আসুন,—বলে আগ্রহ করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বসালো চেয়ারের ওপর।

অপরাজিতা সেই মাত্র মুখ হাত ধুয়ে ট্রেনের কাপড় ছেড়ে এসে, আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুল ঠিক করছে। সতীশ আলাপ করিয়ে দিলে,—চম্পা, ইনি রমেশ বাবু। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে অপরাজিতা খৃষ্টপূর্ব্বকে নমস্কার করে আবার প্রসাধনে মন দিলে। এইখানে আবার একবার বলে রাখা ভালো যে অপরাজিতার ডাক নাম চম্পা।

খৃষ্টপূর্ব্ব বললেন, বাঃ এ যে একেবারে হরগৌরী! চমৎকার মানিয়েছে তো? তা বিয়েটা হয়ে গেছে তো সারা? নাকি এখানেই সারবেন ঐ ব্যাপারটা? অপরাজিতাকে প্রশ্ন করলেন রমেশ ঘোষাল।

খুব ব্যস্ত হয়ে সতীশ যেন কথাটাকে চাপা দিতে চাইলে। বল্লে, না, না বিয়ে-টিয়ে ওসব হবার তো কোন কথা নেই।···

খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে ঘাড় নাড়লেন···ও, বুঝেছি, বিবাহে তোমরা বিশ্বাস

করো না। তোমরাও তাহ'লে আমার মত বন্ধনহীন গ্রন্থীর প্রেমিক···আচ্ছা সে কথা যাক, তোমরা আমার একটু উপকার করতে পারবে? একজনের একটু চিকিৎসা করতে পারবে তোমরা?

—চিকিৎসা? আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে সতীশ···আমরা তো ডাক্তার নই, আমরা কেমন করে করবো চিকিৎসা?

খৃষ্টপূর্ব্ব বুঝিয়ে দিলেন,—না, মানে, সব বাধা-বন্ধন এড়িয়ে, সব বেড়া ডিঙিয়ে, সমাজের সব নাগপাশ ছিন্ন করে, ভালোবাসার জন্যে তোমাদের মত দু'জন দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে আসার যে মহিমা, সেটা একটা মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে পারবে একটু?···মানে, অন্য কিছু নয়, তাতে আমার অনেক উপকার হবে। ঐ মেয়েটাকে আমি ভালোবাসি।

এতক্ষণে অপরাজিতা কথা কইলে···আয়নার কাজ তখন সারা হয়ে গেছে তার···মনটা ভাল নেই, তাই বড় বিরক্ত লাগছে ঐ সব কথা-বার্ত্তায়···সে এসে খৃষ্টপূর্ব্বর সুমুখে চেয়ারে বসলো। বল্লে, আপনি যে চিকিৎসার কথা বল্লেন, সে আমি ঠিক করতে পারবো। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞেস করি, আপনি নিজের চিকিৎসাটা করিয়েছেন কি?

—আমার চিকিৎসা? চমকে উঠলেন খৃষ্টপূর্ব্ব।

চম্পা বললে, আপনার বয়েস কতো?

খৃষ্টপূর্ব্ব আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, কতো মনে হয় আপনার?

চম্পা বল্লে, আপনি যে বুড়ো হয়েছেন সে কথা কি আপনার মনে আছে?

—আমি বুড়ো? চেয়ারের ওপরে রীতিমত নড়ে উঠলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। সব কথা সহ্য হয় রমেশ ঘোষালের, সব কটূক্তি, এমন কি ষ্টুপিড, ননসেন্স পর্য্যন্ত, শুধু সহ্য হয়না ঐ বুড়ো কথাটা। একবার রাস্তায় কাগজে লেখা কি একটা ইংরেজি ঠিকানা পড়িয়ে নেবার জন্যে একটা কুলি গোছের লোক তাঁকে বুড্‌ঢা বাবু বলে সম্বোধন করেছিল, খৃষ্টপূর্ব্ব তার ঠিকানার কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তার পিঠে বসিয়েও দিয়েছিলেন এক ঘা। খুব চীৎকার করে হৈ হৈ করে লোক জুটিয়ে ফেলেছিলেন রাস্তায়। গরীব লোককে নাকি সব

অন্যায়ই সহ্য করতে হয়, তাই কুলিটা চুপ করে চলে গিয়েছিল সেদিন; অন্য কেউ হলে সেও দিয়ে দিত বেশ করে উত্তম-মধ্যম। জটলার মধ্যে একজন ভদ্রলোক কিন্তু কুলিটার হয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন খৃষ্টপূর্ব্বকে। বলেছিলেন, বুড়োকে বুড়ো বলেছে, তাতে কি অপরাধ করেছে ও লোকটা? খৃষ্টপূর্ব্ব হাত মুখ নেড়ে বলেছিলেন, আমি কখ্খনো বুড়ো নই। ভদ্রলোক চম্পার মত জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার বয়েস কত?

খৃষ্টপূর্ব্ব আরও যেন রেগে গিয়েছিলেন ঐ কথাতে···সে খবরে আপনার দরকার কি?···

পাশের আর একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ওঁর বয়েস সবে বায়ো কি তেয়ো। দু'জন কলেজের মেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেইখানে, তার মধ্যে চশমা-পরা যে, সে বলেছিল, কচি, একেবারে কচি···'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ ওরে আমার কাঁচা'—খৃষ্টপূর্ব্ব কটমট করে তাকিয়েছিলেন সেই জ্যাঠা মেয়েটার দিকে।

এখানেও অপরাজিতার দিকে ঠিক সেইরকম কটমট করে তাকালেন রমেশ ঘোষাল। বল্লেন, বুড়ো? এই তুমি বল্লে শেষটা যে আমি বুড়ো? আচ্ছা বেশ বুড়ো যখন, তখন নমস্কার, ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন রমেশ ঘোষাল ঘর থেকে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট গর্জ্জন করলেন, রাস্কেল···এ দেখছি লীলার চেয়েও বেশী ডেঁপো···দাঁড়াও দিচ্ছি খবর পুলিসকে, প্রেম করা বেরিয়ে যাবে এবার।

পঁচিশ নম্বর ঘরে পাশাপাশি দুটো খাটে বিছানা হয়েছে ওদের দু'জনের, চম্পার আর সতীশের। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর সতীশ বললে চম্পাকে···আমি যাচ্ছি অন্য ঘরে শুতে।

চম্পা হাসে, বলে সেই তো ভালো, অন্য ঘরেই শোও তুমি। এখানে এসে কারুর কাছে যদি বিজন জানতে পারে যে আমরা একঘরে শুয়েছি, তাহ'লে সে হয়ত অনেক কিছু মনে করে বসবে। আমি না হয় খুব ভালো করে জানি, কিন্তু সে তো জানে না যে সতীশদা পাথরের ঠাকুর।

সতীশ একটু চুপ করে থেকে বলে, হ্যাঁ তা সে মনে করতে পারে। সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করলুম ও কথা।

চম্পা বলে, কালই সকালে তুমি চলে যেও বিজনের কাছে। ঠিকানাটা তো তোমার কাছেই আছে ?

সতীশ বলে হ্যাঁ, কালকেই যাবো।

চম্পা বলে, দেখা পেলে কিছুতেই ছেড়ো না তাকে, বোলো চম্পার বড় অসুখ, সে আর বাঁচবে না ; তোমার সঙ্গে দেখা করতে সে নিজে থেকে কলকাতায় এসেছে। বোলো, এক্ষুনি চলো, এক্ষুনি ডাকছে চম্পা, দেরি করলে আর বোধ হয় দেখা হবে না…ডাক্তার বলেছে, যে কোন সময়ে হার্ট ফেল হয়ে যেতে পারে। শেষের কথাগুলো যেন কান্নায় জড়িয়ে গেল একটু একটু।

চম্পা আবার বলে, আচ্ছা সতীশদা…বোসোনা তোমার বিছানায় একটু, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা বিজন আমাকে ভয়ানক ভালোবাসে, না ?

এবার কান্না উথলে ওঠে সতীশের গলায়, একটা ঢোঁক গিলে বলে, নিশ্চয়—নিশ্চয় বাসে, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে কারুর ?

চম্পার সমস্ত মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তো জানি সে কথা। তোমরা কেউ জানো না, কিন্তু চম্পা তো জানে। চম্পা তো জানে, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কতখানি ভালোবাসে বিজন চম্পাকে—না সতীশদা ?

আবার ঠেলে আসে কান্না, আবার সতীশ বলে, নিশ্চয়, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে কারুর ?

চম্পা চোখ বুজে বোধ হয় একবার নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখে নেয়। বলে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি কি হয়েছে ব্যাপারটা। কলকাতায় পৌঁছে বিজন নিশ্চয়ই চিঠি দিয়েছিল আমাকে। কোন রকমে সেটা হারিয়ে গেছে বোধ হয়, আমি পাইনি সে চিঠি ··তারপর জবাব না পেয়ে তার হয়েছে ভয়ানক অভিমান। তারপর যতগুলো চিঠি দিয়েছি আমি, একটা চিঠিরও উত্তর দেয়নি সেই জন্যে।—না সতীশদা ?

সতীশ প্রবোধ দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অভিমান করেছে সে ; তবে

কতক্ষণ থাকবে ও অভিমান ? চম্পার সুমুখে যখন এসে দাঁড়াবে তখন কোথায় থাকবে বিজন বাবুর ঐ রাগ অভিমান ?

অনুনয়ের সুরে চম্পা বলে, বেশ করে বুঝিয়ে বোলো তাকে, বুঝলে সতীশদা ? বোলো, তার কোন চিঠি আমি পাইনি, না পেয়ে পরপর অনেকগুলো চিঠি লিখেছি আমি তাকে। রাগ দুঃখ্যু করে থাকে যদি আমার ওপর, সব যেন ভুলে যায়। বোলো, চম্পা মরতে বসেছে, তাই এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ করে বুঝিয়ে বোলো যে অবস্থা খুব খারাপ···বুঝলে ? একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে চম্পা, আচ্ছা সতীশদা, তুমি আমাকে এত ভালোবাস কেন ?

সতীশ মাথা নাড়ে, না, না, আমি আর কি ভালোবাসি ? বিজনের মত কি ভালোবাসি আমি ? বিজনের মত কেউ তোমাকে ভালোবাসেনা পৃথিবীতে।

একটা বড় নিঃশ্বাস চাপে চম্পা,—না সতীশদা, তোমার ভালোবাসার তুলনা নেই ইতিহাসে। এতো বড পাথর, অথচ এতো বড ভালোবাসা। পাথরের ঠাকুর, তাই তো পাল্লে তুমি এই হতভাগী মেয়েটাকে ঘাড়ে করে কলকাতায় আনতে···নিজের মান-সম্ভ্রমের দিকে একটুও নজর দিলে না !···

আবার একটু চুপ করে চম্পা। তারপর জিজ্ঞেস করে, এ মাসে কি বিয়ের দিন নেই ?—কবে আছে ?

সতীশ বলে, এ মাসে অনেক দিন আছে বিয়ের।

চম্পা বলে, বিজনকে কালই ডেকে এনো, কেমন ? তারপর আজ থেকে প্রথম যে বিয়ের দিন আছে পাঁজিতে, সে দিনই কাজটা সেরে দাও কোন রকমে।···তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেওয়াবে তো বিয়েটা ? তারপর একটু হেসে চম্পা বলে, অন্য লোকের হাতে আমাকে দিয়ে দিতে কষ্ট হবে না তোমার ? তোমাকেই তো সম্প্রদান করতে হবে।

আবার কান্না আসে গলা পর্য্যন্ত ঠেলে, আবার একটা ঢোঁক গেলে সতীশ···একটু ম্লান হেসে বলে, না, না, কষ্ট হবে কেন ? পাথরের ঠাকুর যে, তার আবার কষ্ট কিসের ?

অনেক রাত্তিরে একটা বয়কে ডাকিয়ে কমন-রুমে বিছানা পাতিয়ে নিলে সতীশ।

অনেক রাত্তিরে ঘুম এলো চম্পার। পেটের মধ্যে বিজনের যে সন্তানটা আছে, দু'মাসের ভ্রূণটা, সেটাকে যেন জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে অপরাজিতা। কেউ জানেনা সে ভ্রূণের কথা···সতীশও না। জানে শুধু অপরাজিতা নিজে, আর জানে সেই ভ্রূণটা।

ওরা ভালোবেসেছিল দু'জন দু'জনকে···বিজন আর অপরাজিতা। এই মাসেই নিশ্চয় বিয়ে করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজন। তারপর, সত্যি ভালোবাসার অন্ধ বিশ্বাস ছিল অপরাজিতার মনে। দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাড়ীর সকলের বিশ্বাসভাজন, ওদের বাড়ীতেই থাকতো বিজন হাজারিবাগে। উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, অবস্থাপন্ন, সুশ্রী সুকণ্ঠ যুবক, হাজারিবাগে ঠিকেদারী কাজ করতো বিজন ওদের বাড়ীতে অফিস ক'রে।

ওদের দু'জনের ছিল অবাধ মেলামেশা। বিজনের সম্বন্ধে কারুর মনে এতটুকু প্রশ্ন ছিলনা কোথাও।

তবু অপরাজিতার চোখ দুটো যেন বসে গিয়েছে, বড় বেশী যেন কালী পড়েছে চোখের দুটো কোলে···এদিকে রূপ যেন ফেটে পড়ছে সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে।

তবে কথাটা কেউ জানেনা এখনও···জানে শুধু অপরাজিতা নিজে, আর জানে ঐ দু'মাসের ভ্রূণটা।

—সতেরো—

সেদিন রাজীবলোচন, ক্ষমাদেবী ও বঙ্কিকে নিয়ে সুশান্ত যখন এসে আধুনিকায় পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শিবানন্দ কি একটা কাজ সেরে তখনই ফিরে এসেছেন হোটেলে। কি একখানা বই নিয়ে সবে আরম্ভ করেছেন পড়তে, এমন সময় সুশান্ত বঙ্কিদের নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো।

নবাগতদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে সুশান্ত। বহ্নির জীবনের বিপুল দুঃখের কাহিনীটা সংক্ষেপে ব'লে, তার মনে যে ঘরের ও বাইরের দ্বন্দ্বটা, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলে শিবানন্দকে। বল্লে, আমি এদের বললুম, এ ব্যাপারে কাকাবাবুই পারবেন আপনাদের সঠিক উপদেশ দিতে, এবং তাই মনে করে আপনাকে না জানিয়েই সোজাসুজি নিয়ে এলুম এঁদের একেবারে আপনার সুমুখে।

শিবানন্দ কি যেন একটু ভেবে নিলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যে, তারপর বল্লেন, দেখ সুশান্ত, মাতৃগর্ভে শিশু এলেই তার খাবার ব্যবস্থা মায়ের বুকে আগে থেকেই করে রাখেন ভগবান···আজ বহ্নি এসেছে আমার কাছে, কিন্তু আজ দু'দিন থেকেই আমার মন কেবল বলছে, আমার প্রয়োজন, অতএব আপনি থেকেই আমার কাছে এসে পড়বেন কাঙ্গালের ঠাকুর জগন্নাথ।

খৃষ্টপূর্ব্ব একদিন সুশান্তকে বলেছিলেন, শিবানন্দের চেহারাটা ঠিক যীশুখৃষ্টের মত দেখতে। সুশান্তরও প্রথম দিন তাঁর সুমুখে বসে মনে হয়েছিল, জীবনে প্রথমবার সমস্ত হিমালয়কে সে বুঝি একসঙ্গে দেখতে পেয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা বেলা এই তিনজন নবাগতের মন সেই অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের সুমুখে প্রায় সম্মোহিত অবস্থার কাছাকাছি গিয়ে পৌচেছে; মনে হয়েছে যেন অসাড হয়ে হালকা হয়ে গিয়ে, ঐ জলন্ত ধূপকাঠির ধোঁয়ার ভেলায় চড়ে, ওদের তিনজনের মন তখন স্পর্শ করতে চাইছে মাথার ওপরে ঐ নক্ষত্র-ভরা আকাশটাকে। শিবানন্দের দিকে তাকিয়ে বার বার মনে হয়েছে ওদের, কত স্থৈর্য্য, কত গাম্ভীর্য্য, কত শক্তিই না জানি আত্মগোপন করে রয়েছে ঐ অপূর্ব্ব সুন্দর মানুষটার ভেতরে।

কিন্তু বহ্নি শিবানন্দের শেষের কথাটা সহ্য করতে পারলে না। কাঙ্গালের ঠাকুর জগন্নাথের কথা বল্লেন তিনি। কথার ভাবে মনে হ'ল তিনি বলতে চাইছেন বহ্নিই বুঝি সেই কাঙ্গালের ঠাকুর জগন্নাথ। বহ্নির মনের মধ্যে কে যেন অট্টহাসি হেসে উঠলো—ওরে বহ্নি, তুই নাকি কাঙ্গালের ঠাকুর জগন্নাথ ? তুই তো অপয়া, অলক্ষী, হতভাগী··· চুপ করে থাকিসনি তুই···প্রতিবাদ কর কথাটার।

নিজের মনেই যেন বহ্নি বলে উঠলো···কাকাবাবু আমি তো অপয়া অলক্ষ্মী, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবো বিশ্বের সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অকল্যাণ সেখানে পৌছে যাবে আমার পিছু পিছু···আমি ভবে কেমন করে কাঙালের ঠাকুর জগন্নাথ হলুম ?

শিশুর মত হাহা করে হেসে ওঠেন শিবানন্দ · না, অলক্ষ্মীর রূপ আসলে লক্ষ্মীরই রূপ, টাকার দুটো পিঠের মত ও দুটো একই জিনিসের রূপ। মানুষের দেহ এবং দেহজ মনের ভোগ বিলাসের যে মাপকাঠি, সেটা দিয়ে মাপলে বহ্নির রূপটা হ'ল অলক্ষ্মীর রূপ, অথচ ঐ মাপকাঠিটা ব্যবহার না করলে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না কখনো। দাড়িতে হাত বুলোতে থাকেন শিবানন্দ। একটু চুপ করে থেকে বলেন, যে রূপটা বোঝা যায় না, আমার কাছে সেটাই জগন্নাথের রূপ। পুরীর মন্দিরে গিয়ে দেখেছি, বাইরে মন্দিরের গায়ে অপূর্ব্ব চারুশিল্পের সমাবেশ; মন্দিরের ভেতরে ঢোকবার সময় সমস্ত মনটা অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের রেখা ও গতির সুরে যেন গান গেয়ে ওঠে পাখীর মত। তারপর অন্ধকার পথ দিয়ে, অন্ধকার মন্দিরে ঢুকে যখন পৌছলুম জগন্নাথের কাছে, তখন যেন কিছু বুঝতে পারা গেল না। গোলাকার একটা মুখের আকৃতি, তাতে ভাঁটার মত বড় বড় গোল গোল দুটো চোখ···তারপর আর কিছু নেই। শোনা যায় বিগ্রহের সুমুখে দাঁড়িয়ে যে যা ভেবে যায় সে তাই দেখে। অথচ ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তি বৃন্দাবনে, দ্বারকায় কতো মধুর, কতো অপূর্ব্ব। পুরীর রূপ হ'ল অবোধ্য অবক্তের রূপ, যা কিছুতেই স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারা যায় না, সেই হ'ল জগন্নাথের রূপ।···

আবার একটু স্তব্ধ হয়ে থাকেন শিবানন্দ। তারপর একটা বড নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আমরা কতটুকু বুঝতে পারি? আমরা যতটুকু বুঝি, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পড়ে থাকে পৃথিবীতে, যা নাকি আমরা একেবারেই বুঝি না।—বিয়ের বর চলেছে পথের ওপর দিয়ে আলো বাজনা নিয়ে শোভাযাত্রা করে, তারপর একটু পরে একটা মোড়ের মুখে সেই শোভাযাত্রার সুমুখে হঠাৎ এসে পড়ে একটা শ্মশানযাত্রী

শবের অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা। বর চলেছে বিয়ে করতে, ঘর বাঁধতে, স্ত্রী-গর্ভে প্রাণের সৃষ্টি করবার জন্যে…আর সেই জীবনের এবারকার মত শেষ গান গেয়ে একজন চলেছে দৈহিক নিশ্চিন্ততার পথে। কে বুঝবে পাশাপাশি ঐ বরকে আর ঐ শবকে? কে বুঝতে পারে কালীর এক হাতে খড়্গ আর অন্য হাতে ঐ বরাভয়ের মর্ম্মকথা? যাকে বুঝতে পারলুম না, তিনিই জগন্নাথ, যা হেঁয়ালি হয়ে রইলো চোখের সুমুখে, আমার কাছে সেই হ'ল জগন্নাথের রূপ।

ক্ষমা দেবী বলেন, এগারো বছর বয়েসে সেই যে তিনটে মাস, তারপর থেকে আমরাও পারিনি বহ্নিকে বুঝতে।

জোরে জোরে ঘাড় নাড়েন শিবানন্দ…হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। এগারো বছর বয়েসে সেই তিনটে মাসের পর কি যে হ'ল…যা হ'ল, কেন যে তা' হ'তে পারলো. একথার উত্তর যে দিতে পারবে সেই বুঝতে পারবে বহ্নিকে। যেন উৎসবের রাত্তিরে দপ করে নিবে গেল সব আলো। কেন নিবলো? কেন এলো এই ঘুটঘুটে অন্ধকার? পুরীর মন্দিরের গায়ের ওপর সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-উৎসবের মধ্যে, এ যেন সেই ঘন অন্ধকারে কিম্ভূতকিমাকার বিগ্রহ রূপ…এই হ'ল বহ্নির রূপ। তাই বলছিলুম, যে আজ এসেছে হঠাৎ আমার কাছে অনাহূতের মত আমার নিজের প্রয়োজনে, সেই হ'ল কাঙ্গালের ঠাকুর জগন্নাথ।

সুশান্ত বল্লে, ঘর ও বাইরে নিয়ে এই যে দ্বন্দ্ব উঠেছে বহ্নির মনে সেটাকে পরিষ্কার করে দিন আপনি।

শিবানন্দ হেসে বললেন, ওটাকে পরিষ্কার করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা একটু ভেবে দেখলেই বহ্নি বুঝতে পারবে যে আসলে ওটা কোন দ্বন্দ্বই নয়। ও ঐ লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর মত একটা জিনিসেরই দুটো দিক, ঐ ঘর ও বাহির। বহ্নি তো সর্ব্বভুক, সে ঘরকেও গ্রহণ করে, বাইরেকেও অস্বীকার করে না। ঐ ইন্দ্রিয়জ ভোগের মাপকাঠি দিয়ে মাপলেই আমাদের ভোগের জীবনটা আমাদের কাছে ঘর, এবং ভোগের অভাবটা বাহির, এই নাম পেয়ে এসেছে চিরদিন… অথচ আমাদের মাংসল দেহটা যে ভোগবিলাস চায় তার কথাটা

সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারলেই শ্রীরাধার ঘর-বাহির, পর-আপন সব মিলে-মিশে এক হয়ে যায় একেবারে। তারপর বহ্নির দিকে তাকিয়ে শিবানন্দ বল্লেন, জানোতো মা, কবির গান :—

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু,
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু
তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।…

আসলে তিনি দত্তাপহারক…দিয়ে তারপর সব কেড়ে নিয়ে যান একে একে। দুঃখের মধ্যে, বঞ্চনার মধ্যে, চোখের জলে তাঁর আসন পাতা ; তিনি বঞ্চনা করেন তাইতো আজও মানুষ বেঁচে আছে, আজও মরেনি ধর্ম্ম। 'আমি বহুবাসনায় প্রাণপণে চাই তুমি বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে'।…

তারপর কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন শিবানন্দ…মাসীর বাড়ী এলেন কাঙালের ঠাকুর জগন্নাথ, যাবার সময় মাসীটিও সঙ্গে যাবে এবার। আমি যে কর্ম্ম আশ্রয় করে আছি এখানে এই হোটেলে, তাতে মাঝে মাঝে সেই কর্ম্মের জন্যে স্থান-পরিবর্ত্তন করে আত্মগোপন করবার প্রয়োজন হয় আমার। আজকেই সন্ধ্যেবেলা একটা সংবাদ পেয়েছি, যাতে আজ রাত্তিরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে হবে।…বহ্নি মা, তুমি কি আমাকে আশ্রয় দেবে ? নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের বাড়ী ?

এসে পর্য্যন্ত রাজীবলোচন চুপ করে ছিলেন, এইবার কথা কইলেন তিনি। বল্লেন, আপনাকে নিয়ে যাব এই আশা করেই আমরা আজ এসেছিলুম এখানে। আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

ক্ষমা দেবী আবার সেই আগেকার মত হাহা করে হেসে ওঠেন। বলেন, জগন্নাথ এসে আজ শিবকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ী। তারপর সুশান্তর দিকে তাকিয়ে আবার বল্লেন ক্ষমাদেবী, বহ্নিকে তো তোমরা জাননা কেউ ঠিক করে, ও শিবকে শুধু নিয়েই যাবে না

বাড়ীতে, পূজো করে, আরতি করে সেই যে বসাবে সিংহাসনে, তারপর বৈদ্যনাথের শিবের দশা করে ছাড়বে, আর নড়তে চড়তে দেবেনা একটুও সেখান থেকে। রাবণের অমন দশটা ঘুষি খেয়ে মাথায় দশ জায়গায় গর্ত্ত হয়ে গেলেও শিব নিজেই পণ ধরে বসবেন, আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়বো না।

বৈদ্যনাথের শিবের দুর্দ্দশা কল্পনা করে সকলেই হাসতে লাগলেন প্রাণখোলা হাসি। তক্ষুনি দু'খানা ট্যাক্সি ডাকা হ'ল। প্রণতিকে ডাকিয়ে আড়ালে গিয়ে শিবানন্দ ফিস্ ফিস্ করে কি বললেন তাকে। তারপর সকলে মিলে উঠলেন সেই দু'খানা ট্যাক্সিতে। আজ অনেকদিনের পর 'আধুনিকা' পিতা পুত্রী দু'জনকেই হারালো।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময় এলো শিবানন্দের ঘরে পুলিসের হানা। প্রণতির কারসাজিতে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র অপরাজিতার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, বোধ করি আরও কিছু ছিল ঐ ঘরটার মধ্যে। সেগুলো সামলাচ্ছে আমাদের লর্ড ক্লাইভ, সেই অমিবৃতি চুরির ভরত। ঘরে খুব করে ধূপ ধূনো দেওয়া হয়েছে, গন্ধক পোড়ানো হচ্ছে, দরজা বন্ধ করে একটা কম্বল পেতে ভরত শুয়েছে মেঝের ওপর। পুলিসকে প্রণতি বল্লে, শিবানন্দ বাবু তো কাল সকালে বেরিয়েছেন, আজও ফেরেন নি ; ওঁর ঘরে আছে একটা চাকর, তার আবার জ্বর হয়ে গায়ে কি সব বেরিয়েছে কাল থেকে, মনে হচ্ছে বসন্ত।...

জ্যোৎস্না সেন পুলিস অফিসার, তাঁর বাড়ীতেও দু'তিন জনের বসন্ত হয়েছে এবারে। তাঁর ভাই সেদিন মারা গেছে বসন্ত হয়ে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে। তিনি বসন্তের নাম শুনে চমকে উঠলেন...বসন্ত হয়েছে ? তাহ'লে এ্যাম্বুলেন্সে খবর দিন ? রুগীকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন হাসপাতালে।

প্রণতি বল্লে, এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করেছিলুম—বল্লে, কোন হাসপাতালে সিট নেই।...

গম্ভীর মুখে জ্যোৎস্না সেনের সঙ্গীটি বল্লেন, হ্যাঁ, সেই রকমই হয়েছে এবার কলকাতার অবস্থা। চতুর্দ্দিকে ভয়ানক পক্স হচ্ছে।

পেছুনে ক'জন সশস্ত্র লোক নিয়ে একবার দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালেন

ভরতের ঘরের সুমুখে। ভেতর থেকে গন্ধক পোড়ার গন্ধ আসছে, মাঝে মাঝে কাৎরাচ্ছে ভরত। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো জ্যোৎস্না সেনের শরীরে। বল্লেন, এখন আর ঢুকবো না ও ঘরে, পরে কখন আসবো টেলিফোন করে জানাবো আপনাকে। আচ্ছা, শিবানন্দ বাবু লোকটি কি রকম বলতে পারেন ?

প্রণতি বললে, খুব উঁচু দরের সাধু পুরুষ বলে মনে হয়; দিনরাত জপতপ নিয়েই তো থাকেন।

জ্যোৎস্না সেনের সঙ্গীটি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসেন। বল্লেন, ঐ জপ-তপই তো ডেঞ্জারাস্...আচ্ছা, বেলা বলে তাঁর একটি মেয়ে আছে না ? খুব সুন্দর দেখতে ?

প্রণতি বল্লে, বেলা তো তাঁর নাম নয়,...তাঁর নাম তো বিদ্যুৎ... হ্যাঁ, ঐ যা বলেছেন, খুব সুন্দর দেখতে। তবে তিনিও তো আজ দশ দিন এখানে নেই। শুনছি নাকি এ্যামেরিকায় চলে গেছেন প্লেনে করে।

লর্ড ক্লাইভ তখন ঘরের ভেতরে খক্ খক্ করে কেশে উঠলো।

কাশীর শব্দে আবার ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে জ্যোৎস্না সেনের সর্ব্বাঙ্গে। সে সঙ্গীর গা টিপে চুপি চুপি বল্লে, শুনছো না ঘঙ্ ঘঙ্ কাশছে ? বসন্ত রুগীর কাশীতেও ভয়ানক বিষ বেরোয়, চলো এখান থেকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না।

*　　　*　　　*

বারো নম্বর ঘরে তখন ব্যবসার কথা চলছে। লছমনদাস সিন্ধি থাকে বারো নম্বর ঘরে, তার কাছে এসেছেন সুনীতি বাবু। খুলনা জেলার লোক। পাকিস্থান হবার হ্যাঙ্গামে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন দেশ থেকে, বৌদিদি ও ছোট বোনকে হারিয়ে।

চার পেগের ওপর মদ খেয়েছেন সুনীতি বাবু, লছমনদাসের এই সাত পেগ চলছে। এবারে সুরু হয়েছে ব্যবসার কথা।

আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে কথা কইছে ঐ সিন্ধি লছমনদাস। সুনীতি বাবুকে বোঝাচ্ছে খুব লাভের ব্যবসার কথা।

—হামি হোটেলঠো কিনে লেগা—তিশঠো ঘর হ্যায়। ভালা ভালা

আওরাত চাই—রিফিউজী লেড়কী খুব সস্তা…বড়ো ভালা আছে। যৈ সা পদ্মাকা টাটকা ইলিশ মাছ…লছমনদাসের বড় বড় লাল লাল চোখ দুটো আরও যেন টক্‌টকে হয়ে ওঠে।

দ্রব্যগুণে হা হা করে হেসে ওঠেন দু'জনে। লছমনদাসের ওপরের মাড়ীর খানিকটা পাট করা লাল রুমালের মত মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে…হামি তো বলছি বাবু ই কাম করুন হাপনি, মোটা দালালী মিলেগা রোজ রোজ।

সুনীতি বাবু ভদ্রঘরের ছেলে, প্রথমবার একটু জেদ করে মদ খেয়েছেন আজ, তাতে কি এমন এসে গেল ? চারটে পেগেও একেবারে বুদ্ধি লোপ হয়নি সুনীতি বাবুর ; লছমনদাসের প্রস্তাব শুনে হঠাৎ যেন গাটা বমি বমি করে উঠলো তাঁর। বল্লেন, না লছমনবাবু, ও কাজ আমি করতে পারবো না।

লছমন ভালো উপদেশ দেয়,—বাবু হামি হাপনাকে সমঝাই : আভি পাঁচঠো বিজনেস্ চোলছে আমাদের দেশে—একঠো বেলেক মার্কেট, একঠো আওরাতকা বিজনেশ্, একঠো জুয়া, একঠো জ্যোতিষ আর একঠো দেওতা।…

—দেওতার আবার বিজনেশ্ কি ? জিজ্ঞেস করেন সুনীতি বাবু।

লছমনদাস বলে, যেইসা করলো নেপাল বাবা…কতো পয়সা বানিয়ে নিলো, কতো লোক মারে দিলো কলেরায়। ঐ বিজনেশ করতে পারবেন হাপনি ?

সুনীতি বাবু এবারেও ঘাড় নাড়েন, না এও আমি করতে পারবো না।

লছমনদাস বলে, তাহ'লে কেয়া করেগা হাপনি ? রাজা বনকে রাজটা চালাবেন কি ?

এইবারে মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে মদের নেশা। সব চলে গেছে যা ছিল, ঘর বাড়ী, প্রকাণ্ড পুকুর—পুকুরের কথাটায় একবার কেমন যেন টলে উঠলো শরীরটা—যেন সেই আগেকার দিনের মত ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন সুনীতি বাবু, সেই পুকুরটার মধ্যে বিকেলবেলায়।

বেলা পড়ে আসছে, গাছের ছায়াগুলোও যেন মদ খেয়েছে তাঁর

মত···একটু একটু করে হেলে পড়ছে মাটির দিকে। প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ···চারটে পাড়েই বড় বড় গাছ। ছায়ায় রোদ্দুরে যেন অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছে ঐ পুবদিকের ঘাটটা।

কলসী নিয়ে হেনা এসেছে জল নিতে। ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐ ছাতিম গাছটার তলায়। হেনার সঙ্গে আসছে মাসে বিয়ের কথাবার্ত্তা, সব পাকা হয়ে গিয়েছিল সুনীতির। হাসলে চোখ দুটো ছোট হয়ে যেত হেনার।

তারপর? তারপর সেই রাত্তিরে লছমনদাসের সুমুখে বসে নেশা খুব চেপে ধরলো সুনীতি বাবুকে···হাজার হোক প্রথমবারের মদ খাওয়া তো? কেমন যেন হাঁফ ধরার মত মনে হচ্ছে সুনীতির।···

—খুব একটু একটু ফরসা হয়েছে তখন···ওরা সবাই দড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা। দশটা শরীরেরই ক্ষতবিক্ষত অবস্থা···সুমুখে নবীন আর পরেশের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে, দু'জনেরই মাথা নেই।

ওরা সবাই লুট করে নিয়ে গেছে বৌদিকে আর ছোট বোন শিবানীকে, পাড়া থেকে হেনাকে, আরও অনেক মেয়েকে।···

পাশের খুঁটিতে বাঁধা ধর্ম্মদাস। সুনীতি তাকে বল্লে, হাতটা একটু খোলা পেলেই আমরা আত্মহত্যা করে ফেলবো, না ধর্ম্মদা?

ধর্ম্মদাস ধমক দিয়ে ওঠে···না, না সব গেছে যাক, মা-বোনদের নিয়ে গেছে ভুলে যাচ্ছিস? আমাদের বাঁচতেই হবে, মা বোনদের উদ্ধার করে আনতে হ'বে, মারতে হবে ঐ পাষণ্ডদের।

ওদের হয়ে যারা পাহারা দিচ্ছিল সেখানে, তাদের মধ্যে ছিল ইসমাইল। ধর্ম্মদাসের কথা শুনে, হুররে বলে তার গালে পটাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে।···

বড্ডো চেপে ধরছে নেশাটা···বৌদি, শিবানী, হেনা ··যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো সুনীতির মাথার মধ্যে। সোজা হয়ে উঠে বসলেন সুনীতি বাবু। বল্লেন, লছমান বাবু, আপনি কি ব্যবসার কথা বলছিলেন আমাকে?

ন' পেগ হয়ে গেছে তখন লছমনের। সে ইজিচেয়ারটার ওপরে হেলে পড়ে বল্লে, পাঁচঠো।···

সুনীতি বাবু অস্থির হয়ে ওঠেন, না না পাঁচঠো না, প্রথম বল্লেন কোন ব্যবসার কথা?

লছমনদাস পাকা মাতাল ন'পেগেও স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লে, পহিলেটা বলেছি রিফিউজি লেড়কীর বিজনেশের কথা।...

—ঐ ওরা চীৎকার করে উঠলো তিনজন...বৌদি, শিবানী, হেনা... ঐ ওদের হিড হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক'জন পাঞ্জাবী আর সিন্ধি মুসলমান...এও সিন্ধি, এই লছমনদাস...মেঝের ওপরে দাড়িয়ে উঠেছেন সুনীতি বাবু।...

লছমনদাস একেবারে শুয়ে পড়েছে ইজিচেয়ারটার ওপরে, পাকা মাতাল, ঘুম এসে গিয়েছে তার খুব জমে...ঘড় ঘড করে নাক ডাকাচ্ছে শুয়ে শুয়ে।...

—আবার ঐ ভয়ানক চীৎকার করে উঠলো হেনা...টেবিলের ওপর পড়েছিল লছমনদাসের একটা রেজার ব্লেড...খাম থেকে বার করে দাঁড়িয়ে দেখছেন সুনীতি বাবু চকচকে ব্লেডটা আলোর দিকে তুলে... চীৎকার করে বল্লেন লছমনদাসকে, আর কখনো বলবি ঐ কথা? আর কখনো মুখে আনবি মা বোনকে নিয়ে ব্যবসার কথা?...

কে শুনবে? লছমনদাসের তখন গভীর রাত্রি, বোধ হয় তিনটে বাজতে সাত মিনিট...ঘড ঘড় করে খুব ডাকছে নাক, যখন তখন বাজা এ্যালার্ম ঘড়ির মত।...

বুকের ওপর ঠেসে ধরেছেন সুনীতি বাবু ঐ লছমনদাসকে। দু'জনের নিঃশ্বাস লাগছে দু'জনের মুখে। একবার একটু চোখ খুলে ডান হাত দিয়ে সুনীতি বাবুকে চেপে ধরে, জড়িয়ে জড়িয়ে লছমনদাস বল্লে, রিফিউজি গার্ল এসেছো?...

কে বিশ্বাস করবে সুনীতির কথা? ঐ আবার ভয়ানক চীৎকার করে উঠলো ওরা তিনজন...বৌদি, শিবানী, হেনা।...

কে বিশ্বাস করবে সুনীতির কথা? কে বুঝবে কেন, কেন, তিনি ভদ্রঘরের ছেলে মদের নেশার ঘোরে লছমনদাসের টুঁটিটা সাফ কেটে দিয়েছেন সেই রেজার ব্লেড দিয়ে!

পাশের খুঁটিতে বাঁধা ধর্ম্মদাস বলে উঠেছিল, বাঁচতে হবে, মারতে হবে ঐ পাষণ্ডদের !···

—ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল ঐ বলিষ্ঠ সিন্ধিটা, পারেনি, —দানবের দুরন্ত শক্তি এসেছিল তখন সুনীতির গায়ে। একবার একটু চীৎকার করে উঠেছিল লোকটা।···

আর কখনো বলবি ঐ মা বোন নিয়ে-ব্যবসার কথা ? এই কথা বলেছেন বিড়বিড় করে সুনীতি, আর বেহালার ছড়ির মত ব্লেডটা টেনেছেন লছমনদাসের গলার তাঁতগুলোর ওপর।···

রক্তে রক্তে ভেসে গেছে সমস্ত ঘরটা। ইজিচেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে লছমনদাস। ঠিক কাটা ছাগলের মত ছটফটানি।···

এইজন্যে লোকে বলে, মদ খেতে নেই, মদ শয়তান। এমন বহির্মুখী করে দেয় মানুষকে, নেশার অবস্থায় যে কোন উদ্দামতাই সম্ভব হয়ে ওঠে তার পক্ষে। এইজন্যে লোকে বলে মদ খেতে নেই, মদের নেশায় মানুষ মানুষকে খুন পর্য্যন্ত করে ফেলতে পারে।

—আঠারো—

সেদিন যখন ফর্সা হয়ে এলো ভুতাহা চরে, নিবে গেল আকাশে শেষ-রাত্তিরের চাঁদটা, তখন সেই নৌকোতে বসে রণেন উত্তরদিকে উজান ঠেলে চরটা থেকে অনেকদূরে চলে এসেছে একলা। সিন্দুক-গুলোকে নাবিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ আর মিশ্রাজী রয়ে গেছে ভুতাহা চরে। রণেনের সেখানে সেদিন নামবার উপায় ছিল না, সে দিবালাঘাটের পশ্চিমদিকের পরের বড় ষ্টেশনে গাড়ী ধরে যাবে রামপুর, সেখান থেকে প্লেনে করে কলকাতা হয়ে পরের দিনই চলে যাবে বম্বে। কাকাবাবুর আদেশ, সে যেন পরশু কিম্বা বড় জোর তার পরের দিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যায় বম্বেতে।

সকালবেলায় নৌকোর ওপরে হু হু করে বইছে কনকনে বাতাস। রণেনের গায়ে তিনখানা গরমজামা পরাজয় স্বীকার করেছে শীতের কাছে। সেই তিনটে জামা ফুঁড়ে বাতাস লাগছে যেন হাড়ের মধ্যে

গিয়ে, মাঝে মাঝে সর্ব্বাঙ্গ ঠকঠক করে কেঁপে উঠছে রণেনের। মাঝিদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কয়ে রণেন ভুলতে চাইছে দুর্দ্দান্ত শীতের মধ্যে তার সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসহায় অবস্থার কথা।

রণেনের প্রকৃতিটা বড় অভিমানী; আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তার অত্যন্ত প্রখর। একটা মস্তবড় কথা ছিল রণেনের মনে, কাউকে বলা যায়না এমন একটা ভয়ানক কথা। কাউকে বলা যায়না, অথচ একজনকে বলবার জন্যে, সে কথাটা একজনকে জানাবার জন্যে, দুরন্ত মনটা কতো-বার যেন কতো অস্থির হয়ে উঠেছে আপনা থেকে। কিন্তু তবু বার বার বুক ফেটে যাবার মত হয়েছে, অথচ আজও মুখ ফোটেনি একবারও, সে শুধু তার ঐ দুর্জ্জয় আত্মাভিমানের জন্যে। কতদিন কত শুভক্ষণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে না ব'লে, কতো মালা গাঁথা, প্রদীপ জ্বালা, মধুলগন বয়ে গিয়েছে, কত সজল নিস্তব্ধতা নিয়ে; তবু অভিমানী মনটা কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। আজও শুধু রণেনই জানে সে কথা, আর অন্য কেউ জানেনা।

রণেন বেলাকে ভালোবাসে। তবু সৈনিকের জীবনে ও ভাববিলাসের কতটুকু মূল্য? সেদিন সেই প্রচণ্ড শীতের সকালবেলায় নৌকোর ওপরে বসে আবার হঠাৎ কথাটা মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো আলোর মত··· বেলাকে সে ভালোবাসে। হঠাৎ চমকে উঠে আবার সুইচ টিপে আলোটাকে নিবিয়ে দিলে রণেন।

কিন্তু বেলা? বেলা কি ভালোবাসে রণেনকে? আবার লাগলো খুব শীত, হাড়ের মধ্যে আবার জাগলো ঠকঠক করে কাঁপুনি, হাতদুটো প্যাণ্টের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার জড়োসড়ো হয়ে বসল রণেন ভালো করে নৌকোটার ওপর। সে ভালোবাসে, সেই তো বড় কথা, বেলা ভালোবাসে কিনা তাতে কতটুকু আসে যায়? কি হবে বেলার ভালোবাসা পেয়ে? ঘর বাঁধা? ঘর বাঁধবে নাকি সে বেলাকে নিয়ে? রণেনের হাসি পায়, জ্যোতিষের বিচারে আর শুধু দুটো বচ্ছর আয়ু আছে তার, তারপর সব অন্ধকার···তারপর কোথায় বা থাকবে সে, আর কোথায় বা থাকবে বেলা!

আবার একটা আলো জ্বলে উঠলো···দিল্লীর উমা ত্রিবেদীর মুখখানা।

বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে রণেনের ঠোঁট দুটো, না, না, নারী-দেহ নিয়ে খেলা করবার তার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও নেই…আবার মনে পড়ে গেল সেই দিল্লীতে বলা কথাটা : যে কোন অবস্থাতেই হোক উমার ভালোবাসার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়তর।

অভিমানী মনটা আবার দাঁড়ায় ফণা তুলে, কিছু চাই না, কিছু চাই না। আমি নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ,.কোন অভাব নেই, এতটুকু নেই কোথাও কোন অসঙ্গতি। কারুর কাছে হাত পাতবার কোন প্রয়োজন নেই।…

কিছু চায় না রণেন,—ঘর চায় না, ভালোবাসা চায় না, বেলাকে চায় না…আর কতদিনই বা? আর তো মোটে দুটো বছর।

এদিকে ভুতাহা চরে ঘাট থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে ঘন বনের মধ্যে মাটির তলায় একটা ঘরে সিন্দুকগুলো রাখিয়ে দিলেন মিশ্রাজী, অর্থাৎ অভয়ঙ্কর মিশ্র। চারজন করে লোক প্রত্যেকটা সিন্দুককে ঘাট থেকে বয়ে নিয়ে গেল। তখনো অন্ধকার রয়েছে, শেষ-রাত্তিরের চাঁদটা জ্বলজ্বল করছে আকাশে।

তারপর ঘন অড়র ও ভুট্টার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সরু আলের ওপর টর্চ জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন, বিদ্যুৎ আর মিশ্রাজী। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে শেয়াল জাতীয় কি একটা নিশাচর জীব খুব কাছ দিয়েই দৌড়ে পালালো ধড়ফড় করে। মাঝে মাঝে কাছের গাছ থেকে ফরফর করে উড়ে পালাচ্ছে রাত্তিরের পাখী। কখনো কখনো দূরে নদী থেকে জাহাজের সার্চ লাইটের আলো উঠছে চমকে চমকে। বিদ্যুতের মনে হ'ল নদীর দিকটাতে যেন তরল হয়ে আসছে অন্ধকার, এইবার একটু একটু করে বুঝি ফরসা হয়ে আসবে।

অড়র ও ভুট্টার ক্ষেত ছেড়ে ওরা এসে পড়েছে এবার বেশ ঘন জঙ্গলে। এখানে চাষ-আবাদ হয় না ; পড়তি জমিতে নিজের ইচ্ছেয় বেড়ে উঠেছে পাঁচ-মিশেলি বুনো গাছের নিবিড় বন। খুব সরু একটা ছোট্ট খালের মত রয়েছে পশ্চিম দিকে, তাতে জল রয়েছে স্থানে স্থানে ; অনেক দূর থেকে বিদ্যুৎ দেখ্‌লো এক জায়গায় সেই খালের অগভীর জলে শেষ রাত্তিরের চাঁদটা নেবেছে সাঁতার কাটতে।

পথ চলতে চলতে মিশ্রাজী পূব দিকে হাত দেখিয়ে বলেন, লোকে বলে ঐখানটায়, ঐ কুল বনে ভূত থাকে।…

বিদ্যুৎ অধ্যাত্মবাদী, সে ভূত বিশ্বাস করে। তবু জীবনে আজও একবারও ভূতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। দেখতে ইচ্ছে করে ভূতকে অথচ ভয়ও করে। মিশ্রাজীর কথার উত্তরে বিদ্যুৎ বল্লে, দেখাবে আমাকে ?

মিশ্রাজী বল্লেন, শুক্লপক্ষে খুব ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্তিরে দেখা যায়, অন্য সময়ে দেখা যায় না। দেখতে চাও তো জ্যোৎস্নার সময় আবার এসো।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করে, কি দেখা যায় ?

মিশ্রাজী বলেন, আগে ঐখানে শ্মশান ছিল, ঐ ভূত দেখার পর থেকে আর ওখানে কেউ মড়া পোড়ায় না। একটা কুল গাছের তলায় গভীর রাত্তিরে একটা মেয়েকে দেখা যায়, শাড়ী পরা, অনেক দূর থেকে পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঐ কুল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

—কোথা থেকে আসে?—ঐদিকে কি বসতি আছে ? জিজ্ঞেস করে বিদ্যুৎ।

মিশ্রাজী বলেন, বসতি আছে, কিন্তু সে অনেক দূরে। চড়া শেষ হয়ে গিয়ে যেখানে আসল জমি আরম্ভ, সেখানে আছে একটা গ্রাম। একটু ঘুরে যেতে হয় ঐ খালটার পাশে পাশে, তা সে প্রায় সাত আট মাইল হবে এখান থেকে।…

পায়ের তলায় কি একটা খস্ খস্ করে পালিয়ে গেল…চমকে ওঠে বিদ্যুৎ।

বা পাশে আবার একটু আবাদের জমি, এখানে খানিকটা জায়গায় আলুর চাষ করা হয়েছে। তারপর আর একটু দূরে একটা ছোট্ট বাগানের মধ্যে মাঝারি রকমের একটা খোলার ঘরের পাশে আরও একটা ছোট্ট খোলার ঘর। মিশ্রাজী বিদ্যুৎকে নিয়ে সেই বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। তখন বেশ আলো হয়ে উঠেছে আকাশে।

ছোট্ট ঘরটার ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। মিশ্রাজী হাত দিয়ে ঠকঠক

করে ঘা মারতে লাগলেন দরজার ওপরে।—গৌরীজী ও গৌরী, ও সিতারা বিবি।...

বাগানের পেছুন দিক থেকে একটা দশ এগারো বছরের খোট্টা চাকর এগিয়ে এলো। হিন্দী করে বল্লে, সিতারা বিবি কাল অনেক রাত্তিরে ঘুমিয়েছে, অনেক রাত পর্য্যন্ত গান বাজনা চলেছিল।...কাল রাত্তিরে খুব বেশী মদ খেয়েছে সিতারা বিবি। সেই চাকরটার নাম বদরী। সে আবার বল্লে, অনেক বারণ করেছিলো সে সিতারা বিবিকে, কোন কথা শোনেনি। বোধ হয় এক বোতল মদ নিজেই খেয়েছে সিতারা বিবি কাল রাত্তিরে।...

দরজার ওপরে আবার ধাক্কা দেন মিশ্রাজী...সিতারা বিবি, ও সিতারা বিবি, ও গৌরীজী।...

অনেক ধাক্কার পর ঝপাৎ করে দরজা খুলে গেল। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠা আলুথালু নারী-মূর্ত্তি। রোগা ডিগডিগে শরীর, অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে থাকার, অনেক মদ খাওয়ার, ও অনেক গান গাওয়ার অবসাদ চোখে-মুখে যেন কালি লেপে দিয়েছে ঘন করে। তামাটে রঙ, তবু মুখখানা বড় সুন্দর দেখতে।...

ঘুম থেকে জেগে উঠতেই এসেছে কাশির ধমক...খক্ খক্ করে খুব কাশছে সিতারা বিবি।...

এই সিতারা বিবিকে নিয়ে মিশ্রাজীর দুর্নাম আছে। বিরাট সম্পন্ন-ঘরের একমাত্র বংশধর অভয়ঙ্কর মিশ্র। লোকে বলে, একটা বাজিউলী নষ্ট মুসলমান মেয়ের পেছুনে পেছুনে, তিনি নাকি ঘর বাড়ী সব ছেড়ে দিনরাত্তির ঘুরে বেড়ান আজকাল। অথচ অভয়ঙ্করের মত অত বড় চরিত্রবান লোক কলকাতা শহরে খুঁজে বার করা মুস্কিল ছিল একদিন।

লক্ষ্মৌয়ের গৌড় ব্রাহ্মণ বংশ, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে সরকারী কাজকর্ম্মের খাতিরে কলকাতায় বাস কচ্ছেন অভয়ঙ্করের পূর্বপুরুষেরা। অভয়ঙ্করের জন্ম-কর্ম্ম সব কলকাতায়। বাঙালীর মত বাঙলা বলেন, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে বেশ ভালো দখল আছে মিশ্রাজীর।

এক ভাই, পাঁচ বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে বাবার

জীবদ্দশায়। বিরাট সম্পত্তি ও প্রকাণ্ড বাড়ী কলকাতায়। এখন বাড়ীতে একলা থাকেন অভয়ঙ্কর মিশ্র।

ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, কিন্তু তারপর যা কিছু লেখাপড়া করেছেন সব নিজে থেকে, দোর বন্ধ করে। এর আগে বহুদিন একরকম ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ হয়েই থাকতেন মিশ্রাজী, তারপর আজ এই দু'তিন বছর থেকে ঐ সিতারা দেবীর পাল্লায় পড়েছেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন দীর্ঘনিঃশ্বাস টানেন···তাইতো, এতো ভালো একটা লোকের এতো শোচনীয় অধঃপতন!

তবে এর পেছনে আরও কথা আছে। কলকাতাতেই মাণিকতলার মহেশ দুবের বারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন অভয়ঙ্কর। ওদেরও বহুদিন ধরে কলকাতায় বাস। ওরাও ঠিক বাঙালীর মত বাঙলা বলে।

পরম আনন্দে দু'বচ্ছর কেটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমন ভালো-বাসা বুঝি সচরাচর চোখে পড়ে না। কেউ কাউকে এক মিনিট চোখের আড়াল করতে পারতো না। যেখানে দেখ, দু'জনে বসে আছে পাশাপাশি···যেন দেহ দুটোও এক হয়ে গেছে একেবারে। ধনীর বাড়ীর দেওয়ালে অনেক ছিল দেব-দেবী, প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি। তার মধ্যে একখানা ছিল অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ···একদেহের মধ্যে শঙ্কর ও উমা। গৌরী প্রায়ই ঐ ছবিটা দেখিয়ে স্বামীকে বলতো···ঐ দেখ আমরা দু'জন ···অভয়ঙ্কর ও গৌরী, শঙ্কর আর উমা।···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে সিতারা বিবি, ঐ হ'ল গৌরী, সেই যে মিশ্রাজী ডাকলেন তাকে গৌরীজী বলে?

পৃথিবীতে এমন অনেক অসম্ভব কাণ্ড ঘটে যায়, এমন অনেক ব্যাপার চোখে পড়ে, যা নাকি দেখলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনা। ঐ যে মেয়েটা মদ খেয়ে ঘুমচ্ছিল ঘরে, মিশ্রাজী অনেক ডেকে যাকে ওঠালেন, কি আশ্চর্য্য, ঐ হ'ল গৌরী? শেষ পর্য্যন্ত ঐ কথা বিশ্বাস করতে হ'ল আমাদের?

বোধ হয় চোদ্দ বচ্ছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন। দুটো বয়েস এসে দুটো ঢেউ-এর মত ধাক্কা খেয়েছে শরীরের ওপর, কৈশোর আর যৌবন।

সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গিমায়। ভেতর থেকে মা হবার প্রথম জেগেছে আবেদন।

ওঁরা বৈষ্ণব, রাধারমণজীর নিত্য সেবা হ'ত বাড়ীতে। শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন সেদিন অভয়ঙ্কর, গৌরীকে নিয়ে কীর্ত্তন শুনতে। নিজের গাড়ীটা খারাপ ছিল, ট্যাক্সি করে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় শ্বশুর-বাড়ীর গাড়ীতে না এসে, আবার ফিরেছিলেন-আর একটা ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে গল্প করছিলেন দু'জনে। কীর্ত্তন শুনেছেন বয়ঃসন্ধির রাধার। অভয়ঙ্কর বলেন, বয়ঃসন্ধির অপূর্ব্ব বর্ণনাটা শুনছিলুম, আর কেবল দেখতে পাচ্ছিলুম তোমাকে। গৌরী পাল্টা জবাব দেয়, আর আমি শ্রীরাধা, আমার সমস্ত রূপ যৌবন নিয়ে শুধু দেখছিলুম তোমাকে। ···একেবারে গায়ে গায়ে ঠেসে বসেছে দু'জনে। পথে-ঘাটে অতটা আবার ভালো নয়, একটু সীমা মেনে চলাই ভালো। ছি ছি লোকে দেখলে যে অসভ্য বেহায়া বলবে?

মুসলমান ট্যাক্সিওয়ালা হাসিমুখে একবার পেছন ফিরে তাকায় ওদের দিকে।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো ওদের বাড়ীর সুমুখে। দরোয়ান কাজে বেরিয়ে গেছে···দশটাকার নোট,···ট্যক্সিওয়ালার কাছে ভাঙানি নেই।···

অভয়ঙ্কর গাড়ী থেকে নেবে ট্যাক্সিওয়ালাকে বল্লেন, আচ্ছা দাড়াও পাঠিয়ে দিচ্ছি টাকা···কত উঠেছে মিটারে?

ভারী গলায় পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা বল্লে, তিন রুপেয়া বার আনা··· আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি ব'লে হন হন করে অভয়ঙ্কর বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন।

—তাইতো ঠাকুরের গলার সেই মালাটা? সেটা তো এনেছি সঙ্গে করে?···ড্রাইভারের দিকে পেছন করে পেছনের সিটের ওপরের তাকটা হাতড়াচ্ছে গৌরী।···তাইতো ঠাকুরের গলার সেই মালাটা!···

—ঝপ করে ট্যাক্সির দরজটা বন্ধ হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা জোরে চালিয়ে দিলে গাড়ী। গৌরী অবাক হয়ে সুমুখে ফিরে চীৎকার করতে যাবে, একটা বড়ো ছুরি দেখিয়ে চাপা-গলায় ট্যাক্সিওয়ালার পাশের লোকটা ব'লে উঠলো—চুপ রহো!···

—তাইতো কোথায় গেল সেই ঠাকুরের গলার মালাটা ? ট্যাক্সি তখন খুব জোরে চলেছে রাস্তার ওপরে ছুটে।...

*   *   *

তারপর সিতারা বিবি। রহমৎ আলির নিকে করা বৌ। দক্ষিণ পাঞ্জাবের মরুভূমির গায়ে ভাওয়ালপুর রাজ্য, শতদ্রু নদীর ওপর। সেইখানে রহমতের ঘর আলো করে থাকতো সিতারা বিবি।

অনেক আদর যত্নে, অনেক সম্মান দিয়ে রেখেছিলো রহমৎ আলি। লোকটা আসলে খারাপ নয়। বিবির মর্য্যাদার মূল্য জানে।

একটা কথা বলতে ভুলেছি, গৌরী খুব ভালো গাইতে পারতো। সেই গান দিয়ে সে সম্মোহিত করে রেখেছিল সারা ভাওয়ালপুর রাজ্যটা। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সিতারা বিবির গানের সুনাম ছড়িয়ে গিয়েছিল ঝোড়ো বাতাসের মত।

বাঙালী বিবি বলেও প্রসিদ্ধি ছিল তার চতুর্দ্দিকে। ওখানে অনেকে তাকে বাঙালী বিবি বলেই জানতো।

অভয়ঙ্করকে একটাও চিঠি দেয়নি গৌরী...কি হবে চিঠি লিখে? আর কি হবে ফিরে গিয়ে? আর কি মুখ দেখাবার উপায় হবে? আর কি সেখানে মিলবে জায়গা? একখানাও চিঠি লেখেনি গৌরী, সে কোথায় আছে কাউকে জানায়নি একদিনও। শুধু গান গেয়েছে, আর খুব খেয়েছে আঙুরের মদ। চব্বিশ ঘণ্টা লাল চোখে কাটিয়েছে গৌরী, ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই অভয়ঙ্করের স্ত্রী, সেই আমাদের বোষ্টুমী গৌরী।

তারপর একদিন গেল রহমৎ মিয়ার নেশা কেটে। ওদের দেশের প্রথা মত বাঙালী বিবি একদিন উঠলো নীলেমে। বেলুচিস্থানের একজন ধনী ব্যবসায়ী তাকে নীলেমে কিনে নিলো। বড় রসিক লোকটা, ঐ জাফর খাঁ। নিলেম হয়ে যাবার পর বাঙালী বিবির হাত ধরে বল্লে, ময় বাগবাঁ, তুম গুল—অর্থাৎ আমি বাগানের মালী, তুমি গোলাপ।

ঠিক ফুলের মত করেই রেখেছিল ঐ ব্যবসায়ীটা, জাফর খাঁ। তাদের অনেকগুলো ফলের বাগান। সেখানে বাঙালী বিবি পাখীর

মত প্রচুর খেয়েছে ফল, প্রচুর গেয়েছে দিনরাত্তির ধরে গান। আর চব্বিশ ঘণ্টা গিলেছে আঙুরের কড়া টাটকা মদ।

তারপর এগারো বছর পরের কথা। কে তিনজন মেয়ে বাজি দেখাচ্ছে বাড়ীর পাশে মোড়ের কাছে। ভীড় জমে গেছে খুব। সবার চোখে ধুলো দিয়ে খুব বাজি দেখাচ্ছে ওদের মধ্যে একজন। আর একটা মেয়ে, মাঝে মাঝে সময় বুঝে উর্দ্দু একটা গান গাইছে, আর খোলা ডালা থেকে ফণা তুলে উঁচু হয়ে উঠে একটা গোখরো সাপ ফুলে ফুলে উঠছে ঐ তৃতীয় মেয়েটার বাঁশীর সুমুখে।

ঐ মধ্যিখানের মেয়েটা লোকের চোখে ধুলো দিয়ে নানা রকমের বাজি দেখাচ্ছে, আর একটা কাঠের মত জিনিস সাপটার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে, যেমন করে প্রদীপ নিবোয়, তেমনি করে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিচ্ছে,—ফু-ফু···সাপটা ফোঁস ফোঁস করে ছোবল মারছে কাঠটার ওপর।

যে মেয়েটা গান গাইছে, সে মাঝে মাঝে কোলের ওপর ঢোল বাজাচ্ছে ডুগ্ ডুগ্ করে।

বিচিত্র পোষাক পরেছে ওরা, ঐ তিনটে মেয়ে। পেশোয়াজ, ওড়না, অথচ বেদিনী বেদিনী বুনো বুনো ভাব। মাথার ওপর ফুল পাতা আঁকা লাল রঙের বিচিত্র রুমাল বাঁধা। গাছের ছায়ায় বাজি হচ্ছে, গাছের ঘন ছায়ায় ঐ রঙবেরঙ-এর পোষাক পরা মেয়ে তিনটেকে দেখলে সত্যিই মনে হয় ওরা যেন এ পৃথিবীর নয়।

ভীড়ের মধ্যে যে যার মন্তব্য করছে। একজন বল্লে, অনেক সাপুড়ে দেখেছি, কিন্তু মেয়ে সাপুড়ে এই প্রথম দেখলুম···আর একজন বেশ একটু ঘন রস দিলে,···ও সাপটাও বোধ হয় মেয়ে মানুষ, হা-হা-হা !···

অভয়ঙ্করের মোটর গাড়ীটা লাইব্রেরী থেকে ফিরছে। গৌরী যাবার পর ঐ মাঝে মাঝে এক-আধ দিন লাইব্রেরীতে যান অভয়ঙ্কর। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা দরজা বন্ধ। কেবল বই—বই—বই···অন্য কোন দিকে নজর দেন না একটুও। নায়েব গোমস্তারা সব লুটে খাচ্ছে। বিরাট বাড়ীটা বড়ো যেন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করতে থাকে।···

সেই যে সকালবেলা দোর বন্ধ করেন, আর খোলেন না। পাশের

ঘরে খাবার রাখা থাকে, খাবার সময় সেই যা একটু বেরোন ঘর থেকে; আর বেরোন তখন, যখন লাইব্রেরী যান।

বেদিনীদের সুমুখে নেবে পড়লেন অভয়ঙ্কর। বেশ ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। ঐ যে, যে মেয়েটা ফু-ফু করে ফুঁ দিচ্ছে সাপটার সুমুখে ও তাঁর স্ত্রী, ও সেই অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া গৌরী।

তারপর আবার ফিরে পেয়েছেন গৌরীকে, সে কথা কাউকে ঘুণাক্ষরে জানতে দিলেন না অভয়ঙ্কর। গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল অমন করে, চোখের সুমুখে যেন সব আলো নিবে গিয়েছিল একেবারে। তারপর জীবনধারণ করার কোন অর্থই ছিল না অভয়ঙ্করের কাছে। কতো চেষ্টা করেছিলেন তিনি গৌরীকে ফিরে পাবার জন্যে…অর্থের অভাব ছিল না, জলের মত অর্থব্যয় করেছিলেন, সেই ট্যাক্সিটা পালিয়ে যাবার পর থেকে। কথাটা আশ্চর্য্য শোনাচ্ছে বটে, তবু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি তাঁর, গৌরীকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এতদিন পরে সেই গৌরী ফিরে এসেছে আবার তাঁর জীবনে। একথা কি কাউকে বলবার? কাউকে কোন কথা বলেননি অভয়ঙ্কর, শুধু একদিন নায়েব গোমস্তাকে ডেকে কতকগুলো বৈষয়িক ব্যাপারে নির্দ্দেশ দিয়ে বল্লেন, কিছু দিনের জন্যে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছেন। কোথায় যাবেন, কবে ফিরবেন সে সব কথা কাউকে বল্লেন না।

তারপর একদিন শেষ-রাত্তিরে সেই যে তাঁর পড়ার ঘরে তালা দিয়ে গৃহত্যাগ করলেন অভয়ঙ্কর, আর অনেকদিন কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। তবে কলকাতাতেই ছিলেন, কেন না কেউ কেউ দেখেছে তাঁকে,—দেখেছে সেই বাজিউলীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন পথে পথে। পাড়ার একজন তাঁকে সেদিন ঐ তিনটে বেদেনীর সঙ্গে রাজাবাজারের একটা কাফিখানায় বসে থাকতে দেখেছে।

কি ভাবছে লোকে তাঁর সম্বন্ধে? ভাবছে, অতবড় ঘরের ছেলে অভয়ঙ্কর, এতদিন পরে চরিত্র হারিয়েছেন, একেবারে জাহান্নমের শেষ ধাপে নেবে গেছেন তিনি। একটা নষ্ট মুসলমান বাজিউলী, পথে পথে বাজি দেখিয়ে বেড়ায়, প্রকাশ্যভাবে তার পেছুনে পেছুনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভয়ঙ্কর, এই ব্যাপারে লোকে তাঁকে চরিত্রহীন ছাড়া

আর কি বলতে পারে? এই অবস্থায় আর কি থাকতে পারে কারুর মনে অভয়ঙ্করের জন্যে এক তিল শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম? ছি ছি, এতদিনের এতবড় সম্মান ঐ মিশ্র পরিবারের, একেবারে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অভয়ঙ্কর?

অথচ কতো যে বিপুল ভালোবাসা ঐ লোকটার রক্ত-প্রবাহের মধ্যে,...সেই যে যেদিন বিয়ের রাত্তিরে প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন থেকে কতবড়ো জায়গা জুড়ে ঐ গৌরী রয়েছে অভয়ঙ্করের মনের মধ্যে, সে খবর কেই বা রাখতে চায় পৃথিবীতে? তাকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি, আজকের ঐ মাতাল মেয়েটা যে তাঁরই অক্ষমতা, তাঁরই শক্তিহীনতার জন্যে সম্ভব হয়েছে, এ কথা কেমন করে ভুলে যাবেন মিশ্রাজী? আজ আর কিছু নয়, আজ শুধু সেবা করে, যত্ন করে যদি একটু স্বস্তি দিতে পারেন গৌরীকে, যদি এইটুকু বুঝিয়ে দিতে পারেন, যে আজও তিনি তাকে ঠিক আগেকার মতই ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাহ'লেই হয়তো যথেষ্ট হবে। এখন কি আর সামাজিক মান-সম্ভ্রমের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো চলে? ও যে গৌরী, যে-কোন অবস্থাতেই হোক গৌরী সমাজের চেয়ে বড়ো।

কিন্তু কে ভাববে এদিককার কথাটা? দুনিয়া কি জানলে? দুনিয়া শুধু জানলে চরিত্রহীন অভয়ঙ্করকে; সবাই শুধু দেখলে, একটা সামান্য বাড়িউলী মুসলমান মেয়ের পেছুন পেছুন কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভয়ঙ্কর।

তবে অভয়ঙ্করের সম্বন্ধে অত কথা বলেই বা লাভ কি? এবারে এসে পড়েছে এই হতভাগ্য লেখকের কথা। আমার পাঠক-পাঠিকারা যে সহৃদয় সে বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ আছে নাকি? এত করে এতদিন ধরে যে গল্প শোনাচ্ছি তাঁদের, তারপরেও এই লেখকের কথাটা যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সুশান্ত সুলতা, মনো, বেলা, বিদ্যুৎ, বহ্নি, শিবানন্দ, খৃষ্টপূর্ব্ব, এই সব পাত্র-পাত্রীর জন্যেই আমার পাঠক-পাঠিকাদের মাথাব্যথা। বেলা কি বিদ্যুৎ? এই কথা জিজ্ঞেস করছেন বারে বারে। গান্ধীজীর দেশে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেন ঘাঁটাঘাঁটি কচ্ছি; এতবড় গল্পটার মধ্যে যাকে বলে ঠিক

খারাপ চরিত্র, তা একটাও এলোনা এখনো···পৃথিবীতে সবাই কি ভালো, যে সব ভালো চরিত্রই আঁকছি? আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আমার ওপর রাগ করছেন ঐ সব কথা নিয়ে। অর্থাৎ, তাঁরা সকলের কথাই ভাবছেন, শুধু ভাবছেন না এই হতভাগ্য লেখকটার কথা।

ভুতাহা চরের একটা বড নিম গাছের তলায় একেবারে নদীর কাছে দাড়িয়ে আছি সকালবেলা, সুমুখে অজিতদার মৃতদেহটা একটা ঝোপের কাছে গাছপালায় আটকে পড়েছে। এমন সময় পেছুন ফিরে দেখি লেখক শরৎচন্দ্র। আগের দিনের সেই চাপা হাসিটা লেগে রয়েছে মুখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, আমাকে নকল করছ কেন?

চমকে উঠলুম···আপনাকে নকল কচ্ছি? কই না তো?···

আবার হাসলেন শরৎচন্দ্র,—পুরুষ অন্নদাদিদিকে সৃষ্টি করবার কি প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া সাপুড়ের ব্যাপারটাও নকল করেছ···ইচ্ছে করলে ওটাকে অন্তরকম ভাবেও তো বলা চলতো?···

—তাই তো···অন্ধকারে যেন খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলে-···তাই তো এ কোথায় এসে পড়েছি···সত্যিই তো, ব্যাপারটা তো প্রায় সেই অন্নদাদিদির গল্পের মতই হয়ে দাড়িয়েছে? শক্তিহীন পঙ্গুহাতে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব উত্তোলন করবার প্রয়াস? দলে দলে কত হাতী গেল তল, এখন আমার মত একটা মশা,—সে কিনা বলে কতখানি জল? মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এখন আর উপায় কি?

শরৎচন্দ্র বল্লেন, কি তোমার উদ্দেশ্য? কি বলতে চাও তুমি? শিবানন্দ, বেলা, বিদ্যুৎ, রণেন এদের দিয়ে কি কাজ করাচ্ছ তুমি?

বল্লুম, .শিবানন্দের শ্লোগান রাষ্ট্র চাই না, সমাজ চাই। ওরা রাষ্ট্রের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্যে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে···পৃথিবীর সমস্ত দেশে সংগঠন আছে ওদের।···

—কেন, রাষ্ট্রের ওপর এত রাগ কেন?

বল্লুম, রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় ক'জনের ব্যাপার ব'লে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সব সময়ে, সেই মুষ্টিমেয় ক'জনের নীচ কদর্য্য স্বার্থ এসে পড়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম্ম ও মন্ত্রের মধ্যে। রাষ্ট্র কদর্য্য নোংরামিতে ভরা,

vulgar ; সেখানে মানুষের মানবতা অর্থাৎ culture বেঁচে থাকতে পারেনা।

শরৎচন্দ্র বল্লেন, খুব বড় বড বুলি তো আওড়াচ্ছ, বুলিগুলোর মানে বোঝ কি ? সমাজকে তোমার মতে রাষ্ট্রের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব হবে সে কথা ভেবে দেখেছো কি উপন্যাস লেখবার আগে ?

বল্লুম, বিকেন্দ্রীকরণই বোধ হয় হবে ওর একমাত্র উপায়।

শরৎচন্দ্র হাসলেন···বিকেন্দ্রীকরণ ? কেমন হ'বে সেই বিকেন্দ্রীকরণের রূপ ?

বল্লুম, সেটাই তো শিবানন্দের দল উপলব্ধি করেছে।···

তারপর শরৎচন্দ্র আবার বল্লেন, অতো যে ভালোবাসার কথা লিখেছ, কতটুকু বোঝ ভালোবাসার ? কখনো ভালোবেসেছ কাউকে ?

এইখানে লেখকের মস্তক কণ্ডুয়ন করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। বল্লুম, হ্যাঁ, বোধ হয়, বোধ হয় ভালোবেসেছি।···

শরৎচন্দ্র ধমক দিয়ে ওঠেন···বোধ হয় নয়, বোধ হয় বোধ হয় চলবে না মোটেই। যদি ভালো না বেসে থাকো, কখনো লিখোনা ভালোবাসার কথা। আমি জীবনে বহুবার বলেছি, যে জিনিস চোখে দেখনি, যা নাকি নিজে থেকে বোঝনি কোনদিন, কখনো লিখতে যেওনা কিছু সে জিনিসের সম্বন্ধে। তারপর অজিতদার মৃতদেহটার দিকে আঙুল দেখিয়ে শরৎচন্দ্র আবার জিজ্ঞেস করলেন,—ও কে ?

বল্লুম, ও অজিতদা, বেলাকে ভালোবাসতো।···

—বেলা কোথায় ?

বল্লুম, এ্যামেরিকা গেছে।···

একথা কি সত্যি ? বেলা কি বিদ্যুৎ নয় ?

অনুযোগের সুরে বল্লুম, আপনিও জিজ্ঞেস করছেন ও কথা ?

আবার হাসেন শরৎচন্দ্র,—আচ্ছা বুঝলুম। ও কথা না হয় আর জিজ্ঞেস করবো না। তারপর বাঙালীর কি করলে ?

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম, বাঙালীর কি করবো ?

শরৎচন্দ্র বল্লেন, বাঙ্গালী কখনো মরবে না। নীতি-প্রধান সাহিত্য

লেখবার চেষ্টা করো তোমরা, যেমন করেছিলেন বঙ্কিম। আবার 'আনন্দমঠ' লেখবার প্রয়োজন হয়েছে বাঙ্গালাদেশ ও সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যে। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, একটু থেমে শরৎচন্দ্র আবার বল্লেন, বঙ্কিম-সাহিত্যের মর্ম্মকথা ছিল নীতি, তারপর এলো রবীন্দ্র-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যানুভূতি। আমার লেখায় ছিল উচ্ছ্বাস। সাহিত্যে তার পরের কথা হ'ল যা তোমরা বল বাস্তববাদ—realism। এখন সাহিত্যের রূপ হয়ে এসেছে ঐ অজিতদার মৃতদেহটার মত—পচে গেছে, মাছে খুবলে খাচ্ছে ওকে। তবে আবার যাচ্ছে চাকাটা ঘুরে, বঙ্কিমের সময়ের মত আবার এসেছে চাবুক মারার দিন। আবার চালাও চাবুক, বাঙালী আবার বেঁচে উঠবে।

ঐ যে সুমুখে অজিতদার মৃতদেহটা, ওটা একটু নড়ে উঠলো। বোধ হয় মাছেই খোবলাচ্ছে ওটাকে। কোথায় শরৎচন্দ্র ?…দেখলুম কলম হাতে ঘরের মধ্যে একলা বসে রয়েছি।

—উনিশ—

দিবালাঘাটের কাছে সেই শেষরাত্তিরের ট্রেন দুর্ঘটনার পরের দিন সকালবেলা সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। বড় হরফে সব সংবাদপত্রে ঐ খবরটাকেই শীর্ষস্থান দেওয়া হ'ল। দিবালা-ঘাটের কাছে ফ্রন্টিয়ার মেল দুর্ঘটনা, মেল ভ্যান লুট, রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকারদের ঘন ঘন চীৎকার শোনা গেল। একখানা কাগজ নিয়ে সুশান্ত ও সুলতা ঘরে বসে বসে পড়ছে, আর আলোচনা করছে ঐ ব্যাপার নিয়ে।

সুলতা বল্লে, উঃ কি ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়ে গেল, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। যারাই করে থাকুক কাজটা, আমার মতে ঐ রকম কাজ করা ভয়ানক অন্যায়।…

সুশান্তও একমত। বল্লে, কাজটা অন্যায় তো নিশ্চয়ই, কিন্তু যারা করেছে তারা কি বলবে জানো? বলবে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন হলে সব রকম অকল্যাণের কাজ করাই ন্যায় ও নীতিসঙ্গত।

রাগ করে ওঠে লতা,—বলুক গে ওকথা ওরা। কত নির্দোষীর প্রাণ গেল, আমার কাছে সেইটেই হ'ল বড় কথা।···

সুশান্ত বলে, ওরা বলবে, বহু নির্দোষীকে শোষণ থেকে বাঁচাবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন, অন্য উপায়ে সেই অর্থ পাবার সম্ভাবনা না থাকলে বহুর বেদীর ওপর অল্পকে বলি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তাছাড়া, যার সঙ্গে বিরোধ তার কাজকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন।

আবার রাগ করে সুলতা,···বলুক গে ও কথা ওরা, ও সব হ'ল গায়ের জোরের কথা।···পরে জোরে জোরে সুলতা ঐ দুর্ঘটনার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যটা পড়তে লাগল: 'আজকাল প্রায়ই এইরূপ ট্রেন দুর্ঘটনা হইতেছে, বহুলোকের প্রাণহানি ঘটিতেছে; পরে সরকার তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতেছেন, এবং তদন্তের শেষে প্রায় প্রত্যেক-বারই আন্তর্ঘাতিক কার্য্যকলাপ ঐ সকল দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া তদন্ত কমিটি মন্তব্য করিতেছেন। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ আন্তর্ঘাতিক কার্য্যকলাপের মূল কারণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। শুধু কম্যুনিষ্টদের উপর দোষারোপ করিলেই সরকার এবং জনসাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। কেন দেশে কম্যুনিজ্‌মের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই কথা অবিলম্বে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দেশে যত অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব বাড়িতে থাকিবে, পুঁজিদার ও মুনাফাখোরের আধিপত্য যতদিন এইরূপ অব্যাহত থাকিবে, ততদিন কম্যুনিজমের প্রসার বাড়া অবশ্যম্ভাবী। যে দুধ খাইতে পায়না এমন একটা ছয়মাসের শিশুও মনে-প্রাণে কম্যুনিষ্ট।'···

হঠাৎ বাধা দিয়ে সুশান্ত বলে, দেখ, আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে। সেই যে এখানে যেদিন এসেছিল বিদ্যুৎ, সেদিন বলে গেল না যে সে ক'দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যাবে; আমি ওদের দলের কথা যতটুকু জানি, তাতে আমার মনে হয় যে বিদ্যুৎ ঐ ব্যাপারেই কলকাতার বাইরে গেছে।···

মনের ভেতর চেপে-রাখা কথাটা এক এক সময় বড় অকস্মাৎ

খাটের তলা থেকে সাপের মত বেরিয়ে পড়ে। কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে লতা বল্লে, বিদ্যুৎ কে ?

সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বিদ্যুৎ…আমাদের বিদ্যুৎ।…

সুলতা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, হাত নেড়ে বলে, ওঃ বিদ্যুৎ …ঘন মেঘে বিদ্যুল্লতা…আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ, চমকে চমকে।…

খুব আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুশান্ত। বলে, ও কথার মানে ?

টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা ছিল, একটু আগে গরম জলে চা দিয়েছে লতা। এখন চামচে দিয়ে জলটা ঘুলিয়ে নিয়ে পেয়ালায় চা ঢেলে চিনি, দুধ, মিশিয়ে নিলে ; পেয়ালাটা সুশান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, কথার মানে কিছু নেই, এখন চা খাও।

সুশান্ত চেপে ধরে,…না না, বলনা, কি বলতে চাও ?…

নিজের জন্যে চা ঢাললে লতা, পেয়ালাটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা চুমুক দিলে পেয়ালায়। পরে চেয়ারে বসে পড়ে বল্লে, কি আবার বলতে চাই ? কিচ্ছু বলতে চাইনা।…

আবার অনুনয় করে সুশান্ত,…না না, বলবে না কেন ? বলনা, কি বলতে চাও।

লতা খুব গরম চা খেতে পারে। আগুন আগুন চায়ে আর একটা চুমুক দিয়ে বল্লে, বলছি যে, তুমি মনে কর সুলতা ভয়ানক বোকা, কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কেন ?

আড়-চোখে একবার তাকায় সুলতা। বলে, কেন কি ? আমার কাছে সব কথা লুকিয়ে, বুদ্ধি করে বেলাকে বিদ্যুৎ সাজিয়ে আমার কাছে নিয়ে এলে কেন ?

একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে সুশান্তর মুখ, অথচ সুলতার মুখে ঠেলে উঠেছে শরীরের সমস্ত রক্তোচ্ছ্বাস। এ যেন একটা শাদা গোলাপ আর একটা লাল গোলাপ মুখোমুখি বসে আছে এক টেবিলে।

সেই ফ্যাকাশে মুখে হাসে সুশান্ত, যেন মরা মানুষ হাসছে। বলে, বেশ তো তুমি, তুমি ঐ কথা বলছ ? কিছু কি লুকিয়েছি কখনো

তোমার কাছে? আজ এতদিন তো বিয়ে হয়েছে আমাদের, কোন ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কোন মিথ্যাচার করেছি কি কখনো?

না, না, তা করেনি সুশান্ত কোনদিন। সুশান্ত ও সুলতার জীবনে কোনদিন কোন ছায়া, কোন কুয়াশা ছিলনা…দু'জন দু'জনকে ছাড়া বিশ্বজগতে অন্য কাউকে জানেনি কোনদিন…সবাই বলতো, ওদের মত সুখী স্বামী-স্ত্রী সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

আসল কথা তা নয়, বিদ্যুৎকে বেলা বলে সন্দেহ দু'জনেই করেছিল ওরা, সুশান্ত ও সুলতা, তবু প্রাণপণে কথাটা দু'জনেই রেখেছিল মনের মধ্যে চেপে। সুশান্ত চাইতো সুলতা প্রথমে বলুক কথাটা, আবার সুলতা ঠিক উল্টোটা আশা করে চুপ করেছিল…ভেবেছিল, বেলা বিদ্যুৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার কোন প্রয়োজন নেই, বিদ্যুৎ বেলা হ'ক বা না হ'ক তাতে তার কিছু এসে যাবে না, অতএব সে কেন কইতে যাবে ওসব কথা?

আসলে লুকোচুরির খেলা খেলছিল ওরা দু'জন মনে মনে…বিদ্যুৎ যে বেলা এ বিষয়ে দু'জনের মনেই স্থির বিশ্বাস জন্মে গেছে, অথচ ইচ্ছেটা এই যে অপরপক্ষই প্রথমে বলবে ও কথাটা। যে প্রথম বলবে কথাটা, ঐ ব্যাপারে তার গরজটাই তো প্রমাণ হয়ে যাবে অন্যজনের কাছে? তাই শাড়ী-পরা সুন্দর একটা পুতুলের মত বিদ্যুৎকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলেছে ওরা দু'জনে, তার ভেতর থেকে বেলা বেরিয়েছে হাসতে হাসতে, দু'জনেই বার করে নিয়ে এসেছে বেলাকে সেই ছেঁড়া পুতুলের ভেতর থেকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে, মস্ত বড় সার্চ লাইট ফেলেছে তার মুখের ওপর, মনে মনে পরস্পরকে বলেছে, ঐ দেখ বেলা, অথচ কেউ মুখ ফুটে কোনদিন কথাটা বলতে পারেনি অপর পক্ষকে।

তবুও বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনদিন কোন কথা সুশান্তকে বলেনি সুলতা। অখণ্ড ভালবাসা ও বিশ্বাসের ওপরেই ছিল ওদের দু'জনের ঘর-বাঁধা; তবু যে ধরণের কথা সে কখনো বলেনি এর আগে, আজ হঠাৎ খাটের তলা থেকে সেই সাপটাই বেরিয়ে পড়লো ফণা তুলে। মানুষের মনকে বুঝে ওঠাই দায়, কোথায়

কোন ফাঁকে যে সাপ লুকিয়ে থাকে মনের মধ্যে কেউ তার সন্ধান জানতে পারে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার···এখানেও এলো নাকি সিতারা বিবি বাজি দেখাতে? এক নিমেষেই বদলে গেছে ছবিটা, আগেকার রক্ত-গোলাপটা শাদা গোলাপ হয়ে গেছে, আর শাদা গোলাপটার মুখে ছুটে এসেছে এক সমুদ্দুর টগবগে রক্ত, সেটা এখন হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। অর্থাৎ স্থলতার মুখটা এইবার শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে···ছি ছি, একি করলো সে? তার মতন দেবতুল্য স্বামী ক'জন স্ত্রীলোকের ভাগ্যে জোটে? ক'জন পুরুষের মধ্যে থাকে এত সততা, এমন ভালবাসা? তাকে এতবড় কথাটা কেমন করে বলে ফেল্লে স্থলতা?

মুখে এক সমুদ্দুর রক্ত নিয়ে স্থশান্ত বল্লে, তুমি আমাকে কি কথাটা বল্লে বলতো লতা? তুমি বল্লে কিনা যে আমি বেলাকে বিদ্যুৎ সাজিয়ে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে? একেবারে ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে স্থলতার মুখ···আগুনের মত গরম চা ছাড়া খেতে পারে না স্থলতা, অথচ, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। চা খাবার কথা মনে নেই ওর, মুখ নীচু করে চুপ করে বসে আছে স্থলতা।

কিন্তু স্থশান্ত কি হার মানবে? ওর নাম স্থশান্ত···কতো বড় বড় ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মুখে নিষ্কম্প প্রদীপের মত ও স্থির অচঞ্চল থেকে এসেছে চিরদিন, আজকে সামান্য একটা কথার জন্যে ও কি হারিয়ে ফেলবে নিজের অসাধারণ সংযম ও প্রশান্তি? স্থশান্ত নিজে থেকেই সামলে নিলে গোলমালটা।···

দাঁড়িয়ে উঠে অন্য একটা পেয়ালায় চা ঢালে স্থশান্ত, দুধ চিনি মিশিয়ে লতার দিকে পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ও চা তো খেতে পারবে না তুমি, ও ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। তার চেয়ে এই পেয়ালা থেকে খাও।

কে যেন একটা ঘুঁষি মেরেছে স্থলতার মাথায়—মাথাটা আরও নীচু হয়ে গেছে। কখনো কখনো আদর সোহাগের আতিশয্যে, ভালোবাসার আধিক্যের জন্যে ঝগড়া হয়েছে দু'জনের মধ্যে, কিন্তু

এতবড় একটা কথা নিয়ে ঝগড়া এই জীবনে প্রথম। একবার দু'দিনের জন্যে বাপের বাড়ী গিয়ে সুলতা সুশান্তকে আদর করে, কবিত্ব করে, খুব বড় একখানা ছ'সাত পাতা-ভরা চিঠি লেখে, অথচ সুশান্ত উত্তর দিয়েছিল শুধু দুটো লাইন লিখে। এই নিয়ে খুব পাকিয়েছিল দু'জনের ঝগড়া। লতা বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর প্রায় দশদিন দু'জনের কথা বন্ধ ছিল। তারপর আর একদিন সুশান্ত কথায় কথায় বোকা না বলে সুলতাকে ইংরেজীতে বলেছিল ষ্টুপিড...এই নিয়ে ভয়ানক খেপে গিয়েছিল লতা। এই নিয়েও অনেকদিন স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল একেবারে। ষ্টুপিড না বলে বাঙলা করে বোকা বলতো যদি সুশান্ত, তাহ'লে নিশ্চয়ই লতা অত রাগ করতো না। সময় সময় ইংরেজী কথাগুলো যেন বুলেটের মত দুম করে বুকে বিঁধে বসে। আমি একজনকে জানি, ইংরেজীতে কথা বলবার সুযোগ পেলে তাঁর চোখে মুখে এমন ভাব ফুটে উঠতো, মনে হ'ত তিনি যেন বিশ্বজয় করে ফেললেন। 'বই' কথাটা বললে যেন শুধু দপ্তরীর বাঁধাই করা ছাপা কতকগুলো পাতা বোঝাতো, কিন্তু চোখ মুখ উজ্জ্বল করে তিনি যখন গলাটা ফুলিয়ে বলতেন 'বুক্‌স্,' তখন তাঁর মুখে যে ছবি ফুটে উঠতো তাকে দপ্তরীর বই কিছুতেই নাগাল পেতে পারে না। বিদ্যার ওপর এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি আত্মপ্রকাশ করতো তাঁর ঐ 'বুক্‌স্' উচ্চারণে যে মনে হ'ত ভক্তের বাক্ মহিমায় কমল বনে বুঝি স্বয়ং সরস্বতীর বুক ধড়ফড় করে উঠলো।

কিন্তু সুশান্ত নিজেই সামলে নেয় ব্যাপারটা। বলে, তুমি বুঝি সেদিন বুঝতে পেরেছিলে, ও বেলা—ছদ্মনাম ধরে যমজ বোন সেজে এসেছে? আমি কিন্তু অত শীগ্‌গির ধরতে পারিনি। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে এখনও আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ও সত্যিই বিদ্যুৎ...এখনও তোমার মত আমার সন্দেহ অত বদ্ধমূল হয়নি।...

লতা ঠাণ্ডা চাতেই একটা চুমুক দিলে। সুশান্ত যেন হাত বুলোয় তার পিঠের ওপর। বলে, জানো লতা, তুমি যে কেন রাগ করেছ সে আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি। বেলা যে বিদ্যুৎ এই সন্দেহ নিয়ে

আমি কেন কোন কথা বলিনি তোমাকে···এই জন্মেই তো তোমার রাগ ?

লতা বলে, আমি একটুও রাগ করিনি।

সুশান্ত হাসে। বলে, তবে ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিলে কেন ?

—রাগ ঠাণ্ডা করবো বলে,···হি হি করে হেসে ওঠে লতা।

কথাটা ঐখানে থেমে গেল বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা অত হালকা নয়। আসলে ওদের দু'জনের মনে ছিল গভীর ভয়। যত বা বেলাকে ভয়, তার চেয়েও বেশী ভয় বেলার আশ্চর্য্য রূপকে। আকাশের চাঁদ, দূর আকাশে সুন্দর বটে, কিন্তু আকাশ থেকে হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়ায় যদি চাঁদটা, তাহ'লে তাকে কে না ভয় করবে ? লতা তো অত রূপসী নয়, তবে ? তবে সুমুখের চাঁদটাকে কেন ভয় করবে না লতা ? তারপর সুশান্তর ভয় আরও বেশী। যদি ঐ আশ্চর্য্য চাঁদটা লতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় ঐ অনেক দূরের আকাশে ?

সারা সন্ধ্যে কথাটাকে হজম করবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে রাত্তির বেলায় আর পারলেনা লতা। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে এসে সুশান্তর পা দুটো জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়লো মেঝের ওপরে···বলো আমার ওপরে রাগ করনি ?

সুশান্ত মাটির ওপর থেকে লতাকে টেনে তোলে···না না, রাগ করবো কেন ?···

স্বামীর পিঠে হাত বুলোয় লতা···কেন রাগ করবে ? তুমি বলেই পারছো ও কথা বলতে, আমি হলে জীবনে আর কখনো মুখ দেখতুম না। কত বড় অপমানের কথা আজ বলেছি বলতো তোমাকে ? সুশান্ত হাসে। বলে, লতার কাছে আমার আবার কিসের মান-অপমান ?

ও কথা কানে তোলে না লতা, স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে তার হাতের আংটিটা ঘোরাতে থাকে আঙুল দিয়ে। বলে, তুমি কত বড়, কত সুন্দর, কত উঁচু, অথচ আমি একদিনের জন্মেও তোমার যোগ্য হতে পাল্লুম না। তারপর আবার এসে পড়ে বেলার কথা, লতা বলে, তুমি বেলাকে এত ভয় কর কেন ?

আশ্চর্য্য হয়ে সুশান্ত বলে, আমি ভয় করি?

লতা বলে, হ্যাঁ, বড্ডো ভয় কর তুমি। কিন্তু কেন? তোমার কি করতে পারে বেলা? তোমাকে জয় করে নিয়ে যাবে, এই বুঝি তোমার ভয়?

সুশান্তর হাসি পায়। বলে, তাই যদি হয়, যদি জয় করতেই আসে বেলা, লতা আমায় রক্ষা করবে না?

সমস্ত মুখটা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে লতার। বলে, নিশ্চয়—নিশ্চয় রক্ষা করবে লতা, তারপর একহাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে বলতে থাকে,—কেউ পারবে না তোমাকে জয় করতে···অনেকদিন আগে লতাই জয় করে নিয়েছে তোমাকে···আর কি কারুর কিছু করবার জো আছে এখানে? লতার কাছ থেকে আর কখনো কেউ পারবে না তোমাকে ছিনিয়ে নিতে···সুশান্তর গা হাতড়ায় লতা, যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেনা···কেউ পারবেনা কক্‌খনো, দেখো তুমি, অমন লক্ষটা বেলা এলেও পারবে না কোনদিন।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, তোমার কি মনে হয়, ও সত্যিই বেলা?

লতা হাসে। বলে, আমার তো তাই মনে হয়।

সুশান্ত বলে, কিসে মনে হ'ল?

লতা বলে, মেয়েমানুষের চালাকি মেয়েমানুষে যত শীগ্‌গির বুঝতে পারে পুরুষমানুষে অত শীগ্‌গির পারে না···তাছাড়া বিদ্যুৎ সেজে দিদির প্রেমে পড়া আর তার আসন্ন বিয়ের গল্পটা দিয়ে সুলতার মনকে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে বেলা,···কিন্তু আমার সন্দেহ বেড়েছে এই কথা ভেবে যে, সুলতার মন পরিষ্কারের কাজটা বোধ হয় একটু বেশী তাড়াতাড়ি করা হয়ে গেছে সেদিন। প্রথম দিন না করে, কাজটা আরও একটু ধীরে-সুস্থে করতে পারলে অন্য লোকের পক্ষে সন্দেহ করা অত সোজা হ'ত না।

সুশান্ত হেসে বলে, কিন্তু তোমার সন্দেহ তো ভুলও হতে পারে? এমন তো হতে পারে যে ও সত্যিই বেলার যমজ বোন বিদ্যুৎ?

লতা বলে, হতে পারে তা, কিন্তু আমার মনে হয় তা নয়···আমার মনে হয় ও নিশ্চয়ই বেলা। তারপর আবার চোখ বোজে লতা। বলে,

কিন্তু হলেই বা বেলা···কি করবে তোমার? পৃথিবীকে যেমন বাসুকি আছেন মাথায় করে, তেমনি করে তোমায় মাথায় করে আছে সুলতা··· এখানে কেউ পারবে না কিছু করতে। দেখো তুমি আমার কথা সত্যি হয় কিনা।···

মনো আজ দু'তিন দিন হ'ল বউবাজারে নিজের ছোটকাকী আর রাঙাকাকীর বাড়ী বেড়াতে গেছে। আগামী কাল সরস্বতী পূজো। ছোটকাকী, সুশান্ত আর সুলতাকে সরস্বতী পূজোতে নেমতন্ন করে পাঠিয়েছেন তাঁদের বাড়ীতে। বলে পাঠিয়েছেন, সেই আগেকার দিনের মত এক সঙ্গে অঞ্জলি দেবেন, সুশান্ত, সুলতা যেন অতি অবশ্য আসে সেদিন।

সুশান্ত, মনোর ছোটকাকী, রাঙাকাকী, এঁরা তো সব সেই অনেকদিন আগে ছোট ছোট ভাইবোনের মত একসঙ্গে কাটিয়েছিলেন এক বাড়ীতে, বৎসর বৎসর সরস্বতী পূজোতে কত অঞ্জলি দিয়েছেন সবাই একসঙ্গে। পুরোনো দিনের সেই স্মৃতিই আবার নতুন করে টেনেছে ছোটকাকীকে।

ছোটকাকীর বাড়ীতে দু'জন মহাপুরুষের বাস। দু'জনেই বেঁটে, দু'জনেই ডাকসাইটে জোচ্চোর। যে এক নম্বর জোচ্চোর, সে দু'নম্বরের চেয়েও বেঁটে, তার ওপর আবার তার একটা চোখ একটু ছোট। অতবড় জোচ্চোর মানুষের ইতিহাসে আর কখনও জন্মগ্রহণ করেছে কিনা, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রচুর সন্দেহ প্রকাশ করেন। মনোর পিতৃকুলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, অগ্রদ্বীপের উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে ওর জন্ম। পিতার নাম ৺কালিদাস ওরফে গোলকনাথ মুখোপাধ্যায়···অথচ জোচ্চোরটা বলে কি জানেন? বলে, সে ব্যক্ত পিতৃস্বত্ত্ব মানে না, গোলকনাথের পুত্র বললে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। বলে, সূক্ষ্মদেহের সঙ্কর্ষণে সে ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের দ্বিতীয় পুত্র, এবং অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ করার পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে তারই ন্যায়সঙ্গত অধিকার। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ নাকি তার প্রাপ্য সিংহাসন অন্যায়ভাবে অধিকার করেছেন।

নিজের নাম ভাঁড়ায় এমন জোচ্চোর আরও আছে, কিন্তু বাপের

নাম পর্য্যন্ত ভাঁড়ায় এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। খুব বেঁটে লোক, মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসীর মত শাদা লুঙ্গি পরে থাকে, পেছন দিকে টাক-পড়া। মাথাটা ঠিক পিতামহ সপ্তম্ এডওয়ার্ডের মত দেখতে—একথা কেউ বললে একেবারে একগাল হেসে ফেলে। তাছাড়া স্থূক্ষ্মদেহে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সেদিন রাশিয়ায় গিয়ে প্রচুর "ভড্কা" পান করে এসেছিল; সবাই বল্লে খুব নাকি গন্ধ বেরুচ্ছিল তার মুখ থেকে। পাড়ার গোপাল সেদিন বলছিল, জু-বাগানে সেদিন সে নাকি দেখেছে যে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপের মাথায় ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, এক নম্বর জোচ্চোর শ্রীকৃষ্ণের মত বংশীবাদন করছে। তার আসল নাম প্রণব কুমার, কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলির বংশধর বলে সে নিজেই নিজের নামকরণ করেছে George borner লর্ড গার্লিংটন মালয়া।

এদিকে বিদ্যের জাহাজ। অগ্রদ্বীপে সমবেত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যগণ তাকে উপাধি দিয়ে গেছেন—পি, ও, ডি, কে অর্থাৎ প্যাসিফিক ওস্যান অফ ডিভিনিটিক্যাল নলেজ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশান্ত মহাসাগর। ঐ উপাধি নাকি পৃথিবীতে ইতঃপূর্ব্বে আর কেউ পায়নি।

মৌলিক অর্থাৎ basic ইংরেজী ব্যবহার করে, অর্থাৎ মাস দুই কেউ যদি ওর কাছে ইংরেজী পড়ে, তাহ'লে আর কখনও সে শুদ্ধ ইংরেজী বলতে কিম্বা লিখতে পারবে না। অথচ বিনয়ের অন্ত নেই। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা যায়: I does not know University English, I like dust on the path add mud on the way. অর্থাৎ আমি পথের ধুলো কাদা, I does not belong point of needle land on the universe. অর্থাৎ আমার পৃথিবীতে স্থচ্যগ্র ভূমিও নেই। কেউ তাকে বিরক্ত করলে, বা তার পেছনে লাগলে, ইংরেজীতে ধমক দেয়: don't as like a mad man.

প্রণব কুমার বল্লে খুব রেগে যায়, গোলকনন্দন বল্লে তো একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুনের মত। বলে, প্রণব মুকুজ্যে মরে গেছে, অগ্রদ্বীপে তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেখতে পাবে। অথচ অগ্রদ্বীপে প্রণবকুমারের ছেলে আছে, পুত্রবধূ আছে, অবশ্য স্ত্রী নেই, বছর তিনেক আগে মারা গিয়ে বেঁচে গেছে সে বেচারী।

এতো হ'ল এক নম্বরের কথা। দু'নম্বর জোচ্চোর যে, সে হ'ল মনোর বাবার আর এক পিসতুত ভাই, নাম স্বরেন। বেঁটে, মোটা ভুঁড়িদার চেহারাটা গোদা বাঁদরের মত দেখতে, স্থূল দেহ, স্থূল মন, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, রাক্ষসের মত খেতে পারে, রোজ সন্ধ্যেবেলা সিদ্ধি খেয়ে ব্যোম হয়ে বসে থাকে, ছোটলোকের মত খইনি খেয়ে প্যাচ প্যাচ করে থুথু ফেলছে দিন-রাত্তির। রাত্তির বেলা গরুর মত নাক ডাকায়।

লেখাপড়া শিখেছিল ভাল, তবে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে ফেলেছে। জুয়াখেলে, কেবল ভাবনা কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হবে। পয়সা হাতে পড়লেই কেবল নবাবী, জলের মত হু হু করে পয়সা খরচ করবে। মামার বাড়ী লেখাপড়া শিখেছিল এবং ভাল লেখাপড়াই শিখেছিল, চাকরি নিলে এতদিনে কত মোটা মাইনে পেত, বিয়ে থা করে ঘর সংসারী হয়ে দশজনের একজন হয়ে দিন কাটতো তার···তা' না করে সে কিনা একেবারে জোচ্চোর হয়ে গেল? যার টাকা পাবে তারই টাকা মেরে দেবে বেমালুম? ছি ছি।···

তবু ওরা ভালোবাসে জোচ্চোরটাকে। জোচ্চোরটাও বোধ হয় ভালোবাসে ওদের, সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে আছে তো সবাই। তারপর মা হারিয়ে মনোর ছোটকাকীই এখন মাতৃস্থানীয়া···তা ছোট-কাকীকে মায়ের মত প্রচুর শ্রদ্ধা-ভক্তি করে জোচ্চোরটা। এক নম্বর ও দু'নম্বর, দু'জনেই খুব ভয় করে ছোটকাকীকে···একবার চোখ টেনে এসে দাঁড়ালেই হ'ল···আর রক্ষে নেই, দু'জনেই ভয়ে কেঁচো হয়ে মুখ নীচু করে বসে থাকবে ছোটকাকীর স্বমুখে।

কুইন মেরী অর্থাৎ পঞ্চম জর্জের পত্নী, লর্ড গার্লিংটনের মা, তিনি তো বোঝেন নি শ্রীকৃষ্ণ অবতার এসেছেন তাঁর গর্ভে, কালোছেলে দেখে দুঃখে কেঁদেকেটে একটা তাম্রপাত্রে তাকে টেমস্ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ভাসতে ভাসতে সেই তাম্রপাত্র শেষ পর্য্যন্ত অগ্রদ্বীপে এসে পৌছয়। সেই রাত্রে অগ্রদ্বীপের কালিদাস ওরফে গোলক মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী হরিভাবিনী স্বপ্ন পান সকালবেলা তাম্রপাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন গঙ্গার ঘাটে। তাঁরা দু'জনে তখন একনম্বরকে জল থেকে তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করেন।

কিন্তু গার্লিংটন কুইন মেরীকেই মা বলে জানে, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে বেতারে কথাবার্তা কয়। সব সময়েই মাতৃচিন্তা, এতো বড় মাতৃভক্ত সন্তান এর আগে কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে কিনা সন্দেহ!

সুশান্ত সুলতা গিয়েছে ছোটকাকীর বাড়ী, গার্লিংটন পূজো করছে। গায়ে পৈতে নেই, ও তো এখন ব্রাহ্মণ নয়, ও এখন ক্রীশ্চান. কৃষ্‌শনিয়ান, অর্থাৎ culturous. সরস্বতীর পূজো হচ্ছে অথচ কুইন মেরীর স্তব করছে: জয় রঘুনন্দন নন্দিনী, মালায়া জননী, কমলাদি প্রসবিনী, নীল নয়নী, শ্বেতবরণী বাকিংহাম নিবাসিনী...কে একজন পেছন থেকে আপত্তি করে বসলো, গায়ে পৈতে নেই, এই ট্যাঁস খৃষ্টানকে কে পূজো করতে দিয়েছে?

আর একজন বল্লে, আবার বলছে, বাকিংহাম নিবাসিনী...সরস্বতী পূজোয় আবার বাকিংহাম নিবাসিনী কি?

ভেতর ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে জোচ্চোরটা। বলে, সরস্বতী বাগ্‌দেবী, তিনি বাকিংহাম্ প্যালেসেই থাকেন।

যে কথাটা তুলেছিল, সে ভেংচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ, থাকেন বাকিংহাম প্যালেসে...বামুনের ছেলে হয়ে যে খৃষ্টানকে বাপ বলে, সে আবার কি জানবে?

এই লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। পূজো ছেড়ে উঠে পড়লো গার্লিংটন। দাঁত খিচিয়ে বল্লে, ব্যক্ত পিতৃস্বত্ত্বা নিয়ে টানাটানি করছো কেন? শুধু এই দেহটাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করলে তো চলবে না? তোমরা ম্লেচ্ছ, তোমরা কি বুঝবে?

যুগল বল্লে, দেহটাই. তো সব...তোমার ঘাড়ে বেশ ভালো করে রদ্দা দিলে তবে বুঝবে দেহকে।...

রুখে দাঁড়ায় এক নম্বর, দেখ ভদ্রলোকের মত কথা বলো, কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোককে ঘাড়ে রদ্দা দেবার কথা বলে না।...

পূজোর ঘরে ঢুকলেন ছোটকাকী...ব্যস্ সব চুপচাপ। বল্লেন, পূজোর জোগাড় তো সব কখন ঠিক হয়ে গেছে, এখনও ভট্‌চায্যি মশায়ের দেখা নেই...কেউ যাকনা ভট্‌চায্যি মশাইকে ডাকতে।...

যে ঝগড়া কচ্ছিল গার্লিংটনের সঙ্গে, সে জিজ্ঞেস করলে, তাহ'লে

ভট্টচায্যি মশাই আসবেন? আমরা তো ভাবলুম ঐ খৃষ্টানটাকেই পূজো করতে বলেছেন আপনি।

—না, না। হেসে ফেলেন ছোটকাকী। বলেন, ও নিজের ইচ্ছেয় স্তব করছিল।

দু'নম্বর জোচ্চোরটা আবার গান গায়, বেহালা বাজায়, কবিতা লেখে। দিনরাত্তির জুচ্চুরী করে বেড়ায়, আবার কথায় কথায় গীতার বড়ো বড়ো বুলি শোনায় সবাইকে। বেঁটে লোক কিনা, তাই গেঁটে গেঁটে শয়তানী।...

রাঙাকাকীর বাড়ী গিয়ে মনো তো কেঁদেই আকুল। রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে যেখানে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে, সেইখানে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে একখানা ছবি...তাতে প্রায়ই মালা দেওয়া থাকে।

রাঙাকাকীর ছবি...আজ পাঁচ বচ্ছর হ'তে চল্‌লো এই বাড়ীতেই নিবে গেছে তাঁর জীবন-প্রদীপ। স্নেহে, ভালবাসায়, আত্মত্যাগে জলজ্বল করতো তার সমস্ত শরীর মন। তাঁর অভিমানী মনটাকে অনেকে অনেক সময় ভুল বুঝতো বটে, কিন্তু আজকে আর তারা কেউ ভুল বোঝে না।

শুধু ঐ একখানা মালা দেওয়া ছবি...মনে হয় বিশ্বচরাচরের সমস্ত গতি বুঝি ঐখানে পৌছে গেছে, ঐ শেষ পূর্ণচ্ছেদের সুমুখে। তারপর সমস্ত বাড়ীময় তাল তাল অন্ধকার। এখন বড় ছেলের বউ এসেছে বটে, আবার এসেছে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী, কিন্তু তবু শুধু ঐ ছবিটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে...সেই সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল যে জায়গাটায়, সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেই ঐ যে সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর ছবিখানা।...

ছোটকাকীর পাশের বাড়ীতে একটা ছেলে থাকে, নাম শম্ভু, পাঁচ ছ'বচ্ছর বয়েস। ড্যাবড্যেবে দুটো চোখ, পেটটা এতোখানি, যেখানেই খাওয়াদাওয়ার গন্ধ পায়, সেখানেই ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়। দারুণ অজীর্ণ রোগ, কিছু হজম হয় না পেটে, এক ঐ পেট ছাড়া সমস্ত শরীরটা শুকিয়ে ডিগডিগ কচ্ছে। ওদের নিজের বাড়ীতেও সরস্বতী পূজো—ফল মূল মিষ্টান্নের প্রচুর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু মার

কড়া নজরের জন্মে ওখানে কিছু সুবিধে হবার আশা নেই। তাই একটা হাফ্ প্যান্ট পরে শম্ভু ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে ছোটকাকীর বাড়ীতে।

পূজোর ঘরে নৈবিদ্যির কাছে গিয়ে বসে পড়ছে মাঝে মাঝে। যার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তারই সঙ্গে ভাব করে নিচ্ছে, একটু পরে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে একটাই কথা…:আপনার বুঝি পেটের অসুখ করেছে? কিচ্ছু ক্ষিদে নেই? কিচ্ছু খাবেন না, বুঝি আজকে?

খাবার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে, আর বলে বেড়াচ্ছে সবাইকে…আমি সকালবেলা অনেক বার্লি খেয়েছি, আর তো কিচ্ছু খাবো না। আপনার বুঝি পেটের অসুখ করেছে? কিচ্ছু খাবেন না বুঝি আজকে?

দুপুর বেলা খিচুড়ী ভোগ হয়েছে, খিচুড়ী, আর অনেক রকমের ভাজাভুজি। সুশান্ত, সুরেন, গার্লিংটন এবং বাড়ীর অন্যান্য পুরুষরা খেতে বসেছে। পরিবেশন করছেন ছোটকাকী, সঙ্গে রয়েছে সুলতা আর মনো।

শম্ভু ঠিক জায়গা করে নিয়েছে ওদের সুমুখে। সুরেনকে জিজ্ঞেস করছে, সুরেন দাদু, তুমি বুঝি আর খেতে পারছো না? পেট ভরে গেছে, আর খাবে না বুঝি?

সুরেন হেসে বলে, না আর খেতে পারছি না।

শম্ভু রান্নাঘরে ঢুকে দেখে এসেছে পায়েস হয়েছে। জিজ্ঞেস করে, পায়েস খাবে না?

সুরেন বলে, আর কিচ্ছু খাবো না।

আনন্দে চক্‌চক্ করে ওঠে শম্ভুর ডাবড্যেবে চোখ দুটো। সুরেনের পাতে ভুক্তাবশিষ্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, খেতে পারবে না তো এ সব খাবার কি হবে? ফেলে দেবে? পায়েসও ফেলে দেবে?

সুরেন বলে, হ্যাঁ, ফেলে দেবো।

শম্ভু বিশ্বাস করে না কথাটা। বলে, যাঃ ফেলে দেবে বৈকি? কক্‌খনো ফেলে দেবে না। তারপর একটু চুপ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে বলে, না ফেলে দিওনা, তার চেয়ে ভিখিরীকে দিয়ে দিও খাবারগুলো···ওরা খেতে পায়না।

আসলে শম্ভুর ইচ্ছে সুরেন বলে, আর খেতে পাচ্ছিনা, খাবারগুলো তোমায় দিয়ে দেবো। কিন্তু আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে ঐ ছোট্ট ছেলেটা কারুর চেয়ে কম নয়। তাছাড়া সুরেন যদি বলতো যে, খাবারগুলো ওকেই দিয়ে দেবে, তাহ'লেও শম্ভু কক্‌খনো খেতনা খাবার। তার যে অসুখ···খাবার খেলে মার কাছে মার খেতে হবে। তাই সুরেন যখন বল্লে না তাকে দেবার কথা, বল্লে, ফেলে দেবে খাবারগুলো, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে শম্ভু বল্‌লে, না ফেলে দিওনা, তার চেয়ে ভিখিরীকে দিয়ে দিও খাবারগুলো···ওরা খেতে পায় না।

বড় করুণ হয়ে উঠেছে শম্ভুর ড্যাবড্যেবে চোখ দুটো।

—কুড়ি—

আধুনিকা হোটেলে পৌছবার পরদিনই অপরাজিতার অনুরোধ মত পাথরের ঠাকুর সতীশ বিজনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। মাণিকতলা অঞ্চলে একটা দীর্ঘ গলির মধ্যে অনেক ঘোরবার পর অনেক চেষ্টায় খুঁজে পাওয়া গেল বাড়ীর নম্বরটা। গলির মধ্যে হলেও বাড়ীটা বেশ বড়ো; দক্ষিণদিকে দোতলার ওপর একটা বড়ো রেলিং দেওয়া বারান্দা, নীচে লোহার সঙ্কুচনী ফটক। সুমুখে তামার চক্‌চকে সাইন বোর্ডে লেখা: বিজন চট্টোপাধ্যায়।

সকালবেলা ন'টা বেজেছে তখন; লোহার ফটকে তখনও ভেতর থেকে তালা বন্ধ। বাড়ীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সতীশ সেই ফটকটাই ঝড় ঝড় করে নাড়তে লাগলো। বিজন বাবু বাড়ী আছেন?—বিজন বাবু?

কিছুক্ষণ ডাকবার পর ফটকের ওদিকে একজন তরুণী এসে দাঁড়ালো—পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ী, ভিজে চুল পিঠের ওপর

এলানো। ভাব দেখে মনে হয় যেন পুজো করছিল, সতীশের ডাকে আসন ছেড়ে উঠে এসেছে।

সুমুখে এসে কথা বলবার আগে হি হি করে খুব হাসতে লাগলো মেয়েটা। হাতে একটা শাদা ফুল ছিল, ফটকের ফাঁক দিয়ে সেটা ফেলে দিলে সতীশের পায়ের কাছে। বল্লে, ঐ ফুলটা নিয়ে যাও··· নারায়ণের ফুল, কপালে ছুঁইয়ে দিও, সব অসুখ সেরে যাবে···তারপর দুলে দুলে ফুলে ফুলে আবার সেই হি হি করে প্রচুর হাসি।···

সতীশ ফুলটা কুড়িয়ে নিয়ে হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করলে, বিজন বাবু বাড়ী আছেন ?

মেয়েটা হাসতে হাসতে বল্লে, অত কি সোজা ব্যাপার ?···পিরিতি, পিরিতি সব জন কহে পিরিতি মুখের কথা ? পাঁচটা আছে দ্রৌপদীর, তাই সামলাতে পারে না, আবার সহদেবের ছোট ভাই ? আবার খানিকটা উচ্ছ্বসিত হাসি, তারপর আবার বল্লে মেয়েটা, পাঁচবচ্ছর একেবারে ছোঁয়নি···তারপর হঠাৎ ছুঁয়ে দিলে ঘেয়ো কুকুরটা··· সেই থেকে ঘায়ে ঘায়ে ভরে গেছে সমস্ত শরীর। তুমি তো সহদেবের ছোটভাই···তোমার নাম কি ?···

এ কি উন্মাদ নাকি ? একি মুস্কিলে পড়লো সতীশ ? আম্‌তা আম্‌তা করে আবার বল্লে সতীশ, আমি বিজন বাবুকে খুঁজছি··· বিজন বাবু বাড়ী আছেন ?

আবার হি হি করে হেসে উঠলো পাগলীটা। বল্লে, রাধা, তোমাদের শ্রীরাধা কি বলেছিল জানো ? বলেছিল : 'তিল ও তুলসী দিয়ে দিনু দেহ অপরূপ, মোর মধু-যৌবন জ্বলে যেন ধুপ গো'··· অনেক বারণ করেছিলুম, অনেক পায়ে ধরেছিলুম, অনেক বলেছিলুম পুজো করতে যাচ্ছি ছুঁওনা ; পাপ হবে, শ্রীকৃষ্ণ রাগ করবেন। তা জোর করলে আমি কি করবো বল ? আমি তো সামান্যা গোয়ালিনী। ···তারপর একটু চুপ করে থেকে সতীশের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল মেয়েটা। দ্রৌপদীকে খুঁজছো ? দ্রৌপদী তো এখানে নেই, হাসপাতালে গেছে। মটর গাড়ীতে ধাক্কা লেগেছে কিনা।···

—আঠারো উনিশ বছরের একটি ছেলে ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এসে তরুণীর হাত ধরে ফেললে···দিদি পুজো ছেড়ে উঠে এলে কেন? চলো পূজো সেরে নেবে···তারপর সতীশের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা বল্লে, আপনি বুঝি বিজন বাবুকে খুঁজছেন?

সতীশ বলে, হ্যাঁ।

—আচ্ছা আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দিদিকে বাড়ীর ভেতর দিয়ে আসি, বলে মেয়েটাকে একরকম টানতে টানতে বাড়ীর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। দিদি কিছুতেই যাবেনা, অনেক টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো। ছেলেটা যত টানছে হাত ধরে, ততই বলছে ···চলে যাবো কিরে? দাঁড়া, সহদেবের ছোটভাই ঐ দেখছিস না, গোঁফ কামিয়ে এসেছে দ্রৌপদীকে বিয়ে করবে বলে?···দাঁড়া ওকে আগে বরণ করে ঘরে তুলি···হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ভাই। দিদি বলতে বলতে যাচ্ছে, গণেশ ঠাকুরকে হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়ে দিস্ কালকেই। চট্‌পটে হ'য়ে উঠবে, তখন আর এমনি হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে হবে না।

অল্পক্ষণ পরে সেই ছেলেটা ফিরে এসে গেট খুলে সতীশকে আহ্বান করে পাশের বৈঠকখানায় বসালে। বেশ সাজানো-গোছানো কায়দাদুরস্ত বৈঠকখানা। সতীশের পাশে একটা চেয়ারে বসে ছেলেটা বল্লে, বিজন বাবু হাসপাতালে আছেন, মোটর অ্যাকসিডেণ্টে খুব বেঁচে গেছেন সেদিন।···

সতীশ ব্যস্ত হয়ে বলে, তাই নাকি? তা এখন কেমন আছেন তিনি? খুব বেশী জখম হয়েছেন কি? প্রাণের কোন ভয় নেই তো?

ছেলেটি মৃদু হেসে বল্লে, না, বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি তাঁর, ভালই আছেন। পাঁচ ছ'দিন পরেই বাড়ী আসবেন। তবে তাঁর সঙ্গে যে মহিলাটি ছিলেন ট্যাক্সিতে, তাঁর অবস্থা খুব খারাপ।

শঙ্কিত হয়ে সতীশ জিজ্ঞেস করে, মহিলাটি কে?

ছেলেটি যেন থতমত খেয়ে যায়। বলে, কি জানি তিনি যে কে সেটা আমি ঠিক জানি না। বোধ হয় তাঁর কোন আত্মীয়া হবেন।

সতীশ ভেতরে ভেতরে বড় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্ত চুপ

করে কি যেন একটু ভেবে নেয়, পরে জিজ্ঞেস করে, বিজন বাবু আপনার কে হন ?

ছেলেটি বলে, ভগ্নীপতি।

—ভগ্নীপতি ? খুব চমকে উঠে সতীশ বলে, বিজন বাবু কি বিবাহিত ?

ছেলেটি বলে, হ্যাঁ, ঐ যে, যিনি গেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা কইছিলেন, উনি আমার দিদি···উনিই বিজন বাবুর স্ত্রী।

ঐ যে ছেলেটি, বিজন বাবু যার ভগ্নীপতি, ওর নাম শিবেশ, ও বি. এ. পড়ে। শিবেশ বলে, হাজারীবাগের অপরাজিতা তো ? ও অপরাজিতার ব্যাপারটা মোটামুটি জানে, বিজনের কাছ থেকেই বেরিয়েছে কথাটা। ওসব বিষয়ে বিজনের তো কোন লজ্জা নেই, এরকম আরও দু'তিনজন ঘরের মেয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করেছে ও, বড়ো মুখ করে সবাইকে বলে বেড়ায় ও সব কথা, বুক বাজিয়ে বাজিয়ে। পয়সা কড়ি প্রচুর আছে, প্রচুর রোজগারও করে ব্যবসা করে। মদ খায় বটে তবে আজকাল মাঝে মাঝে একটু আধটু খায়। আগে রোজই খেতো খুব বেশী বেশী। মাতাল হয়ে এসে দিদিকে মারধোর করতো খুব, বাড়ীতে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতো বাইরে থেকে। ঐরকম মানুষের হাতে পড়েছে বলেই তো দিদির ও রকম অবস্থা, একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে।

সতীশ বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে সব জেনে নিলে বিজনের সম্বন্ধে।

বড় দুঃখ পেলো শিবেশ, মুখ নীচু করে বসে রইলো, যেন সেই অপরাধ করে ফেলেছে অপরাজিতার কাছে। বল্লে, আমি দিদির চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট, কিন্তু আমার সুমুখেই দিদিকে খোলাখুলি সব কথা বলতো জামাই বাবু। বলতো যে, যে শক্তিধর পুরুষ সে কখনো একজন মেয়েমানুষকে নিয়ে ঘর করতে পারে না, তাছাড়া বলতো, সুন্দর সুন্দর অল্পবয়েসের মেয়েমানুষরা তাকে নিজে থেকেই ঘিরে ধরেছে চিরদিন···তার নাকি কারুর ব্যাপারে কোন দোষ নেই।

মোটর অ্যাকসিডেন্টের মহিলাটির কথা উঠলো। সেও নাকি অন্য লোকের স্ত্রী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাকে হোটেলে নিয়ে

গিয়ে খুব মদ খেয়েছিল দু'জনে, তারপর রাত্তিরে ফেরবার সময় ওদের ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারে একটা প্রাইভেট গাড়ী। মহিলাটি সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছেন, মাথায় নাকি চোট লেগেছে। কাল রাত্তির থেকে অবস্থা খুব খারাপ, অক্সিজেন চলছে।

শিবেশের সঙ্গে কথা কইছে সতীশ, আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তার কানে যেন তালা ধরে গেছে, সব কথাগুলো যেন ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে অপরাজিতা বুঝি কথা কইছে শিবেশের জায়গায় বসে। যেন অপরাজিতার কথা শুনচে ও···আচ্ছা সতীশদা; বিজন আমাকে ভয়ানক ভালোবাসে না?

মনে হচ্ছে সে যেন বলছে, নিশ্চয়, নিশ্চয় ভালোবাসে, সে বিষয়ে কি কারুর কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

শিবেশ বল্লে, আমি এক্ষুনি যাবো হাসপাতালে, আপনি যাবেন নাকি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সতীশ যাবে হাসপাতালে, একবার মহাপুরুষকে দেখে আসবে স্বচক্ষে, একবার দেখে আসবে কত ভালোবাসে বিজন অপরাজিতাকে। খুব হাসি পায় সতীশের, ইচ্ছে করে প্রচণ্ড জোরে হা হা করে হেসে ওঠে একবার। ইচ্ছে করে শিবেশের গলাটা খুব জোরে টিপে ধরে; খুব জোরে, যেন আর কখনও বিজনের কথা বলতে না পারে শিবেশ। আরও একটা ইচ্ছে করে সতীশের···ঐ যে সুমুখের দেয়ালটা, ওটার ওপরে নিজের মাথাটা ফাটিয়ে ফেলে এক ঠোকায়। একেবারে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা চাই মাথাটাকে, যেন আর না ফিরে যেতে হয় আধুনিকা হোটেলে, অপরাজিতার সুমুখে। কিন্তু ফাটানো যাবে কি মাথাটা? পাথরের ঠাকুরের মাথা যে, তাকে কি কখনো ফাটানো যায়?

অপরাজিতা বলেছে: আর কেউ না জানুক আমি তো জানি বিজন আমাকে কতখানি ভালোবাসে।···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকে সতীশও জানতে পেরেছে সে কথা; শুধু অপরাজিতা নয়, সতীশও আজ ভাল করে জানে কতখানি ভালোবাসে বিজন। উঃ কতো বড় ভালোবাসা···ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আর নজরে পড়বে না কারুর!···

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটা কেবিন ভাড়া করে আছে বিজন।—তা' বহুবল্লভের চেহারা বটে! যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি গায়ের রঙ, মুখ-চোখও অপূর্ব্ব। তার বিশেষ কিছুই হয়নি, শুধু বাঁ পায়ে একটু চোট লেগেছে এক জায়গায়, একটু জ্বর রয়েছে গায়ে। সতীশ দেখলে পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে, একলাই রয়েছে বিজন বিছ'নায় বসে।

—এই যে সতীশ বাবু যে···আপনি এখানে? হাত তুলে নমস্কার করলে বিজন।···অপরাজিতা এসেছে বুঝি?

সতীশ বলে, হ্যাঁ, কলকাতায় এসেছে অপরাজিতা।···

হেসে ওঠে বিজন···এসেছে তো? দেখুন দিকি, এরকমভাবে পেছুনে লাগলে কতক্ষণ সহ্য করতে পারে মানুষ? এই তো আজই সকালবেলা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে অলকা মারা গেল এই হাসপাতালে। হাজার হোক মরে গেল তো একটা মানুষ, মনটা ডিষ্টারব্‌ড্‌ হয়েছে একটু, তার ওপর আপনি বলছেন আবার অপরাজিতা এসেছে কলকাতায়।···

সতীশের হাতের মুঠোর মধ্যে বজ্রের মত প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি পাকিয়ে উঠলো···পাথরের ঠাকুর আজ মাংসর তুলতুলে ঠাকুর হয়ে গেছে। তবু একটাও কথা কইলে না সতীশ, চুপ করে বসে রইল বিজনের সুমুখের চেয়ারটায়।

বিজন জিজ্ঞেস করলে, কোথায় উঠেছে অপরাজিতা?

সতীশ বলে, আধুনিকা হোটেলে।

আবার হাসলে বিজন···বেশতো, তাকে নিয়ে আসুন এখানে, এরকম বিপদে পড়েছি,- মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, এমন সময় একবার দেখতে আসবেনা? বিশ্বাসঘাতকতা তো সেই করেছে শেষ পর্য্যন্ত···আমি তো ভালোই বেসেছিলুম তাকে। বিপদের দিনে সেই ভালোবাসার কথাটা কি মনে পড়বেনা অপরাজিতার?

সতীশের মাথাটা যেন বন বন করে ঘুরে উঠলো। অপরাজিতাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! তার মানে? ঘর সংসারে লাথি মেরে, কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বিজন বিজন করে পাগলের মত ছুটে এসেছে অপরাজিতা, আর অপরাজিতা করেছে বিশ্বাসঘাতকতা!

নির্লজ্জের মত আবার হাসে বিজন···এক সঙ্গে দু'জন পুরুষকে নিয়ে খেলা করলে তার এই পরিণাম ছাড়া অন্য কি হবে বলুন? সবাই তো বিজন নয়, যে শেষ রক্ষে করবে। কিন্তু আপনার ওর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করাটা উচিৎ হয়নি। সে আমাকে সব কথা জানিয়েছে চিঠিতে। আর তাছাড়া, যা করেছেন সেটাতো ভালোই করেছেন খুব, কিন্তু এখন আবার আমার পেছুনে কেন?

সতীশের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বলে, আমি কি করেছি?

বিজন বলে, কি করেছেন জানেন না? কুমারী অপরাজিতাকে মাতৃত্বের গৌরব দিয়েছেন আপনি···আপনার সন্তান সে ধারণ করে রয়েছে শরীরে!···

সমস্ত পৃথিবীটা খুব জোরে ঘুরে উঠলো সতীশের চোখের সুমুখে। কি বলে এই পিশাচটা?—অপরাজিতা সন্তানবতী?

হঠাৎ অন্তর্মুখী হয়ে গেছে পাথরের ঠাকুরটা, বাক্‌রোধ হয়ে গেল সতীশের। নিদারুণ ক্রোধ, ও অপরাজিতার জন্যে তীব্র মর্ম্মবেদনা এই দু'য়ে তুমুল সংগ্রাম চলছে মনের মধ্যে···নিরীহ গোবেচারীর মত চুপ করে বসে আছে সতীশ।

ঘরে ঢুকলো বিজনের বন্ধু অনিমেষ। যেন তারই বিপদ হয়েছে ভয়ানক রকমের, সুমুখে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিলে অনিমেষ। বল্লে, কি ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেল বল দিকিনি বিজন···অলকা মারা গেল শেষ পর্য্যন্ত! ডান হাতটা নেড়ে বিজন বলে, হ্যাঁ তাইতো হ'য়ে গেল অনিমেষ, অলকা তো মারাই গেল, কিছুতেই বাঁচানো গেলনা তাকে।···তারপর কি যেন একটু ভেবে নেয়, পরে আবার হাতটা নেড়ে বলে, তা আমি কি করবো বলো? অলকাকে তো তুমি জানতে···কি রকম গায়ে-পড়া মেয়ে ছিল সে? আমার কি দোষ বলো?···

চোখ দুটো যেন বেরিয়ে পড়বে অনিমেষের···কি বলছো বিজন, কিচ্ছু দোষ নেই তোমার? তার স্বামীর অমতে, তার অনুপস্থিতিতে, তুমিই তো তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলে মদ খেতে!···

বিজন বাধা দেয়···ওটা হ'ল ব্যাপারটার বহিরূপ···ভেতরকার কথা

হ'ল ঠিক উল্‌টো। অলকাই এমন করে লেগেছিল আমার পেছুনে আদা-জল খেয়ে, তার মনোরঞ্জন করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায়ই ছিলনা। এই অল্পবয়সের সুন্দরী মেয়েগুলোই আমার জীবনের শনি। মরতে আমি ভয় করিনা একটুও, কিন্তু অনিমেষ, ঐ মেয়েগুলোই আমায় একদিন যমের বাড়ী পাঠাবে।

রাগে, ভয়ে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে অনিমেষের। সে সেই আগের কথাটাই আবার জিজ্ঞেস করে বসে : তাহ'লে তুমি বলতে চাও কিচ্ছু দোষ নেই তোমার ?

রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি বিজনের। হাজার হোক অলকা সুন্দরী, তরুণী অলকা, তাকে সারারাত্তির অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল, সেই খবরে মনটা একটু চঞ্চল ছিল বৈকি।···একটা হাই তুলে বিজন বলে, দোষ আবার কিসের ? কারুর অমতে তো আমি কিছু করিনি···আর তাছাড়া ভালোবাসার আলিঙ্গনের মধ্যে মৃত্যু এ ক'জন ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে জোটে ? এ যেন সেই ওথেলোর dying upon a kiss-এর মত··· তারপর আমাদের আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় ট্যাক্সিতে অন্যগাড়ী এসে যে হঠাৎ ধাক্কা মারবে, এটা আমার দোষও নয়, আমার জানাও ছিলনা আগে। একটা ঢোঁক গেলে বিজন। তারপর আবার বলতে থাকে, অলকা মরেছে, সেই সঙ্গে আমার মরারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার জন্যে আমি কি কাউকে দোষ দিচ্ছি ? পরকীয়া প্রেম যে কতবড়ো জিনিস এ তোমরা জানোনা অনিমেষ, তোমাদের ঐ বিয়ে করা একটা পচা মেয়েমানুষ নিয়েই ঝাল ঝোল অম্বল সব কিছু।···

মাথা নাড়ে অনিমেষ। বলে, ছি ছি, কতবড়ো কেলেঙ্কারী হয়ে গেল বলতো ? অলকার স্বামীর কথাটা ভাবো একবার ? তার কি কাউকে আর মুখ দেখাবার জো আছে !

বিজন বেশ সপ্রতিভের মত হাসে। বলে, অন্য কারুর জন্যে মাথা-ঘামানো আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে হানিকর। যে স্বামীর মুখ দেখাবার জো নেই, তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার পরামর্শ দিও। আজ অলকা মারা গেছে তাই, কিন্তু যদি সেরে উঠতো অলকা, তাহ'লে কখনো সে আমার ওপর কোন দোষারোপ করতো না···সে বেঁচে থাকলে আজ

(তার সমাজ, ঘর, স্বামী সব হারিয়ে যেত বটে, চতুর্দ্দিকে জানাজানি হয়ে যাবার দরুন আজ আর সে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারতো না …কিন্তু তাতে কি আসে যায়? পরকীয়া রসের আস্বাদ সে তো পেয়েছিল। প্রাণ ভরে ?…সব গেল বটে, মান-সম্ভ্রম, ঘর-সংসার, তবু বিজনকে পেয়েছিল তো ?…অনিমেষ, ঘরটা কিছু নয়, ঘর ইচ্ছে করলে অনেকবার বাঁধা যায়, জীবনে প্রেমটাই বড়।…)

রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে সতীশের। ইচ্ছে করছে সুমুখের ঐ লোকটার মাথাটা একটা লাথি দিয়ে চূর্ণ করে ফেলে একেবারে। দাঁড়িয়ে উঠলো সতীশ। বল্লে, আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি …অসুস্থ লোকের গায়ে হাত দিইনা আমি। আপনি সুস্থ হোন, পরে একদিন আবার দেখা করবো আপনার সঙ্গে।…

হা হা করে জোরে হেসে উঠলো বিজন। বল্লে, আপনি সাধুপুরুষ, আপনি শুধু কুমারীর গায়েই হাত দেন।…

ওগো পাথরের ঠাকুর, এখনও আসেনি তোমার তাণ্ডবনৃত্যের দিন, এখন আগে দেখ অপরাজিতাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে আগে রক্ষা কর সেই হতভাগী মেয়েটাকে…তারপর…তারপর, একদিন আবার এসো এই পিশাচটার সুমুখে, ত্রিশূল হাতে, সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে। সেদিন ওকে একটুও ক্ষমা কোরোনা।

বিজনের দিকে আগুনের মত একটা দৃষ্টি হেনে সতীশ চুপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রায় সাড়ে বারোটা বাজলো হোটেলে ফিরতে। সকালবেলা অনেক বমি করে নেতিয়ে পড়েছে অপরাজিতা বিছানায় ওপর। ঘুমোবার চেষ্টা করেছে অনেক, একটুও ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে ভেজানো দরজাটার দিকে, কারুর পায়ের শব্দ হলে দম বন্ধ করে শুনছে, ভাবছে এই বুঝি সতীশদা ফিরে এলো বিজনের কাছ থেকে।

বাজার থেকে খানিকটা আচার আর আমসত্ত্ব কিনে নিয়ে এসেছে সতীশ। ঘরে ঢুকেই সে বললে, এই নাও চম্পা রাখো এগুলো। যা বিশ্রী রান্না এই হোটেলের, মুখে দেওয়া যায় না কিছু। তবু আচার-টাচার দিয়ে খেতে পারা যাবে চাট্টি।

অপরাজিতা উঠে টেবিলের ওপর রেখে দিলে জিনিসগুলো। তারপর কথা কইতে পাচ্ছে না অপরাজিতা, অনেক ইতস্ততঃ করে, অনেক দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলে, তোমার ফিরতে দেরি হ'ল যে এত?

চেয়ারে বসে পড়ে সতীশ। বলে, যা লোকের পাল্লায় পড়েছিলুম সেখানে, কিছুতে কি উঠতে দেয়? অতো গল্পসল্প খাওয়াদাওয়া সেরে আসতে দেরি হবে না? তারপর অপরাজিতার আলো-ছায়ায় দোলখাওয়া মুখখানার দিকে তাকিয়ে দোলনাটা হাত দিয়ে থামিয়ে দেয় সতীশ। বলে, চম্পা তুমি ঠিকই ধরেছিলে, বিজন অভিমানই করেছিল তোমার ওপর। প্রথম চিঠিটার তো উত্তর পায়নি তোমার কাছ থেকে, তাই হয়েছিল মস্ত অভিমান; তাই তোমার পরের চিঠিগুলোর একটারও জবাব দেয়নি।

পরমানন্দের এমন অপূর্ব্ব হাসি আর কারুর মুখে ইতঃপূর্ব্বে কখনো দেখেনি সতীশ। এ যেন সে অপরাজিতাই নয়, যেন পরনের ব্লাউজ শাড়ী পর্য্যন্ত সব প্রসন্ন-হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল অপরাজিতা...আর সব কি বল্লে বিজন?

সতীশ হেসে বলে, আর কি বলবে বল? আর কি দূরে থাকা সহ্য হচ্ছে? জিজ্ঞেস করলে, বিয়ের দিন কবে? বল্লুম, এই তো সাতাশে মাঘ ...আর দশদিন আছে। বাবা এখনো দশদিন, ব'লে এমন একটা নিঃশ্বাস টানলে বিজন, যে তুমি থাকলে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতে। তাকে একেবারে পাগল করে দিয়েছ তুমি চম্পা...তুমি শীগ্‌গির করে উদ্ধার না করলে, ছাদনাতলায় আসার আগে ওকে বোধ হয় রাঁচিতেই যেতে হবে!

—যাও তুমি বড় ফাজিল...হি হি করে হেসে ওঠে চম্পা।

সতীশ বলে, সাতাশে বিয়ে, এখান থেকেই হবে। হোটেলের মালিককে বলে আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবো আগে থেকে। বর সেজে, টোপর মাথায় দিয়ে, বিজন এখানেই আসবে সাতাশে রাত্তিরে, কিন্তু তার আগের ক'দিনের সম্বন্ধে একটা সর্ত্ত আছে তার।

জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে অপরাজিতার চোখে, কি সর্ত্ত শুনি?

সতীশ হাসে। বলে, বিজন কি বল্লে জানো? বল্লে, বিয়ের আগের

এই ক'দিন দেখা করবে না তোমার সঙ্গে। অর্থাৎ সে একেবারে আনকোরা বর হয়ে আসতে চায় বিয়ের দিনে, যাকে ইংরেজীতে বলে ব্র্যাণ্ড নিউ। সে বল্লে, তার আগে দেখা করলে বর্ষাকালের পাঁপরের মত পুরোনো বরে নাকি ছাতা ধরে যাবে···তাই বলেছে সেই একেবারে সাতাশেই দেখা করবে এসে, টোপর মাথায় দিয়ে—তার আগে আর দেখা হবেনা দু'জনের।

হাসি যেন বন্যার মত উথলে উঠছে অপরাজিতার সর্ব্বাঙ্গে, এত সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে···সতীশের দেখে আর আশ মিটতে চায় না। সতীশ হাসতে হাসতে আবার বলে, আমি বিজনকে বল্লুম এ সর্ত্তে কি রাজী হবে চম্পা? তারও তো কাঁচা-সর্দ্দির অবস্থা, চোখ মুখ সব ঝামরে পড়ছে একেবারে। আর এক মিনিটও সইতে রাজী নয় চম্পা দশদিন তো দূরের কথা।···

—যাঃ অসভ্য। আবার হি হি করে হেসে ওঠে অপরাজিতা।

সতীশ বলে, তার চেয়ে এক কাজ করো চম্পা, বিয়ের আগের চিঠি লেখা আর বিয়ের পরের চিঠি লেখা, এ-দুটোতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বিয়ে হয়ে গেলে কি বিয়ের আগের দিনের মত করে চিঠি লিখতে পারবে? বিয়ের আগের চিঠিতে নিজস্বতার প্রচুর হুমকি দেওয়া যেতে পারে; তুমি যদি এখন তাকে লেখো যে তুমি তোমার মত পরিবর্ত্তন করেছো, এখন আর তাকে ভালোবাসনা, অতএব তাকে বিয়ে করতে সম্মত নও, তাহ'লে দেখবে কিরকম অবস্থা হবে বিজনের। ঐ চিঠি পেয়েই সর্ত্ত-ফর্ত্ত সব ভুলে গিয়ে এক্ষুনি ছুটে আসবে তোমার কাছে, এসেই একেবারে শ্রীচরণে লট্‌পট্!

কথাটা খুব ভালো লাগে অপরাজিতার। বলে, বেশতো, লিখবো ঐ রকম চিঠি। তুমি দিয়ে আসবে তো নিজে থেকে?

সতীশ ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই নিয়ে যাবো চিঠি, ডাকে পাঠিওনা, ডাকে পাঠালে বিজন বিশ্বাস করবে না কথাটা, ভাববে চালাকি করে লিখেছো তুমি। আমি গিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে গম্ভীর মুখে চিঠিখানা দেবো, পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে খুব সরু সুতো কাটবো খানিকটা, তবে না বাবুর বিশ্বাস হবে?

বিয়ের আর পাঁচদিন বাকী, কেনাকাটা প্রায় সবই সেরে ফেলেছে সতীশ। দু'দিন আগে মজা করবার জন্যে বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে বিজনকে লেখা চিঠিটা, অপরাজিতা দিয়েছে সতীশের হাতে। রোজই জিজ্ঞেস করে, চিঠি দিয়েছো বিজনকে ? আজ দু দিনই সতীশ বলেছে, বিয়ের বাজারপত্তর করবার কাজে এত ব্যস্ত রয়েছে সে, যে বিজনের কাছে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেনি মোটেই। সেদিন সকাল-বেলা কোথায় বেরিয়েছিল সতীশ, ফিরে আসতেই আবার অপরাজিতা জিজ্ঞেস করে, দিয়েছো চিঠিটা বিজনকে ?

একটু যেন ইতস্ততঃ করে সতীশ বলে, বিজনের কাছ থেকেই তো আসছি এক্ষুনি। খুব অসুখ করেছে বিজনের, তাই ভাবলুম ও চিঠি দিয়ে কাজ নেই এখন।

মুখটা কালো হয়ে ওঠে অপরাজিতার। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে, অসুখ করেছে ? কি অসুখ ?

আবার ইতস্ততঃ করে সতীশ। বলে, হ্যাঁ, খুব বাড়াবাড়ি চলছে কাল থেকে, ডাক্তার বলছে খুব নাকি ভয়ের কারণ আছে।

দম বন্ধ করে শোনে অপরাজিতা। সতীশ বলে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এক্ষুনি যাবে—না, ও বেলা ?

অপরাজিতা অস্থির হয়ে বলে, না, না, এক্ষুনি চলো, ও বেলা কি ? যাও, ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো একখানা।

যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লো অপরাজিতা। পরনে একটা দু'দিন আগের ভাঙা আটপৌরে লালপেড়ে শাড়ী, সেই সবে স্নান করে উঠেছে, ভিজে চুল পিঠের ওপর এলানো। আঁচলে বেঁধে সঙ্গে নিয়েছে কালীঘাটের ফুল। বিয়ের ঠিকঠাক হবার পর সতীশের সঙ্গে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছে কালীঘাটের মন্দিরে। সঙ্গে আছে কালীঘাটের ফুল, আর সঙ্গে আছে সেই দু'মাসের ভ্রূণটা।

লোহার ফটকের তালা খুলে দিলে শিবেশ। দু'হাত তুলে নমস্কার করলে অপরাজিতাকে। প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে গেল মেয়েটা, কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, বিজন বাবু কোথায় ? কেমন আছেন তিনি ?

সেই বৈঠকখানায় নিয়ে গেল শিবেশ, সতীশ আর অপরাজিতাকে। ব্যস্ত হয়ে অপরাজিতা বলে, এখানে নিয়ে এলেন কেন? আমাকে বিজনের, বিজনবাবুর কাছে নিয়ে চলুন।

মুখ কালো করে শিবেশ বলে, বসুন, বলছি।...

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে অপরাজিতা।

যেন একটু দ্বিধা করে শিবেশ...একটা ঢোঁক গিলে বলে, বিজনবাবু কাল সকালে হাসপতোলে মারা গেছেন। এ্যাপোপ্লেক্সি হয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি!...

—মারা গেছে? বিজন মারা গেছে? একবার চীৎকার করে উঠলো মেয়েটা, তারপর কি যে হ'ল, চেয়ারের হাতলের ওপর নেতিয়ে পড়ে কেমন যেন গ্যোঁঙাতে লাগলো। কি যে বলছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছেনা, তবে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে অঝোরে। তারপর একবার দাঁড়িয়ে উঠলো অপরাজিতা, দু'পা এগিয়ে গেল গ্যোঙাতে গ্যোঙাতে। তারপর সতীশ ধরে ফেল্লে তাই, তা না হ'লে ধপ করে পড়ে যেত মেঝের ওপর অপরাজিতা।

সতীশ কোলে করে নিয়েছে মাথাটা, শিবেশ এনে দিয়েছে ভেতর থেকে টবে করে জল, আর একটা ছোট মগ। মুখে চোখে জল দিচ্ছে সতীশ।...

—ও আবার কে? সেই যে শিবেশের দিদি বকুলমালা, সেই পাগলী, সে উঁকি মারছে চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে।

—দুয়ের পর তিন, তিনের পর চার, চারের পর পাঁচ; ব্যস্... তারপর পাঁচের পর ছয়ই বল, আর ছাপান্নই বল একই কথা...কেন না এবারে বিয়ে করবে সহদেবের ছোটভাই...ছি ছিঃ, কুকুর, কুকুর, পুরুষজাত কুকুর, সবাইকে যেন শকুন্তলা পেয়েছে। বলেই তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে পাগলীর ধিন ধিন করে কি নাচ আর গান...'ওরে ও কুলমজানী রাই লো, এবার তোমার কাঁচা মাথা কড়মড়িয়ে খাইলো।' ...শিবেশ গেছে বাড়ীর ভেতর, এই তক্কে খুব সুবিধে পেয়েছে পাগলী। হি হি করে আবার হাসলে টেনে টেনে। তারপর বল্লে, বেশ তো, তুই তো সহদেবের ছোটভাই, তুই এবার বিয়ে কর ওকে...হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই

কর; তুই বিয়ে কর শকুন্তলাকে···খুব ভাল হবে দেখিস্···আমি আশীর্ব্বাদ করছি।···

পেছুন থেকে শিবেশ এসে হাত ধরলে, আবার চল্‌লো টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি···যতো টানে শিবেশ, ততই আবোলতাবোল বকছে পাগলীটা: জানিস্ শিবু, মহাদেবের দাড়ি ছিল, গোঁফ ছিল না, ঠিক ছাগলের মত! একদিন নেমতন্ন খেতে যাবেন শিব, দুর্গা এসে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলেন ভাল করে। আদর করে নিজে খুর দিয়ে কামিয়ে দিলেন গোঁফ···দাড়ী রইলো, আর গোঁফ গেল বাপের বাড়ী। তারপর আবার সেই হি হি করে দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাসি।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় আধুনিকা হোটেলে বিছানার ওপর শুয়ে আছে অপরাজিতা, সতীশ বসে আছে তার মাথার কাছে একটা চেয়ারে। অনেক জোর-জবরদস্তি করে এইমাত্র ওকে একটু চা খাইয়েছে সতীশ।

মাঝে মাঝে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে অপরাজিতা। তারপর বড লজ্জার কথা,—মাঝে মাঝে মেয়েমানুষের মত পাথরের ঠাকুরও কাঁদছে ওর সঙ্গে। হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে অপরাজিতা। বলে, সতীশদা এবার আমাকে কি করতে বলো?

কান্নায় জড়িয়ে আসে সতীশের গলা। বলে, আমি কি বলবো, বলো চম্পা? আমি যা বলবো তুমি কি তা করবে?

অপরাজিতা বলে, কি বলবে বলো?···

এঃ একেবারে অপদার্থ ঐ পাথরের ঠাকুরটা, আবার কাঁদছে। অনেক কষ্টে কান্না চেপে বলে, আমি বলছি তুমি বিয়ে করো।

বড় অস্থির হয়ে ওঠে মেয়েটা। বলে, না, না, ছি ছি এ তুমি কি কথা বলছো! আমাদের বিয়ে হয়নি বটে, তবু আমি বিজনেরই স্ত্রী,—আজকে আমি বিজনেরই বিধবা। আবার বিয়ে করবো?···এ তুমি কি কথা বলছো সতীশদা? ও কথা শুনলে আমার ঘেন্না করে!···

সতীশ চুপ করে থাকে। অপরাজিতা বলে, আবার বিয়ে করবো! এ তুমি কি বললে সতীশদা? চম্পাকে কি ভেবেছ তুমি? ও কথা মুখে আনতে পারলে কি করে? ছি ছি!···

সতীশ মুখ নীচু করে নির্ব্বাক হয়ে বসে থাকে···আবার বিয়ে

করবে? কত রাগ করেছে যে চম্পা সতীশের ও কথাতে, সে কি বলে বোঝানো সম্ভব? মানুষের সব কথা শেষ হয়ে যাবে, তবু বোধ হয় রূপ দেওয়া যাবেনা চম্পার রাগকে।

আবার বলে চম্পা, আমার যাই কিছু হয়ে থাকনা কেন, বিজনকে আমি কেমন করে ভুলবো? তার কাছে অবিশ্বাসিনী হব? তার চেয়ে দড়ি জুটবে না একটু গলায় দেবার? তুমি কি আমাকে নষ্ট মেয়ে পেয়েছ নাকি? তারপর রাগ করে চম্পা—যাক্ কারুর কোন পরামর্শ চাইনা আমি; আমি আমার পথ ঠিক করে নিয়েছি। আমি বেঁচে থাকবো না আর, আত্মহত্যা করবো। তুমি তো আমায় ভালোবাস, তুমি শুধু একটু সাহায্য কর আমাকে এ-ব্যাপারে···আবার শুয়ে পড়ে অপরাজিতা বিছানার ওপর, আবার উথলে ওঠে অজস্র ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কান্না।

সতীশের সমস্ত মুখখানা ভীষণ কালো হয়ে গেছে। যে কথাটা সবার চেয়ে ভয করে সে, সেটাই এসে পড়েছে অপরাজিতার মুখে ···ঐ আত্মহত্যা করার কথাটা। ঐ পথ থেকে ফেরাতেই হবে ওকে, না হ'লে সতীশ তো বাঁচবে না। অপরাজিতা না থাকলে সতীশ? না সতীশ কক্‌খনো বাঁচবে না। সতীশ দেখতে পেলে চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবীতে বুঝি এক সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে সব জায়গায়।

অপরাজিতা বলে, আমি আত্মহত্যা করবো, তুমি আমায় একটু বিষ এনে দাও।··

সতীশ বলে, আত্মহত্যা তুমি করতে পারবে না।···

ফোঁস করে ফণা তোলে চম্পা—কেন পারবো না? নিশ্চয় পারবো, একশোবার পারবো···জানো আমার নাম অপরাজিতা?···অবস্থার কাছে কক্‌খনো পরাজয় স্বীকার করবো না আমি!···

সতীশ ঘাড় নাড়ে···না না, তোমার জন্যে বলছিনা; তোমার প্রাণের ওপরে হয়তো তোমার অধিকার আছে, কিন্তু···কিন্তু অন্য একটা প্রাণ আছে তোমার শরীরে, তাকে নষ্ট করার তোমার অধিকার নেই!···

—কি বল্লে? খুব জোরে চীৎকার করে উঠলো অপরাজিতা···তারপর আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়—কে যেন তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

যাক সব জানতে পেরেছে সতীশদা। আবার বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে মেয়েটা।

সতীশ চেয়ারটাকে আরও টেনে নেয় চম্পার কাছে, পিঠে হাত বুলোয় আস্তে আস্তে। কি যেন গলা পর্যন্ত ঠেলে আসছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। অনেক চেষ্টা করে আবার কথা বলে সতীশ···নিষ্ঠুর সত্যকে অস্বীকার কোরোনা চম্পা। শরীরে যাকে ধারণ করে রয়েছ, তাকে হত্যা করার যেমন তোমার অধিকার নেই, তেমনি ওকে কোলে করে সমাজে দাঁড়াবারও জায়গা পাবেনা তুমি।···

আবার ফণা তোলে চম্পা—সমাজকে অস্বীকার কোরবো।···

সতীশ বলে, সে বড় দুর্গম পথ, ভয়ানক কষ্ট পাবে ও-পথে। তাছাড়া তোমার সন্তানকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেনা কখনো। আবার হাত বুলোয় অপরাজিতার পিঠে। বলে চলে, তোমার এ দুঃখের জন্যে সমাজ তো দায়ী নয়—দায়ী তোমার সীমা হারিয়ে ফেলা। যাই হোক, বিশ্বাস করবার সব সময়েই একটা সীমা আছে, সেইটেই ছাড়িয়ে গেছো তুমি। সমাজে তো বিধি-নিষেধ থাকবেই, তা না থাকলে, মানুষকে আবার আগের দিনের পাশবিক জীবনে ফিরে যেতে হয়।

অপরাজিতার পিঠের ওপরে সতীশের হাতটা বারে বারে নেচে নেচে উঠছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দারুণ কান্না কাঁদছে হতভাগী মেয়েটা। ভারী মিষ্টি করে কথা বলে সতীশ : বিজন তো প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসতো, সে বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে হ'ত তোমাদের। কিন্তু তবু যতখানি বিশ্বাস তুমি তাকে করেছিলে ভালোবেসে, ততোখানি বিশ্বাস কোন সমাজেরই মেনে নেবার উপায় নেই। অন্যায় করে বিশ্বাস করা, আর অন্যায় করে অবিশ্বাস করা' এ দুটোই অধর্ম্ম।

অপরাজিতা আবার উঠে বসেছে বিছানার ওপর। ছটফটানি যেন বেড়েই চলেছে ক্রমে ক্রমে। সতীশের একটা হাত ধরে সে জিজ্ঞেস করে, বেশ, তাহ'লে এখন আমি কি করবো বলতে পারো?

সতীশ হাসে। বলে, এবার তুমি কিছু করবেনা, এবারে আমার পালা। আমি তোমায় বিয়ে করবো।

আকাশটা স্বমুখে ভেঙে পড়লেও অত আশ্চর্য্য হ'ত না অপরাজিতা। চমকে উঠে বল্লে, তুমি বিয়ে করবে? সব কথা জেনে-শুনে পারবে ও কাজ করতে?

মাথা নাড়ে সতীশ। বলে, পারবো।

আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদে মেয়েটা—না না, সতীশদা সে আমি পারবো না। তোমার জীবনকে আমি নষ্ট করতে পারবো না। কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায় অপরাজিতার—না না, তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারবো না। আমি বিজনকে ভালোবাসি, আমি তোমায় ভালোবাসি না।···

আবার হাত বুলোয় সতীশ অপরাজিতার পিঠের ওপর। বলে, আমার জীবন হয়তো নষ্ট নাও হতে পারে চম্পা। তাছাড়া যদি নষ্টও হয় তাতেই বা কি? মানুষের সবার চেয়ে বড়ো সম্পদ সম্ভ্রম, জীবনের চেয়েও বড় সে জিনিস। তুমি যদি ভালোবাসার জন্যে তাই বিলিয়ে দিতে পেরে থাকো, আমার ভালোবাসা কি এত দুর্ব্বল, যে আমি তার জন্যে সামান্য এই জীবনটা দিতে পারবো না?···

চম্পা আবার বলে, না না, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারবোনা···আমি তো তোমায় ভালোবাসি না।···

আবার কেঁদে ফেলেছে পাথরের ঠাকুর, একটা ঢোক গিলে বলে—বেশতো চম্পা, কোনদিন ভালোবেসো না। আমি তো ভালোবাসি, তুমি বাসো বা না বাসো তাতে কি এসে যায় আমার? লোকে জানবে আমি তোমায় বিয়ে করেছি, আমি তোমার স্বামী, তোমার সন্তান আমার নামে পরিচয় পাবে সমাজে, এইটুকু হলেই যথেষ্ট। তারপর তোমার জীবন তো নষ্ট হয়ে গেছেই, আমার কথা একটুও ভেবোনা তুমি।

আবার ফণা তোলে চম্পা,—বেশ, প্রতিজ্ঞা করো, আমার ওপর কোন অধিকার থাকবে না তোমার? প্রতিজ্ঞা করো এর পরে তুমি আবার বিয়ে করবে?

সতীশ বলে, তাই প্রতিজ্ঞা করলুম। জোর করে কোনদিন তোমার

ভালোবাসা পাবার চেষ্টা করবো না আমি, এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি···দিব্যি করছি, কোনদিন আমার কোন দাবীই থাকবে না তোমার ওপরে। এর পরে যদি তুমি তাতে সুখী হও, যদি তাই চাও, তাহ'লে তুমি বললেই আমি আবার বিয়ে করবো। তোমার পায়ে পড়ছি চম্পা তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো···এই আবার দিব্যি করছি আমি তোমার গা ছুঁয়ে। শুধু সমাজের চোখেই আমরা স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকবো খেলাঘরের, তোমার ওপর কোন দাবী থাকবে না আমার কোনদিন।···

দু'হাতে সতীশের দুটো হাত জড়িয়ে ধরেছে চম্পা, তারপর কাঁদতে কাঁদতে সকালবেলার মত আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সাতাশে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। ছাতের ওপর ভুবনমোহনের বাড়ীতেই বিয়ে হ'ল···ভুবনমোহনের পরিবারের সকলেই ভারী অমায়িক ও পরোপকারী। বিমলা, ললিতা দুই বোনকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হ'ল, কন্যা সম্প্রদান করলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। তবু বড় দুঃখের বিয়ে, খাওয়া-দাওয়ার বড় রকম কিছু আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি···অতএব এবিয়েতে আপনাদের নেমতন্ন করা গেল না। তা সত্ত্বেও, অপরাজিতা ও সতীশের জন্যে আপনাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।

আর একটা কথা আছে কানে কানে বলবার। বিজন মরেনি, সে একটি বান্ধবীর সঙ্গে পুরী চলে গেছে হাওয়া বদলাতে। ব্যাপারটা সবটাই সতীশ ও শিবেশের কারসাজী। বিজন যে অপরাজিতা ও তার সন্তানকে অস্বীকার করেছে এ কথাটা জানতে পারলে, সতীশের মতে চম্পা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করে ফেলতো। তাই শিবেশের সাহায্য নিয়ে বিজনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে অপরাজিতাকে। অপরাজিতা আত্মহত্যা করলে সতীশ তো বাঁচবেনা কিছুতেই, তাই নিজের গরজেই ঐ সব করেছে সতীশ।

—এককুশ—

সেদিন নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু থেকে সুশান্তকে একখানা চিঠি লিখেছে বিদ্যুৎ। চিঠিটা খুলতেই, খামটার ভেতর থেকে এত ঘন কুয়াশা বেরিয়েছে ধোঁয়ার মত, যে সুশান্তর সমস্ত বাড়ীটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে একেবারে। একঘরে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছে সুশান্ত আর সুলতা, অথচ দু'জন দু'জনের মুখ দেখতে পাচ্ছেনা।

বিদ্যুৎ লিখেছে কাটমণ্ডুতে ও পরে কাশ্মীরে কাজ মেটাতে তার অন্ততঃ মাসখানেক লাগবে, কিন্তু ইতোমধ্যে অর্থাৎ সুশান্তর চিঠি পাবার দু'তিন দিনের মধ্যে, দিদি অর্থাৎ বেলা পৌছবে কলকাতায়, এ্যামেরিকা থেকে লণ্ডন হয়ে। চৌরঙ্গীতে বড় একটা হোটেলে নাববে বেলা, আর কিছুদিন সেখানেই থাকবে। হোটেলের নাম ঠিকানা দিয়ে বিদ্যুৎ বিশেষ করে অনুরোধ করেছে, সুশান্ত যেন নিশ্চয় দিদির সঙ্গে দেখা করে, এবং বৌদির সঙ্গে দিদির পরিচয় করিয়ে দেয়।

সেদিন সকালবেলায় সুলতার শোবার ঘরে যেন নদীর ওপরে মুখোমুখি দু'খানা জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে ঘন কুয়াশার মধ্যে···ভাগ্যে পরস্পরের লাল আলো দেখতে পেয়েছে জাহাজ দু'খানা তাই রক্ষে, তাই দাঁড়িয়ে গেছে তক্ষুনি, তা না হ'লে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হয়ে যেত ওরা। তারপর পাশ কাটিয়ে দু'দিকে চলে গেছে জাহাজ দু'খানা। একজন গেছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে, আর অন্যজনে পৌচেছে ভাঁড়ার ঘরে বঁটির ওপরে বসে কুটনো কুটতে।

ছেলেবেলায় একটা বদ অভ্যেস ছিল সুশান্তর। প্রায়ই বেরাল ডাক ডেকে বন্ধুবান্ধবদের ব্যঙ্গ করতো সে। ব্যাডমিণ্টন বা দাবা খেলছে, বিপক্ষের হার হ'ল খেলায়, অমনি সুশান্ত ম্যাও ম্যাও করে বেরাল ডেকে উঠলো। কিন্তু সে অনেকদিন আগের স্কুল-জীবনের কথা···অথচ মোটরে বসে শ্যামবাজারের দিকে যেতে যেতে সেই পনের ষোল বচ্ছরের সুশান্ত যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো সেদিন। বেলা-

বিদ্যুতের ব্যাপারে সুলতার হার হয়ে গেছে ভেবে ইচ্ছে করলো সেই আগের দিনের মত আবার বেরাল ডাক ডেকে ওঠে। যাক, ভাগ্যে সত্যি সত্যি ডেকে উঠেনি বেরাল ডাক, না হ'লে গাড়ীর মধ্যে তার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবতেন সুশান্তর বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আসল কথা বিদ্যুৎ যে বেলা, সে কথাটার সম্বন্ধে সুশান্তর মনে দোমনা ভাবটা বরাবরই ছিল, অর্থাৎ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এদিকে আমরা দেখেছি সুলতার মনে ও ব্যাপারে কোন দ্বিধা ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছিল বেলা বা বিদ্যুৎ যেই হোক, সেই আশ্চর্য্য মেয়েটার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে! যাকে নিয়ে ব্যাপার সে স্ত্রীলোক বলে, ঐ সবল ব্যক্তিত্বের সুমুখে পুরুষ যে, সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করতে চেয়েছে তার কথাটাকে, আর স্ত্রীলোক যে, তার বেলায় হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো ফল, অর্থাৎ সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

কিন্তু তবু চিঠিটা পড়েই যখন এত ঘন কুয়াশা জমে উঠলো ঘরের মধ্যে যে দু'জন দু'জনের মুখ দেখতে পেলে না, তখন এটা ভালই হয়েছে যে সেই কুয়াশার মধ্যে সুশান্ত একদিক থেকে কোন ব্যঙ্গ করে ওঠেনি। করলে নিশ্চয়ই ভয়ানক রাগ করতো সুলতা।

দু'তিন দিন পরে চৌরঙ্গীর ইলিসিয়াম হোটেলে আইভি রায় নামে বুক্ করা পঁচাত্তর নম্বর ঘরে ঢুকতেই চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বেলা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করলে, এই যে আসুন, আসুন, চিনতে পারেন?

—খুব পারি, বলে প্রতি নমস্কার করে যন্ত্রচালিতের মত সুশান্ত ধপ করে সুমুখের চেয়ারে বসে পড়লো।

একি মুস্কিলে পড়েছে সুশান্ত? এই প্রহেলিকার কি শেষ হবে না কোনদিন? একেবারে একই রকমের চেহারা ঐ বিদ্যুতের আর বেলার, অথচ ওকে জিজ্ঞেস করলে, ও নিশ্চয়ই বলবে ওর নাম বিদ্যুৎ নয়, বেলা। একটা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়েছে সুশান্ত···ঐ চেহারা যার তাকে অবিশ্বাস করবার অবকাশ আছে কি? ও যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে মুখ বুঁজে। সুলতার যত চালাকী সব নিজের ঘরের মধ্যে, সুশান্তর কাছে। না হলে বলুক দিকি সুলতা এই খানে এসে,

সুমুখের ঐ মেয়েটাকে, যে তুমি আর বিদ্যুৎ একই মানুষ? তখন আর মুখ দিয়ে কথা ফুটতে চাইবে না সুলতার।

(আমতা আমতা করে সুশান্ত বলে, আপনি···

মুখের কথা লুফে নিয়ে বেলা বলে, হ্যাঁ আমি এখন আইভি রায়। কিন্তু আসলে আমি বেলা মুখার্জ্জি; সেই যে, যে মেয়েটা একদিন আপনার কাছে জোর করে খাবার খেয়েছিল।

সুশান্ত যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলে, আর বিদ্যুৎ?

বেলা হেসে বলে, বিদ্যুৎ তো আমার যমজ বোন।

শিশুর মত অসহায়ভাবে সুশান্ত বলে, আপনারা দু'জন কি এক নন?)

সেই প্রথম দিনের মত হি হি করে টেনে টেনে হাসে মেয়েটা। বলে, না না. মোটেই এক নই···আমরা দু'জন যমজ বোন। বিদ্যুৎ আমার চেয়ে মাত্র তিন ঘণ্টার ছোট···আমরা দু'জন ঠিক এক রকম দেখতে, এত এক রকম যে আমাদের দু'জনকে নিয়ে বাবা-মারই প্রায় ভুল হয়ে যেত।

কলিং বেলটা টিপে দু'জনের ব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিলে বেলা।

সুশান্ত বলে, আমি চা-টা খেয়ে এসেছি বাড়ী থেকে।

বেলা সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, আচ্ছা শুধু একটু চা খান তাহ'লে।···

সুশান্ত বলে, না, বেশী চা খাইনা আমি।

বেলা চোখ পাকায়। বলে, বেলাকে ষোল আনা অস্বীকার করবেন না অমন করে···তাতে ফল ভালো হবে না কিন্তু।···

এক কাপ চা খেয়েই উঠতে হ'ল সুশান্তকে। ওঠবার সময় বল্লে, আপনার সেই গয়না টাকা এখনো আমার কাছে আছে কিন্তু। বিদ্যুৎকে বলেছিলুম, তাতে সে বলেছিল, আপনি নাকি নির্দেশ দিয়েছেন ওগুলো আপনি আসা পর্য্যন্ত আমার কাছেই থাকবে। এখন তো এসে পড়েছেন আপনি···এইবার কবে ওগুলো দিয়ে যাবো বলুন?···

বেলা বলে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এবার দু'একদিনের মধ্যেই ওগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কাল-পরশুই জানাবো আপনাকে।

সুশান্ত বলে, আমার স্ত্রী সুলতা কাল রাত্তিরে আপনাকে খাবার নেমন্তন্ন করেছে। আমি কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে নিয়ে যাবো আপনাকে।

বেলা খুব প্রফুল্ল হয়ে ওঠে···তাই নাকি? তা বেশতো, কাল সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে গয়নাগাটি পরে বসে থাকবো আমি আপনার জন্যে। কি খাওয়াবেন বৌদি? বলবেন, বিলেত এ্যামেরিকায় সাহেবী-খানা খেয়ে খেয়ে মুখ একেবারে পচে গেছে আমার, কাল যদি একটু ইলিশ মাছের পাতরী আর একটু কুলের অম্বল খাওয়াতে পারেন, তাহ'লে ফেরবার সময় বৌদির সঙ্গে বকুলফুল পাতিয়ে আসবো।

একটু যেন স্বল্পভাষী, হোটেল থেকে বেরিয়ে সুশান্তর মনে হ'ল ঐ কথাটা। বিদ্যুৎ যেমন ছটফটে, খুব কথা কইতে ভালোবাসে, এ যেন ঠিক সে রকম নয়··· সামান্য একটু যেন চাপা চাপা মেঘলা মেঘলা ভাব। কিন্তু তাছাড়া আর কোন পার্থক্য চোখে পড়লো না সুশান্তর। মনে হ'ল, কম কথা বলা ঐ চাপা চাপা ভাবটা তো ইচ্ছে করেও ফুটিয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ হয়তো আগাগোড়া অভিনয়ই করে আসছে ও, বিদ্যুৎ সেজে অভিনয় করেছে, এখন আবার বেলা সেজে অভিনয় করছে। আর তাছাড়া কে জানে হয়তো ওর নাম বেলাও নয়, বিদ্যুৎও নয়। হতো শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে ওর আসল নাম জগদম্বা কিম্বা বিপত্তারিণী।

কি মুস্কিলেই পড়েছে সুশান্ত ঐ অদ্ভুত মেয়েটাকে নিয়ে। ও আর সুলতা হিমসিম খেয়ে গেল একেবারে, এ রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করতে করতে! এমন একটা সর্ব্বজয়ী ভাব আছে ওর মুখের ওপর, যে কোন কথা জোর করে বলাই মুস্কিল। বাবা, স্কুল-জীবনে হেড মাষ্টার মশাইকেও কোন দিন এতো ভয় করেনি সুশান্ত; তাঁকেও কখনো কখনো প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এখানে মুখ বুজে সব কথা মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

আর একটা কথা মনে হ'ল সুশান্তর। মনে হ'ল এক্ষুনি একবার যাওয়া উচিৎ বঙ্কির বাড়ীতে, শিবানন্দের কাছে। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন, বেলা কি ফিরে এসেছে?—বিদ্যুৎ কোথায়?

কিন্তু আবার মনটা দমে গেল এই ভেবে যে, গতবারের মত এবারেও তাঁর কথাতে সমস্যার কোন সমাধান যদি সম্ভবপর না হয়ে ওঠে? অর্থাৎ যদি শিবানন্দ বলেন যে, হ্যাঁ বেলা ফিরে এসেছে, বিদ্যুৎ কাটমণ্ডুতে, তাহ'লে বেলা বিদ্যুৎ দু'জনকেই তো মেনে নিতে হবে? আসলে মনটা ঐ দুটো মেয়েকে কিছুতেই মেনে নিতে চাইছে না... দোমনা হলেও মনটা স্থলতার মত কেবল চাইছে এই কথাটাই জানতে, যে সত্যি সত্যি বেলা বিদ্যুৎ বলে দু'জন কেউ নেই, আসলে ওরা একজনই, হয় বেলা না হয় বিদ্যুৎ।

তবু গাড়ী চালিয়ে বহ্নির বাড়ীতে সোজা চলে গেল সুশান্ত। সেখানে গিয়ে জানলে, বহ্নির বাড়ী যাবার পর দিনই শিবানন্দ বম্বে চলে গেছেন; ফিরে আসতে প্রায় পনেরো দিন দেরি হবে।

গীতার প্রথম কাজ এসে পড়েছে বহ্নির হাতে। এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মেয়েটার কাছে এসেছে, অন্য একজন বেরিয়ে যাওয়া মেয়ের চার পাঁচদিন আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া একটা পরিত্যক্ত পুত্র-সন্তান। গতকাল রতন খুব ভোরে আসছিল বহ্নিদের বাড়ী. ডাষ্টবিনের পাশ থেকে ক্রন্দনরত শিশুকে কোলে করে নিয়ে এসে বহ্নির কোলে তুলে দিয়েছে। সুশান্ত দেখলে ক্ষমা দেবী ও বহ্নি সুমুখের মাদুরের ওপর শুইয়ে ছেলেটাকে পলতে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন। বহ্নি বললে, ছেলেটার নাম প্রসূন।

বহ্নি বলে, জানো শান্তদা, মা তো কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না ছেলেটাকে বাড়ীতে রাখতে। বললেন, কে জানে বাবু কি জাতের ছেলে। আমি বল্লুম, মা ঠাকুর বলেন, মানুষের জাত থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের কোন জাত নেই। প্রাণ যেটা সেটা চিরদিনই পবিত্র, তা' সে মানুষের, পশুপাখীর আর গাছপালার যারই প্রাণ হোক না কেন। ঠাকুর ওকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, ওকে বাঁচিয়ে রাখা, ওকে রক্ষে করাই তো আমাদের ধর্ম্ম।

ও ছেলেটা কার জানেন? চুপ, কেউ যেন না জানতে পারে। বহ্নিরাও কেউ জানেনা। আজকাল কলকাতা শহরে নাইট ক্লাব, ম্যাসাজ ও স্নানাগার কিরকম হু হু করে বেড়ে উঠছে জানেন তো? একজন

বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ষোল বছরের বিধবা মেয়ে কাজ করতো একটা নাইট ক্লাবে, তারই সন্তান ঐ হতভাগাটা। শুধু পেটের দায়েই এই সন্তান সম্ভাবনা···জন্মবার পাঁচ দিন পরেই ফেলে দিতে হয়েছে ছেলেটাকে।

রেখা সেই মেয়েটার নাম···কিছুতে কি ছাড়তে চায় ছেলেটাকে! ধনী আবাঙালী বন্ধুর সাহায্যে প্রসব করবার জন্যে একটা নার্সিং হোমে স্থান পেয়েছিল মেয়েটা। জন্মাবার দিন থেকেই চেষ্টা চলছিল ছেলেটাকে ফেলিয়ে দেবার, শুধু ঐ প্রথমবার মা-হওয়া মেয়েটা কিছুতেই ছাড়তে চায়নি সন্তানকে।

—না না, আজ নয়, আজকের দিনটা থাকতে দাও, বলে রেখা। মুখ নীচু করে কোলের ওপর ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট ছুটোতে চুমু খায়। থাকে থাকে উথলে ওঠে দুর্দ্দম কান্না। দুধ খাওয়াবার সময় বুকের ওপরে ছোট্ট ছোট্ট কচি কচি হাতের স্পর্শ কি একটা অপূর্ব্ব স্পন্দনে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা জাগিয়ে তোলে তার। যতবারই জোর করে কর্ত্তৃপক্ষ, ততবারই আপত্তি তোলে মেয়েটা। বলে, না না, আজকে নয়, আজকে নয়,—আচ্ছা আমি তো বলছি কালকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো, শুধু আজকের দিনটা থাকতে দাও। একবার দু'হাতে ক'রে মুখের কাছে তুলে আবার সেই ছোট ছোট ঠোঁট ছুটোতে চুমু খায় রেখা, চুমু খায় আর বেরালকে আদর করলে সে যেমন গরগর করে শব্দ করে, ঠিক মুখের মধ্যে সেই জাতীয় খুব মৃদু একটা টানা শব্দ করে এই নতুন মা-টা।

ওযে মা, স্বর্গাদপি গরীয়সী! কতো ভালোবাসে ঐ শিশুটাকে ও। ঐ নতুন মার মনের কথাকে ঠিকমত রূপ দেওয়া কি মানুষের সাধ্যি? পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত ভরে গেছে ব্যথার মত টনটনে ভালোবাসা···বিশ্বের আর সমস্ত কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে ঐ একফোঁটা ছেলেটার স্বমুখে। এখন আর কিছু নয়, শুধু ওকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছেটাই রাক্ষুসী ক্ষিদের মত ওর সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

বারে বারে চুমু খায় ওর মুখে। কেউ স্বমুখে না থাকলে, সোনা আমার, ধন আমার, খোকন আমার বলে অস্ফুটে আদর করে, মুখের দিকে অভিভূতের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কেমন হয়েছে চোখ,

মুখ, ঠোঁট, কার মত দেখতে হয়েছে খোকন। দু'দিনেই নাম রেখে ফেলেছে ওর, প্রসূন···শুধু দু'দিনের জন্যে খেলাঘরের নাম রাখা। তবু ওকে প্রসূন বলে ডাকলে কত আনন্দ পায় রেখা।···প্রসূন, প্রসূন, সোনা আমার, খোকন আমার, আমার সাতরাজার ধন মাণিক! ব'লে আদর করে ওকে।

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন অবুঝ ভালোবাসার বান ডেকেছে, যেন সমস্ত শরীর মন গলে গলে দুধ হয়ে বেরোয় বুক দিয়ে···কত অন্ধ ভালোবাসা ঐ খোকনের জন্যে, যত বা তার জন্যে, তত আবার নিজের গরজে। ও দুধ খেয়ে বেঁচে থাকবে বলে দুধের চাপে বুক টনটন করতে থাকে, অনন্ত দুগ্ধ-প্রবাহ বন্যার মত বুকে ছুটে আসে অবিশ্রাম।

—আজকের দিনটা ছেড়ে দাও, আজ থাক···আমি তো বলছি কাল নিয়ে যেও, কাল ছেড়ে দেবো নিশ্চয়! এই কথা ব'লে ব'লে পাঁচদিন কাটিয়েছে রেখা, আর এই ক'দিন ওকে প্রসূন বলে ডেকেছে। পাঁচ-দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় কর্ত্তৃপক্ষ তাগাদা দিচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছো না রেখা, আর দেরি করা ভালো নয়। বিদেয় যখন করতেই হবে, তখন যত শীগ্গির হয় ও আপদকে বিদেয় করে ফেলাই ভালো।

—না না, ও কথা বোলো না···আপদ নয়, ও আপদ নয়, ব'লে আবার মুখের কাছে তুলে ধরে প্রসূনকে। হঠাৎ উথলে ওঠে কান্না··· অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে বলে, কোথায় রেখে আসবে ওকে? ডাষ্টবিনের কাছে? সেখানে শেয়াল কুকুর থাকবে না তো?···

কর্ত্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে উত্তর করে, আরে না না, কলকাতা শহরে শেয়াল কুকুর কি করতে পারে কিছু?

রেখার মুখটা আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—শেষ রাত্তিরে রেখে আসবে তো? সকালবেলায় নিশ্চয়ই কেউ ওকে দেখতে পেয়ে ভালো জায়গায় তুলে নিয়ে যাবে, না? তারপর আদর-যত্ন করে মানুষ করে তুলবে। তারপর একটু থেমে আবার বলে রেখা, আচ্ছা আজকের দিনটা ছেড়ে দাও, কাল নিশ্চয়ই নিয়ে যেও।

কর্ত্তৃপক্ষ ধমক দেয়: না না, রোজ রোজ ও রকম চলবে না। আজ ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।

সেই রাত্তিরেই চারটের সময় ফেলে দিয়ে আসা হ'ল প্রসূনকে। একটা কাগজে বড় বড় হরফে রেখা লিখেছে এর নাম প্রসূন। সেই কাগজটা এঁটে দিয়েছে প্রসূনের জামার তলায় সেফ্‌টিপিন দিয়ে।

অনেক কেঁদেছিলো রেখা, অনেক টানাটানি করেছিলো, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিন আর শোনেনি কোন কথা। মার কোল থেকে তোয়ালে দিয়ে মোড়া অবস্থায় সোজা চলে গিয়েছিল ছেলেটা একটা ডাষ্টবিনের পাশে। তারপর শেষ-রাত্তিরের আকাশের তলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে অবিশ্রাম কাঁদছিল প্রসূন। একটা উট্‌কো কুকুর এসে তাকে একবার শুঁকে চলে গিয়েছিল।

সারাদিন কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে রেখা। বিকেল থেকে দুধের চাপে বুক ভয়ানক টনটন করছে, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সন্ধ্যে-বেলা। তাড়সে জ্বর এসে গেছে মেয়েটার।

—তারপর···তারপর ডাষ্টবিনের পাশে গিয়ে বসেছে রেখা, প্রসূনের পাশে। তাকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিতে যাবে, এমন সময় কে একজন ছোঁ মেরে তুলে নিলে ছেলেটাকে। দু'হাতে করে প্রসূনকে ধরে সেই লোকটা বসেছে রেখার পাশে।

ভয়ঙ্কর চেহারা। অর্দ্ধ-উলঙ্গ পুরুষ, পরনের হাফ-প্যাণ্টটার আধখানা নেই বললেই চলে। কতদিন যে স্নান করেনি লোকটা তার ইয়ত্তা নেই। একমুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ী, বড় বড় রুক্ষ চুল, গায়ে চাপ চাপ ময়লা। চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরের মধ্যে, তবু চাউনি যেন রাত্তিরের অন্ধকারে নতুন ছুরির মত ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলছে।

দাঁত বার করে হাসে লোকটা···ভয়ঙ্কর হাসি। বলে, আমি বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বহারা, ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, দু'দিন খেতে পাইনি পেট ভরে। সমস্ত দেশটা ঘুরে এলুম, কোথাও এতটুকুও খাবার নেই। খেয়ে ফেলি তোর ছেলেকে কড়মড় করে চিবিয়ে ?···

কে যেন গলা টিপে দিয়েছে রেখার···না, না, বলে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে, স্বর ফোটেনা গলা দিয়ে। বসে বসে হাঁপাতে থাকে রেখা।

সর্ব্বহারা রেখার দিকে তাকায় একবার। উঃ, কি ভয়ঙ্কর চাউনি!

তারপর হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে মাটির ওপর ফেলে দিয়েছে রেখাকে। তাকে চেপে ধরে চড় চড় ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে তার বুকের ওপরকার ব্লাউজটা। তারপর সাপের মত জড়িয়ে ধরে প্রস্থনের মতো বুকে মুখ দিয়ে চক্ চক্ করে দুধ খাচ্ছে সর্ব্বহারা। মাঝখানে একবার ধরা-গলায় বলে উঠলো, দু'দিন খেতে পাইনি পেট ভরে!...

অন্ধকার রাত্রি মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করছে...মা, মা, মা। মাতৃস্তন্য পান করছে সর্ব্বহারা। ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছিল একেবারে।

স্বর্গে জয়মঙ্গলার আসন নড়ে ওঠে...জয়া আমার আসন কেন টলে?

জয়া বলে, ঐ যে দুধ খাওয়াচ্ছে রেখা ঐ সর্ব্বহারাকে।...

ঘরে ছিল মোক্ষদা ঝি. গা ঠেলে ঠেলে ডাকছে রেখাকে অনেক রাত্তিরে—দিদিমণি, ও দিদিমণি, অত গোঁ গোঁ করছো কেন গো? ভূতে ধরবে যে অমন করে গোঁ গোঁ করলে!...

* * *

দমদমের কাছে একটা পাটকলের শ্রমিক-সঙ্ঘ। নিমন্ত্রণ পেয়ে বহ্নি গিয়েছে তাদের সভায়। সঙ্গে আছেন রাজীবলোচন আর ক্ষমা দেবী। একজন শ্রমিক বক্তৃতা দিচ্ছে: বিশ্বের সমস্ত আশা ঐ লাল ঝাণ্ডার ওপর। পৃথিবীর অধঃপতিত, পদদলিত, অতি-শোষিত যারা, ক্ষুধিত যারা, নগ্ন যারা ঐ এগিয়ে আসছে তাদের অভিযান। ধনতন্ত্র যতই কেন না চেষ্টা করুক, ঐ সর্ব্বহারাদের কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আজ উড়ছে লাল ঝাণ্ডা, বন্ধুগণ আর অর্দ্ধেকটাও বাকী থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকলে, লাল ঝাণ্ডার ওপর আস্থা থাকলে, কালকেই আমরা সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিতে পারবো। বন্ধুগণ, আসুন আমরা ঐ লাল ঝাণ্ডাকে লাল সেলাম করি!...

* * *

মুনোর ছুটি ফুরিয়ে আসছে। সেই অঘ্রাণ মাসের শেষাশেষি এসেছে, প্রায় তিন মাস কেটে গেল সুকাকা ও সুকাকীমার কাছে। এইবার ঘন ঘন তাগাদা আসছে শ্বশুর বাড়ী থেকে। ও যে বাড়ীর বড়

বৌ ও বেশীদিন দূরে থাকলে ওদের চলবে কেমন করে? মনোর স্বামী লিখেছে এই মাসের শেষে এসে তাকে নিয়ে যাবে।

বেলা-বিদ্যুতের ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে খুব গুলতুনি চলছে। সুলতা আর মনোর সঙ্গে প্রতিমাও যোগ দিয়েছেন। সব শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন প্রতিমা···বলিস কি বৌ, ও দুটো এক মেয়ে? তবে দু'জন সেজে আসছে কেন ন্যাকামী করতে? ও বোধ হয় তাহ'লে নষ্ট!

সুলতা আর মনো দু'জনেই হাসতে হাসতে প্রতিবাদ করে, না, না, নষ্ট হতে যাবে কেন? নষ্ট নয়, ও খুব ভালো মেয়ে।

সুলতা মনোকে বলেছে, রাত্তিরে নেমন্তন্ন খেতে এলে মনো যদি বেলাকে বিদ্যুৎ বলে প্রমাণ করে দিতে পারে, তাহ'লে সুলতা মনোকে পুরস্কার দেবে।

মনে মনে লোভ জেগেছে মনোর। পুরস্কারের লোভ ততোটা নয়, যতোটা নাকি ছদ্মবেশীকে ধরে ফেলার লোভ। অথচ কেমন করে ধরবে সে? সুলতার সঙ্গে সেই আলোচনা চলছে। যদি সত্যি যমজ বোন হয়, আর চেহারাটা একই রকমের হয় দু'জনের, যদি কিছুতেই সত্যি কথাটা স্বীকার না করতে চায় শেষ পর্য্যন্ত, তাহ'লে ধরে ফেলা কেমন করে সম্ভব? দুটো মেয়ে ঠিক এক রকম দেখার ব্যাপার নিয়ে সেদিন সকালবেলা থেকে ফাগুন মাসের প্রথম দখিনা বাতাসের মত আবার জাগছে মনোর হাসি···একটু একটু হা হা, হি হি চলছে মাঝে মাঝে, হাসতে হাসতে একটু একটু বেঁকে যাচ্ছে শির দাঁড়াটা।

ইলিশ মাছের পাতুরী, কুলের অম্বল রান্না হয়েছে, আরও ক'রকমের খাবার। মনো আর সুলতা ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজকর্ম্ম নিয়ে, মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে দু'জনের। সুলতা বলছে, জানো মনো আসলে দুই নয়, তর্জ্জনী তুলে বলছে, আসলে একজন···হি হি করে মনো হেসে উঠছে বারে বারে। সুশান্ত এক-ফাঁকে ঘরের ভেতরে সুলতাকে ও মনোকে বল্লে, বেলা-বিদ্যুতের ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সুবিধে হয়ে গেল। আর পাওনাদারদের ভয় করবার প্রয়োজন নেই। রাস্তায় দেখা হ'লে যেমন বলবে পাওনাদার—এই যে সুশান্ত বাবু, চোখে

মুখে সপ্রতিভ ভাব ফুটিয়ে-তুলে বলবো, আপনি বুঝি দাদাকে খুঁজছেন? আমার নাম তো সুশান্ত নয়, আমার নাম প্রশান্ত। আমি সুশান্ত বাবুর ছোট যমজ ভাই···আমরা দু'জনে এত একরকম দেখতে যে, আমাদের নিয়ে মা-বাবারই ভুল হ'ত। তা দাদা তো এখানে নেই, তিনি আজ ক'দিন হ'ল এ্যামেরিকা চলে গেছেন, ব্যবসার কাজে। ঐ কথা শুনে পাওনাদারের মুখের ছোট হাঁ-টা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠবে, সে কথাও কইতে পারবেনা, হাঁ-টাও বন্ধ করতে পারবেনা।···এইবার মনোর কাছে এগিয়ে এল প্রবল একটা দমকা হাসির ঝড়. হা হা হা হা, —আবার ঝুঁকে পড়েছে, আবার বেঁকে গেছে শিরদাঁড়াটা।

ফাগুন এসেছে এ-কথাটা খাঁচায় আবদ্ধ পাখী কেমন করে বুঝতে পারে কে জানে? সুলতার কোকিল পাখীটা আজ ক'দিন ধরে ডেকে ডেকে প্রাণ বার করে ফেললে। মাঝে শুক্লপক্ষ গেছে, সারা রাত্তির ডেকেছে পাখীটা। চাঁদের আলোতে, দখিনা বাতাস বইলে কোকিলেরও প্রাণ কেমন করে বুঝি? ভাদ্র আশ্বিন মাসের রাত্তিরে আকাশের তলায় শুয়ে হিমে ভেজার মত, বাড়ীর লোকের সকলকার ঘুমই যেন ভিজে উঠতো, ঐ জ্যোৎস্নাপক্ষের সারা রাত্তির ধরে অশ্রান্ত কুহু কুহু ডাকে। যখনই ঘুম ভেঙেছে কারুর, যখনই পাশ ফিরেছে কেউ, তখনই পাখীর ডাকে আধখানা ছিঁড়ে গেছে ঘুমটা। তখনই মনে হয়েছে গানের সুরে বালিশ বিছানা যেন স্যাঁত স্যাঁত করছে ভিজে।

বেলার নেমন্তন্নের দিন বিকেলবেলাও খুব ডাকছে পাখীটা। সুশান্তর বারে বারে মনে পড়ছে বিদ্যাপতির গান :

'মত্ত কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
উদয় করু শত চন্দা'···

থেকে থেকে কেবল মনে পড়ছে ঐ গণেশজননীর মত দেখতে আশ্চর্য্য মেয়েটাকে, আর বারে বারে জাগছে সেই একটাই প্রশ্ন : ওরা কি একটা মেয়ে, ঐ বেলা-বিদ্যুৎ, নাকি সত্যি সত্যি দু'জন ওরা?

সন্ধ্যেবেলা সুশান্তর সঙ্গে একটা ফিকে হলুদ রঙ-এর শাড়ী পরে বেলা এসে পৌছল সুলতার বাড়ী। বিদ্যুৎ যেদিন এসেছিল সেদিন রাম-পেয়ারে ছিল না, আজ ছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। একটু ফাঁক

পেয়েই সে স্থলতাকে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল,—মাইজী···ওহি আওরাত আগই···ওহি ভ্রষ্টা আওরাত।

স্থশান্ত পরিচয় করিয়ে দিলে সকলের সঙ্গে। সকলেরই চোখে-মুখে একটা চাপা হাসি। স্থরমা নতুন পিচীমার কোলে নিজের স্থান দখল ক'রে নিয়েছে পত্রপাঠ। বলেছে, পিচীমা এতো দিন কোথায় গিয়েছিল? তারপরে আরতো এলে না তুমি?

মনো প্রতি-নমস্কার করতে গিয়ে হা হা করে হেসে ফেললে। বল্লে, সেদিন যিনি এসেছিলেন,—বিদ্যুৎ—তিনি তো এলেন না?

বেলা হেসে বলে,—সে তো এখানে নেই, সে কাটমণ্ডু গেছে।

মনো আবার খানিকটা অসভ্যর মত হেসে বলে, তিনি, মানে বিদ্যুৎ আর আপনি কি এক নন? তারপর আবার সেই হাসি।

সবাই চেপে ধরেছে বেলাকে। স্থশান্ত, স্থলতা, মনো এমনকি প্রতিমা পর্য্যন্ত। সবারই এক কথা··কেন আমাদের সঙ্গে ছলনা করছেন? বলুন না সত্যি কথাটা যে আপনারা একজন? আমরা কি কাউকে বলে দিচ্ছি?

বেলা প্রতিবাদ করে: কি মুস্কিল···মিথ্যে কথাটা কেমন করে বলি বলুন? বিশ্বাস করুন, আমরা দু'বোন, আমি আর বিদ্যুৎ। আমাদের চেহারা নিয়ে এরকম প্রশ্ন আমরা আজীবনই শুনে আসছি।

ব্যস্ ঐ পর্যন্ত···আর কারুর কিছু বলবার নেই। এমনিই মুখের চেহারা ঐ গণেশজননীর যে, ছেলে-বুড়ো যেই হোক তার কথা মেনেই নিতে হবে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু মৃদু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত সম্ভব, কিন্তু সে প্রতিবাদ শুধু মুখেই জাগবে, ভেতর থেকে আসবার কোন কোন উপায় নেই অসম্মতির।

এই যে সকলের অসহায় অবস্থাটা, সেটা সন্ধ্যেবেলা খুব করে জাঁকিয়ে বসেছে মনোর মনে। কাকা, কাকিমা, পিসীমা সবাই থেমে গেলেন; মেনেই নিতে হ'ল বেলার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার এটা? এই অবস্থায় মনো কি করতে পারে? একটা কাজ অবশ্য সব সময়ে সব অবস্থাতেই মনোর পক্ষে করা সম্ভব, সেটা হ'ল হাসা···অতএব সবাই যখন পরাজয় স্বীকার করলে, তখন মনো

করলে হাসি দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা।···হা হা হা হা। আবার জেগে উঠলো ফাগুন মাসের কালবৈশাখীর ঝড়—আবার পিঠটা ঝুঁকে পড়েছে, আবার বেঁকে গেছে শিরদাঁড়াটা।

খাওয়াদাওয়ার আগে মনো, সুলতা বসে আছে বেলার কাছে ঘরের মধ্যে। সুলতা বলে, বিয়েটা কি বিলাতেই সেরে এলে নাকি?

যেন একটু চমকে ওঠে বেলা। বলে, ও বুঝেছি, বিদ্যুৎ মুখপুড়ির কাজ, ওর পেটে তো কিছু থাকে না, ঐ সব কথা বলেছে আপনাদের।

সুলতা বলে, থাকলে দোষ কি? তা, কবে খাচ্ছি বিয়ের নেমন্তন্ন? —কবে হবে বিয়ে?

বেলা ঘাড় নেড়ে বলে, বিয়ে তো হ'য়ে গেছে। তবে নেমন্তন্ন একটা পাওনা আছে বৈকি আপনাদের।

সুলতা বলে, বিয়ের কথা বলছো অথচ ঐ আপনি আপনি ব'লে ভদ্রতা করা বেসুরো লাগছে। বেলা ঠাকুরঝি, সুলতাকে বৌদি বলে ডাকো। বিয়ে হয়ে গেছে বলছো, মাথায় সিঁদুর নেই কেন? ও সব পাট কি নেই তোমাদের বিয়েতে?

বেলা বলে, না, সিঁদুরের পাট নেই, আর শুভদৃষ্টিটা একটু অন্য রকমের; না হলে অন্য সব ব্যাপার মোটামুটি তোমাদের বিয়ের মতই।

সুলতা জিজ্ঞেস করে, শুভদৃষ্টিটা কি রকম শুনি?

বেলা হাসে। বলে, একটু শুধু তফাৎ। তোমাদের যেমন দু'চোখে আমাদের তেমন নয়। আমাদের শুভদৃষ্টি হয় একচোখে।

আরে সর্ব্বনাশ, একচোখে শুভদৃষ্টি! আর কি মনোকে দোষ দেওয়া যায়? এবারে অবশ্য সুলতাও হাসলে, কিন্তু মনোর হাসির শব্দে বাইরের ঘর থেকে সুশান্ত ছুটে এল। প্রতিমাও দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সুশান্ত বল্লে, কি মনো, আবার নতুন কি হ'ল হাসির কথা?

সুরমা ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিলে—বাবা, পিচীমার একচোখে বিয়ে হয়ে গেছে। সকলে হা হা করে হেসে উঠলো। বেলার সমস্ত মুখখানা লজ্জায় রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। একচোখে শুভদৃষ্টির কথা হাসির কথা সন্দেহ নেই, তার ওপরে আবার সুরমার 'পিচীমার একচোখে

বিয়ে হয়ে গেছে', কথাটাতে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো। এবারে আর মনো কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছে না, আবার সেই বেঁকে গিয়ে বেসামাল হাসি হাসছে হা হা করে, আর হাসতে হাসতে হু হু করে জল ঝরছে চোখ দিয়ে। কলতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে, অনেক কষ্টে হাসি চেপে আবার ফিরে এলো ঘরে, বেলার কাছে। তারপর সুলতার দিকে চোখ পড়তেই দেখে সুলতা আঙুল দিয়ে একটা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। সেটা আবার বেলাও দেখতে পেলে। মনো তো আবার প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠলোই সঙ্গে সঙ্গে, বেলা সুলতা প্রতিমা কেউ বাকী পড়ল না। সুলতার বাড়ীতে সেদিন যেন বন্যা এসে পড়েছে হাসির সমুদ্দুর থেকে, বিশ্বসংসার সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওরা সবাই হাসছে, তবে পাখীটা তো আর হাসতে পারে না? মনোর হাসির ওপর তাল দেওয়ার মত থেকে থেকে বাজছে কোকিল পাখীর ডাক।

—কু-কু-কু।···

—বাইশ—

শিবরাত্তিরের দিন বিকেলবেলা সব জায়গাতেই শুকনো শুকনো মুখ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত নির্জ্জলা উপোস; সে তো হেসে ওড়াবার কথা নয়! রস উবে গেছে সব মুখ থেকে। তবে খুব বেশী উবেছে ললিতার দিদি বিমলার মুখ থেকে। মনে হচ্ছে কে যেন ভিজে গামছা-খানাকে প্রাণপণে নিঙড়ে খড়খড়ে করে ফেলেছে রৌদ্দুরে শুকিয়ে। খুব বসে গেছে চোখ দুটো।

বিমলার অম্বলের ধাত, একসঙ্গে বেশী খেলে অম্বল হয়, অথচ পেট খালি হলেও শরীর কেমন করে। তাই দু'খানা করে গুড়ের বাতাসা আর সেই সঙ্গে একটা করে ছোট রসগোল্লা, সকালবেলার দিকে ঘুরছেন-ফিরছেন আর গড়পড়তায় এক ঘণ্টা অন্তর টপ টপ করে মুখে দিয়ে জল খাচ্ছেন। আর যে কাছে আছে তাঁকেই বলছেন, বাবা, এ রাক্ষুসে তেষ্টার যেন আর শেষ হবে না, যত জল খাচ্ছি,

ততই যেন পোড়া তেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রসগোল্লা আর বাতাসার কথাটা বলছেন না মোটেই, কেবল বলছেন জল খাবার কথা।

অমন লোকের কি কখনো শিবরাত্তির করা পোষায়? শুধু জেদা-জেদির ওপরে উপোস করেছেন বিমলা। শিবরাত্তিরের আগের রাত্তিরে ভুবনমোহন কথায় কথায় ললিতাকে বল্লেন, ললিতা এত তো কথা কও, অথচ নিজের কথা তো কই একদিনও বল্লেনা মুখ ফুটে?

ললিতা জিজ্ঞেস করে, নিজের কথা আবার কি?

ভুবনমোহন হেসে বলেন, কই একদিনও তো বল্লে না জামাইবাবু বিয়ে করবো, আর একলা পাচ্ছিনা, এবার বিয়ে দিন। আমরা দেখেছি ললিতা খুব সপ্রতিভ মেয়ে তবু ভুবনমোহনের কথা কানে যেতেই কে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দিলে তার মুখে। ছোট্ট একটা যাঃ, বলে পালিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে, আপনাকে বলে কি হবে জামাইবাবু, বলুন? কিছু করবার হ'লে আপনি আগেই উপায় করতেন। কাল শিবরাত্তিরের উপোস করে শুকনো মুখে শিবের কানে কানেই বলবো বিয়ের কথাটা।

হা হা করে হেসে ওঠেন ভুবনমোহন। বলেন, বেশ, বেশ, তাহ'লে শিবরাত্তির করছো কালকে? আর কে কে করছে? তোমার দিদি নিশ্চয়ই করবে না?

ললিতা হেসে বলে, দিদির আর কি দরকার? এমন সাক্ষাৎ শিবকে পেয়েছে বিয়ের রাত্তিরে।...

আবার হা হা করে হেসে ওঠেন ভুবনমোহন...তা যা বলেছ। কিন্তু ফুটফুটে ছোকরা বরের সঙ্গে আর একটা বিয়ে হবার যদি আশাও থাকতো, তাহ'লেও কখনো শিবরাত্তির করতো না তোমার দিদি। ও কি উপোস করতে পারে? জানো তো ও একঘণ্টা অন্তর একটা করে রসগোল্লা খায়।...

বিমলা বোধ হয় দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফোঁস করে ঘরের মধ্যে ছুটে এলেন। একঘণ্টা অন্তর বাতাসা আর রসগোল্লা খাওয়াটা তো বিটকেল ধরণের খাওয়া, অতএব ঐ সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বললে বিমলার সহ্য হ'ত না, যেন ছ্যাঁকা লাগতো গায়ে।

ফোঁস করে উঠে বিমলা বল্লেন, একঘণ্টা অন্তর খাই বটে আমি, কিন্তু সে আমি লুকিয়েও খাই না, আর ইচ্ছে করেও খাই না। তুমি যেমন দিনরাত্তির ওষুধ খাও শরীরের জন্যে, তেমনি আমার অম্বলের ব্যামোর জন্যে আমাকেও একটু একটু করে খেতে হয়। ভুবনমোহন ব্যাপারটাকে সামলে নেন—আহা রাগ করো কেন? অসুখ আছে বলেই তো খাও, আমি তো সেই কথাই বলছিলুম।

চোখ পাকিয়ে বিমলা বল্লেন, মিথ্যে কথা বোলো না, তুমি ও-কথা কখখনো বলনি! তারপর কোমার বেঁধে আরম্ভ করে দেন বিমলা··· আমি উপোস করতে পারিনা? ছেলেবেলায় বারব্রত উপোস কে করতে পারতো আমার মত? এখনই না হয় ব্যামোয় ধরেছে, এখনই নাকি আমার হাঁ-মুখ বড়, খেয়ে খেয়ে সব শেষ করে দিলুম তোমার, কিন্তু উপোস করতে পারিনা এ কথা অতি বড শত্রুও আমায় বলতে পারবেনা কখনো···আচ্ছা দেখ, কাল আমি শিবরাত্তির করতে পারি কিনা! তারপর সেই যে দুমদুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বিমলা, সেই থেকে মুখখানা এতখানি করে আছেন। সকাল পর্য্যন্ত মুখখানা এতখানি ছিল, কিন্তু উপোস করে যত বেলা বাড়ছে তত রাগ বাড়ছে বটে, কিন্তু এতখানি মুখখানা শুকিয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আসছে।

সকালবেলা নিয়মমত বাতাসা আর রসগোল্লা কিনে এনেছে উমেশ দোকান থেকে, সে তো আর জানতো না যে মা উপোস করবেন শিবরাত্তিরের?

—আমার সঙ্গে ইয়ারকি! ব'লে রাগ করে বিমলা ঠোঙাসুদ্ধ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ছাত থেকে রাস্তার ওপর। যত বেলা বাড়ছে, ভেতরটা শুকিয়ে টা টা করছে যত, ততই রাগ বেড়ে যাচ্ছে তাঁর, আর ততই যে সুমুখে আসছে তাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন: বার ব্রত, উপোস আমাকে শেখাতে এসেছে···মনে ভেবেছে আমার যেন কোন দামই নেই সংসারে!

বিকেলবেলা শরীরটা এলিয়ে পড়েছে একেবারে; একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছেন বিমলা। ভুবনমোহন আর ললিতা পাশে বসে

খোশামোদ করছেন তার। ভুবনমোহন বললেন, আমি আমার দোষ স্বীকার কচ্ছি, ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে—এখন উঠে জল খাও একটু।···

প্রায় কান্না এসে গেছে বিমলার। একটা ঢোঁক গিলে স্বামীর দরখাস্ত না-মঞ্জুর করে দিলেন তিনি। বললেন, জল তো দূরের কথা, তোমরা প্রাণ বার করে ফেললেও একটা ঢোঁকও গিলবো না আমি···আমি সব খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি তোমার, আমার বড়ো খাবার-মুখ, বার-ব্রত-উপোস কিচ্ছু করতে পারিনা—না? আচ্ছা এখন দেখ পারি কি না উপোস করতে, প্রাণ যদি বেরিয়েও যায়, তাহ'লেও জল খাবোনা একফোঁটা! হাঁপাতে লাগলেন বিমলা।

অনেকক্ষণ ধরে শালী ভগ্নীপতি মিলে অনেক অনুনয়-বিনয় সাধ্য-সাধনা করলেন। যত সাধেন ওরা, বিমলার জেদ ততই বেড়ে চলে। শেষে ঘরে গিয়ে ভুবনমোহন ধপ্ করে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কি একটা কথা হ'ল ললিতার সঙ্গে। ললিতা বিমলার কাছে এসে বল্লে, দিদি, জামাইবাবু শিশি হাতে করে বসে আছেন। জল চাইলেন, ওটা কি জিজ্ঞেস করতে বল্লেন, এক্ষুনি বিষ খাবেন!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিমলা মাদুরের ওপর। চীৎকার ক'রে উঠলেন: সে কিরে? বিষ খাবে?—বিষ খাবে কেন?···

ললিতা বলে, বলছেন তুমি তো উপোস করলে মরে যাবে, তাই তোমার আগে জামাইবাবুই মরে যেতে চান।···

বোধ হয় স্বামীর দিক থেকে এই ধরনের একটা চাপাচাপি চাইছিলেন বিমলা মনে মনে। তবু না-হুঁ না-হুঁ করে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলেন। ভুবনমোহন চীৎকার করে ঘর থেকে বললেন, এই আমি খেলুম বিষ! দাঁত-খিঁচিয়ে বিমলা বললেন, ওকে ন্যাকামী করতে বারণ কর্ খুকী।···

ভুবনমোহন যে বিষ খাবেন না এটা যেমন বিমলা নিশ্চয় করে জানতেন, তেমনি এ-কথাও জানতেন যে, জল এবারে তাঁকে খেতেই হবে। শেষ পর্য্যন্ত চাপ দিলেন ললিতার ওপর, বেশ তুইও তাহ'লে জল খা। ললিতা প্রতিবাদ ক'রে বলে, না না, আমি কেন জল খাবো?

আমার তো কষ্ট হচ্ছে না। তাহ'লে আমিও খাবোনা ব'লে বিমলা আবার ধপাস করে শুয়ে পড়লেন মাদুরের ওপর।

অতএব ঘড়িতে যখন বিকেল পাঁচটা বাজছে, তখন ফল, সন্দেশ, রসগোল্লা চা দিয়ে দুই বোনে শিবরাত্তিরের পারণ করলেন। বিমলার সিঁদুরের জোর ছিল, সে-যাত্রা বিষপান করে ভুবনমোহনকে পরলোক গমন করতে হ'ল না।

কিন্তু এখানে একটু ভাববার কথা আছে। এই যে ফাল্গুন মাস পড়েছে, পৃথিবীতে যত ফুল সব ফুটতে আরম্ভ করেছে চুপি চুপি, এই যে এত চাঁদের আলো, কোকিলের ডাক, থেকে থেকে হু হু করে এই যে দখিনার দুরন্ত উচ্ছ্বাস, এর মধ্যে বেচারী ললিতার কথা ভাবে এমন একটা লোকও নেই। মা নেই, বাবা নাই, ভাই নেই, আছেন শুধু নিজের রোগের চিন্তায় অভিভূত ভুবনমোহন, আর বাতিকগ্রস্ত দিদি বিমলা, যিনি ঘোরন-ফেরেন আর একঘণ্টা অন্তর টপ করে একটা রসগোল্লা খান। ষোল সাতেরো বছরের মেয়ের মনের কথা আমি কেমন করে জানবো? তবু ললিতার যে বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এবারে যোগাড়-যন্ত্র করে বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে ফেলার যে প্রয়োজন, একথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়না একবারও। অথচ একের পর এক দিন চলে যায়, কোন দিকে কোন আশার আলো একবারও চোখে পড়ে না। তারপর এই ফাল্গুন মাসে থেকে থেকে কোকিল ডাকছে, জ্যোৎস্না রাত্তিরে কেবল হু হু করে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বইছে একটানা বাতাস, ছাতের ওপর টবের গাছে ফুটেছে দেখতে দেখতে অনেকগুলো ফুল।

পরম নিষ্ঠাভরে ললিতা শিবরাত্তিরের উপোস করেছিল। অথচ দিদির জন্যে আধখানা উপোস করেই জল খেতে হ'ল সেদিন। মনের অতল তলে খুব গোপনে জেগেছে একটু ভয়...যদি রাগ করে থাকেন শিবঠাকুর, তাঁর অভিশাপে এই নিঃসঙ্গ জীবনের মেয়াদটা যদি দীর্ঘতর হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে। মনে মনে গলায় কাপড় জড়িয়ে অনেক মাথা খুঁড়েছে ললিতা শিবঠাকুরের কাছে। বলেছে : ঠাকুর ক্ষমা করো, দোষ নিওনা, জানতো দিদির জন্যে জল খেতে হ'ল, অমনি ক'রে।...

তবু এ হয়তো শুধু আমার অনুমান···ষোল সতেরো বছরের মেয়ের কথা শিবঠাকুরই বলতে পারেন না, আমি কেমন করে বলবো?

তরুণ-তরুণীর ভালোবাসার ওপরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ গাথা রচিত হয়েছে। বৈধ-অবৈধ নিয়ে প্রায়শঃই কোন প্রশ্ন ওঠেনা ও বিষয়ে, ভালোবাসা হলেই হ'ল। তারপর সমাজকে মেনে নিয়ে, সামাজিক বিধি-নিষেধকে অস্বীকার না করে কেউ যদি ভালোবাসতে পারে, তাহ'লে জনসাধারণের পক্ষে সে ভালোবাসাকে মেনে নেওয়া অনেক সহজ হয়ে পড়ে। বিয়ে হলেই মিষ্টান্নকামী ইতরজনের সকলের মনেই একই আশা ও শুভেচ্ছা থাকে, যে ভবিষ্যতে বর-কনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দু'জন দু'জনকে ভালোবাসবে, জীবনে সুখী হবে দু'জনে। তারপরে যদি ভালোবাসার গোড়াপত্তন আগেই হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ ওরা সমাজ মেনে ভালোবাসতে চায়, তাহ'লে তো কথাই নাই, তাহ'লে একেবারে সোনায় সোহাগা। তখন রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখিরী পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ সবাই কোমর বেঁধে বিয়ের কাজে লেগে যাবে···সকলের চোখেমুখে জাগবে হাসি, সব কুলবধূরা একসঙ্গে দলবেঁধে দেবে হুলুধ্বনি।

আধুনিকা হোটেলের সামনে ঐ যে ছোট ডাক্তারখানা, ওখানে বসে ডাক্তার দেবব্রত ঘোষ। এই বছর তিনেক হ'ল এম. বি. পাশ করে বেরিয়েছে। যেমন ফুটফুটে চাঁদের মত চেহারা, তেমনই কায়দা-দুরস্ত চালচলন। পোষাক-পরিচ্ছদে, বিশেষ করে স্যুট পরলে, বেশ একটু আভিজাত্যমূলক নিজস্বতা, অর্থাৎ ষ্টাইল আত্মপ্রকাশ করে। ওদের নিজেদেরই ডাক্তারখানা, পিতৃহীন দেবব্রতর অধ্যয়নকালে ও দোকান দেবব্রতর দাদামশাই ও তাদের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দেখা-শোনা করতেন।

ভুবনমোহনের শ্বশুরবাড়ীর দেশে দেবব্রতদের আদিবাড়ী। সেই সূত্রে হোটেলের রুগীপত্তর সব দেবব্রতই দেখে। ভুবনমোহনের নিজের চিকিৎসা তো তিনি নিজেই করে থাকেন, তবে অন্য কারুর অসুখবিসুখ হ'লে দেবব্রতকেই ডাকা হয় চিকিৎসা করার জন্যে। দেশের সম্পর্কে দেবব্রত বিমলাকে দিদি বলে ডাকে।

প্রায় মাসখানেক আগে ললিতার জ্বরের সঙ্গে বুকে একটু সর্দ্দি

বসার মত হয়েছিল···খুব কাছে বসে সেবারই প্রথম দেবব্রত ললিতাকে ভালো করে পরীক্ষা করে ওষুধ দেয়। এরই মধ্যে বেশ হাতযশ হয়েছে ডাক্তারের··· দিতে না দিতেই ফল পাওয়া যায় ওষুধের। সেই থেকে কিন্তু ললিতার শরীরটা বেশ ভালো হয়ে কিছুতেই সারতে চাইছে না। পাঁচ ছ'দিন অন্তর মনে হয় জ্বর হচ্ছে, কাশিটাও কেমন যেন বেড়ে ওঠে মাঝে মাঝে, পাঁচ ছ'দিন অন্তর দিদিকে বলে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়ে আনায় ললিতা। তারপর যত না চিকিৎসা হয়, তত হয় শুধু হাসা-হাসি আর গল্প। সেই সময়ে কল্-টল্ থাকলে সে-কথা ভুলে যায় ডাক্তার, বসে বসে কেবল গল্পই করে দু'জনে।

এই রকম ক'রে বৈদ্যবেশে প্রেম এসে পড়লো ললিতার রোগ-শয্যায়। এ অবস্থায় রোগ কি সহজে সারতে চায়? বেড়েই চলেছে রোগ, আর বেড়েই চলেছে রোগিণীর কাছে ডাক্তার দেবুর ঘন ঘন যাওয়া-আসা। অবশ্য সমাজ মেনেই চলছে ওরা···বিয়ের ব্যাপারে ললিতাদেরই পালটি ঘর দেবুরা, অতএব ব্যাপারটা খুব সহজ। এখন দু'জনের মত হলেই হ'ল বিয়ে করার···অবশ্য দু'দিকের কর্ত্তৃপক্ষরা এ বিষয়ে মত দেবেন বলেই মনে হয়।

দেবু ডাক্তার কাব্য-টাব্য বোঝে না। সোজাসুজি ভাবতে পারে, বুঝতেও পারে সোজাসুজি। খুব ভালো অঙ্ক জানে, জগতকে ও তার সঙ্গে জগতের সমস্ত কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে ভালোবাসে, এবং শুধু খণ্ড হিসেবেই প্রত্যেক জিনিসকে মর্য্যাদা দেয়। রোগকে ভালো করে দেখতে পাবার আগে রুগীর সমস্ত খণ্ডগুলোকে বেশ ভালো করে উপলব্ধি করে নেয়, এবং প্রায়ই খণ্ডের খাতিরে সমগ্রকে হারিয়ে ফেলে। ললিতার কালো কালো চোখ দুটোর সুমুখে ললিতাকে বলি দিয়ে ফেলেছে দেবু ডাক্তার।

তবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যেমন বুকের কাছে সেবিকা সহধর্ম্মিনীর মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাড়ীর কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করে, দেবু ডাক্তার তেমন নয়। সে এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের মতই সোজা কথা সোজা ভাবেই বলে ফেলে। সেদিন রুগী দেখতে এসে দেবু ডাক্তার ললিতাকে বল্লে, কেমন আছো আজকে? ললিতা হাই

তুলে বললে, কই আর ভালো আছি? শরীরটা ঠিক সেরে উঠছে না তো? দেবু ডাক্তার প্রায়ই তর্জ্জনী উঁচু করে কথা বলে, ভাব-সাব দেখলে মনে হয় যেন সে পৃথিবীর হেডমাষ্টার, বেত উঁচু করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় দেখাচ্ছে। এবারেও তর্জ্জনী খাড়া করে দেবু ডাক্তার বল্লে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে জানো?···ললিতা জিজ্ঞেস করে, কি হচ্ছে?···দেবু বলে, আমাদের মধ্যে প্রেম এসে যাচ্ছে কিন্তু···তারপর উঁচু তর্জ্জনীটা নেড়ে আবার বলে, ওটা টিবির চেয়েও ভীষণ বীজাণু! চোখ দুটো নীচু করে ললিতা বলে, কেমন করে জানলে তুমি? তর্জ্জনীটা উঁচুই থাকে, দেবু বলে, কেমন করে আবার জানবো? তোমার কিচ্ছু অসুখ নেই, তুমি আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছ, আর আমার আসার কোন দরকার নেই তবু তু-করে ডাকলেই আমি ছুটে ছুটে আসছি···এটা কোন রোগের লক্ষণ? এটা বুঝতে কতটুকু সময় লাগে?···

তারপর দেবু ডাক্তার আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। বলে, দেখ ললিতা, তার চেয়ে এসো একটা কাজ করি···এসো প্রতিজ্ঞা করি দু'জনের হাত স্পর্শ করে, যে আজ থেকে আর কখনো তুমিও আমায় ডাকবে না, আর আমিও কখনো আসবোনা তুমি ডাকলে। বলেই খপ করে ললিতার হাতটা তুলে নেয় নিজের হাতের মধ্যে।

ললিতা বলে, প্রতিজ্ঞা করলুম···কিন্তু···

—কিন্তু কি? চমকে উঠে হাত ছেড়ে দেয় দেবু ডাক্তার। আবার তর্জ্জনী উঁচু করে।

ললিতা বলে, কিন্তু আমি তো বুঝছি আমার ভেতর কত অসুখ। সহ্য করতে না পেরে যদি আমি বিষ খেয়ে ফেলি?···

অস্থির হ'য়ে ওঠে দেবু। বলে, বেশ, বিষ খেলে আমি এসে পাকস্থলী থেকে বিষ তুলে দেব পাম্প করে।···

ললিতা বলে, কিন্তু সেই বিষে যদি তোমার নাম লেখা থাকে?

আবার আঙুল তোলে দেবু···আমার নাম লেখা থাকবে? তাহ'লে তো আমায় পুলিসে ধরে ফেলবে তক্ষুনি!

হাসি চেপে ললিতা বলে, তবে?—তবে যে তুমি বলছো, ডাকলেও আসবে না।···

দেবু ডাক্তার সোজা কথা বললেই তো আর হ'ল না? সঙ্গে সঙ্গে সেই সোজা কথাগুলো যদি অন্য একজন বারে বারে জড়িয়ে ফেলে বাঁকা কথার সঙ্গে, তাহ'লে কি মূল্য রইল সোজা কথা বলার?

ললিতা আবার বাঁকায় কথাটা। বলে, দেখ ডাক্তার বাবু, আমি কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝতে পেরেছি। দেবু বলে, কি কথা? ললিতা মৃদু হেসে বলে, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে লভে পড়ে গেছো···ডাক্তারী করতে এসে এ কাজ করা কিন্তু তোমার একেবারেই উচিত হয়নি।···

দেবু মুখ বেঁকিয়ে বলে, লভ্? what is love? ও জিনিসটাই আমি বুঝিনা একেবারে। অতএব আমি কখনো লভে পড়িনি···না, কক্‌খনো নয়, definitely not.

ললিতা বলে, বেশ এসো তাহ'লে আমরা বিয়ে করি।···

আবার দেবু ডাক্তারের আঙুল উঁচু হয়ে গেছে···বিয়ে করবো? যখন লভে পড়িনি, তখন বিয়ে করবো কেন?

ললিতা জিজ্ঞেস করে, তুমি লভে পড়তে চাও নাকি?

দেবু ডাক্তার সোজা উত্তর দিয়ে বসে, না, ও সব আমি চাই না।

ললিতা বলে, তবে এসো আমরা বিয়ে করি···যদি চাও, ভবিষ্যতে লভে পোড়ো বিয়ের পরে।···

দেবু জিজ্ঞেস করে, বিয়ের পরে লভে পড়বো?—কার সঙ্গে?

ললিতা উত্তরে বলে, আমার সঙ্গে।

দেবু আবার অস্থির হয়ে ওঠে: বিয়ের পরে লভে পড়বো যদি, বর্ত্তমান কি দোষ করলে? তাহ'লে এখনই লভে পড়বোনা কেন? কি যে রাবিশ কথা সব্ বলছো তুমি—খুব জোরে হা হা করে হেসে ওঠে দেবু ডাক্তার।

ললিতা কি-একটা বলতে যাচ্ছিল প্রত্যুত্তরে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন ভুবনমোহন···কি ডাক্তার, আজকে কেমন আছে রুগী?

খুব থতমত খেয়ে গেছে দেবু ডাক্তার। আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে ভালোই আছে একরকম, তবে বোধ হয় ম্যালেরিয়ার মত হয়েছে একটু।—পিলেটা···

ভুবনমোহন মুখের কথা লুফে নিয়ে বলেন, পিলেটা চম্‌কে

গেছে বুঝি? লিভারের জায়গায় পিলে, আর পিলের জায়গায় লিভার হয়ে গেছে? ওকি তুমি আঙুল উঁচু করছো কেন?

হি হি করে হেসে ওঠে ললিতা। আঙুলের মত সোজা জবাব দেয় দেবু ডাক্তার। বলে, আজ্ঞে, মানে, লিভার পিলে তো কখনো ডিসপ্লেস্‌ড্‌ হয় না।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভুবনমোহন বলেন, হয় হয়, সে রকম অবস্থায় পড়লে সব ডিসপ্লেস্‌ড্‌ হয়ে যায়। রুগীর রোগটা কি ঠিক করলে, প্রেমাইটিস? আবার হি হি করে হেসে ওঠে ললিতা। দেবু ধাক্কা খেয়ে না বলতে গিয়ে একবার হ্যাঁ বলে, তারপর দু'বার না বলে ফেলে।

যাবার সময় আবার একলা পেয়ে দেবু ডাক্তার ললিতাকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, মনে আছে তো? তুমি ডাকবেও না, আর আমিও ডাকলেও আসবো না।...

ললিতা বলে, বেশ সেই কথাই রইলো। আমি মরে গেলেও আর কখনো তোমাকে ডাকবোনা।...

দেবু চলে যাচ্ছিল, আবার পেছিয়ে এল,—না, না, সে কথা আমি বলিনি।...

বাধা দেয় ললিতা। বলে, হ্যাঁ সেই কথাই বলেছ...মরলেও ডাকবোনা কখনো। এরকম করে অপমান করার তোমার কোন অধিকার নেই...কান্নায় শেষ কথাগুলো জড়িয়ে আসে ললিতার, বালিশে মুখ গুঁজে ফেলে।

মেয়েমানুষকে অবস্থা বিশেষে কাঁদতে দেখলে ভগবান যে ভগবান তিনিও হতভম্ব হয়ে পড়েন, দেবু ডাক্তার তো কোন ছার! নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছে দেবু, ললিতার বিছানার পাশে। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে ললিতা।

অনেক কষ্টে অনেক ঢোঁক গিলে দেবু ডাকে, ললিতা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ললিতা। বলে, দাঁড়িয়ে আছ কেন?—যাও, চলে যাও... আর কখনো এসো না; আর ককৃখনো, মরে গেলেও ডাকবো না তোমাকে।

ডাক্তার যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে জমে গেছে পাথরের মত। কি যে বলবে নিজেই বোঝেনা ; অথচ কিছু না বল্লেও নয়। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, না না, মরে গেলে ডাকবে না কেন ? সে কথা কি আমি বলেছি ?…

চোখ পাকিয়ে ললিতা বলে, মরে গেলে তোমায় ডাকবো কেন ? তখন ডাকবো যারা শ্মশানে নিয়ে যাবে তাদের।…

আঙুল উঁচু করেই দেবু ডাক্তার চলে গেল সেদিন। যাবার সময় চোখ মুখ লাল করে আবার ললিতা বল্লে, আর কক্ষনো এসো না কিন্তু, আমিও ডাকবো না, তুমিও আসবে না।

দেবু ডাক্তারের পরম বন্ধু তার দিদিমণি, অর্থাৎ দিদিমা। দিদিমার সঙ্গে খুব ভাব। এখনো পর্য্যন্ত দিদিমার কাছে না শুলে ঘুম হয় না দেবু ডাক্তারের। রাত্তিরে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেবু : আচ্ছা দিদিমণি, দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করে একদিন তুমি তো একবোতল কেরসিন তেল খেয়েছিলে, আচ্ছা দাদু কিরকম করেছিল তখন ? দিদিমণি হেসে বলেন, সে কথা দাদুকেই জিজ্ঞেস করিস। দু'একটা ঢোঁক গিলে আঙুলটা উঁচু করে দেবু বলে, আচ্ছা দিদিমণি, একটা মেয়ে যদি একটা ছেলের জন্যে বিষ খেয়ে মরে, তাহ'লে সেই ছেলেটার কি করা উচিত ?

দেবুর দিদিমণি কথামালা পর্য্যন্ত পড়েছেন, রসিকাও বটে, তবে কেমন যেন একটু ন্যাকা ন্যাকা ভাব, এবং বুড়ো হয়ে ইদানীং কেমন যেন ভূত ভূত বাই হয়েছে তাঁর। কোন মুস্কিল হলেই ভাবেন ভূতের ব্যাপার। এখন নাত্তির কথা শুনে একদণ্ড তীব্রভাবে দেবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ও তাই বুঝি তোর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, রোগা হয়ে যাচ্ছিস্ ? কম্যুনিষ্ট মেয়ের পাল্লায় পড়েছিস বুঝি ? ওরা শুনি যাকে ধরে তার মাথা না চিবিয়ে কিছুতেই ছাড়ে না।

দেবু প্রতিবাদ করে, তোমার যত সব বাজে কথা।…

দিদিমণি বলেন, তোকে ভূতে পেয়েছে দেবু, ধাপার পেত্নী চড়ে বসেছে তোর ঘাড়ে। তারপর—পেসন্ন, ও পেসন্ন, বলে বুড়ী ঝিকে ডেকে বলেন, কাল সকালে রোজা সাহেবের কাছ থেকে ভূত ছাড়া-

নোর মাদুলি নিয়ে আসিস্ তো; বলিস দেবুকে ধাপার পেত্নীতে পেয়েছে।···

প্রসন্ন অনেক দিনের ঝি, দেবুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, ধাপার পেত্নীর খবর শুনে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে তার। বলে, ও কি অলুক্ষুণে কথা বলছো গো মা, দেবুকে পেত্নীতে পেয়েছে! আচ্ছা কালই আমি নিয়ে আসবো মাদুলি···তা পেত্নী তো ডাক্তারখানায় ধরেছে? ডাক্তারখানার দরজার মাথায় একটা ছেঁড়া জুতো টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর কাল থেকেই···ছেঁড়া জুতো থাকলে কোন ভূত-পেত্নীর বাবার সাধ্যি নেই যে কিছু করে।

দিদিমণি পেসন্নর পরামর্শটা সসম্ভ্রমে গ্রহণ করলেন। বল্লেন, আচ্ছা তুই সকালে মাদুলি আনতে যাস, আর অমনি পথে মেথরের বাড়ী হয়ে যাস, তাকে বলে কালই জুতো টাঙাবার ব্যবস্থা করে ফেলিস। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রসন্ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবু আবার প্রতিবাদ করে, তোমাদের যত সব বাজে কথা, দোকানে আবার ছেঁড়া জুতো টাঙাবে কি? আর তাছাড়া আমাকে পেত্নীতে পেয়েছে এটা আমিই বা কেন মেনে নেবো? আমাকে পেত্নী-টেত্নী কিচ্ছু পায়নি, আমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করবো।···

দিদিমণির বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। খানিকটা অবাক হয়ে থেকে বলেন, কি বলছিস দেবু? তুই ঐ কম্যুনিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করবি!

আঙুল উঁচু করে দেবু বলে, কে বল্লে কম্যুনিষ্ট মেয়ে?

দিদিমণি বলে, দেখ্ আমাকে শেখাস্‌নি, আমি তোর মতন অমন দশটা ছোঁড়াকে গুলে খেয়ে ফেলতে পারি···কম্যুনিষ্ট মেয়ে না হলে কি বিষ খাবার ভয় দেখিয়ে বিয়ের যোগাড় করে?

দেবু বলে, যা জানোনা তা নিয়ে বাজে বোকোনা···কম্যুনিষ্ট মেয়ে নয়, ও ললিতা, আমাদের গ্রামের চণ্ডী বোসের ছোট মেয়ে।···

কপাল কুঁচকে বুঝতে চেষ্টা করেন দিদিমণি···কে? চণ্ডী বোসের মেয়ে, বিম্‌লির বোন?

আঙুল উঁচু ক'রে দেবু বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই, বিমলা দিদির বোন।

প্রসন্ন হাসিতে দিদিমণির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—ও তাই বল্, তা বেশ তো, ওরা তো তোদের পালটী ঘর। তারপর বেশ একটু ন'ড়েচ'ড়ে দিদিমণি বলেন, তা তোদের বুঝি লভ্ হয়েছে? আচ্ছা দেবু লভ্ কেমন করে হয়রে? দেবু হেসে বলে, যেমন তোমার আর দাদুর হয়েছিল।

মুখ ব্যাঁকান দিদিমণি,—মোলো যা, আমাদের আবার লভ্ কবে হ'ল রে? শেষরাত্তিরে বিয়ে হ'ল, আমার তখন দশ বছর বয়েস। চেলীর কাপড় পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ছোটকাকা এসে দুই গাট্টা কপালের ওপর: ওঠ চল্ বিয়ে করবি চল্। তারপর ঘুমুতে ঘুমুতে মুখ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়েছে দাড়ীর ওপর, আঁচল দিয়ে সেই নাল পুঁছে ঢুলতে ঢুলতে কম্‌নে দিয়ে যে বিয়ে হয়ে গেল তাই বুঝতে পারলুম না কিছু, আর তুই কিনা বলছিস লভ্ হয়েছিল!

দিদিমণি দেবুর সঙ্গে ঠিক বন্ধুর মতই খোলাখুলি ভাবে কথা বলেন, তাছাড়া ওঁর স্বভাবটাই ঐ রকম। পেটে কিছু থাকেনা কোনদিন, বলতে বলতে একেবারে শেষটুকু পর্য্যন্ত বলে ফেলেন।

কৌতুক ঘনিয়ে ওঠে দিদিমণির চোখে। আবার বলেন, হ্যাঁরে দেবু, তুই বুঝি বলেছিস ললিতাকে, আমি তোমায় বিয়ে করবো?

দেবু বলে, হ্যাঁ, বলেছি বৈকি...জানো দিদিমণি ও-সব কথা অত শীগ্‌গির বলতে নেই।...এতক্ষণে বুঝতে পারেন দিদিমণি। বলেন, ওঃ তাহ'লে খেলাচ্ছিস বুঝি তাকে?

দেবু জিজ্ঞেস করে—তুমি খেলাওনি কখনো দাদুকে?

দিদিমণির চোখ দুটো গোল হয়ে যায়। আশ্চর্য্য হয়ে বলেন, ওমা, তা দরকার হ'লে খেলাইনি আবার? একবার একনাগাড় সাতদিন সাতরাত্তির সাতবার করে পায়ে ধরেছে তবে কথা কয়েছি। আমরা কি তোদের মত ছিলুম, এত হ্যাংলা যে নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করছিস?

দেবু আবার তর্জ্জনী উঁচু করে বলে, দেখ দিদিমণি, আমি বিয়ে না করলে ললিতা বিষ খাবে, আবার বলছে সেই বিষের শিশিতে নাকি আমার নাম লেখা থাকবে। তাহ'লে আমাকে ফাঁসী থেকে কেউ

বাঁচাতে পারবে না। তারপর অনুনয়ের সুরে আবার বলে দেবু, তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি, ব'লে-ক'য়ে মার মতটা করাও তুমি।···

সকালবেলা ডিস্‌পেন্সারীতে পৌঁছেই দেবু দেখে অম্বর বসে আছে। ললিতার ওপর রাগ করে অম্বর দেশে চলে গিয়েছিল, ভেবেছিল সে না হ'লে হোটেল চলবেনা, অতএব ভুবনমোহন তাকে খোশামোদ করে ডেকে নিয়ে আসবেন। ইচ্ছে ছিল তখন একবার দেখে নেবে ললিতাকে, তখন তাকে কুকুর বলে ডাকার ভালো করে শোধ নিয়ে নেবে অম্বর।

অথচ নিজেই ফিরে এসেছে ন্যাজ নাড়তে নাড়তে। তারপর এসেই দেখে দেবু ডাক্তার খুব জমিয়ে নিয়েছে ললিতার সঙ্গে। এত ঢলাঢলি চলেছে দু'জনের, যে অম্বরের অসহ্য হয়ে উঠেছে একেবারে। তাই বুদ্ধি করে সেদিন গিয়েছে ডাক্তারখানায়, ললিতার সম্বন্ধে লাগানি-ভাঙানি দিয়ে দেবু ডাক্তারের মন বিগড়ে দেবার চেষ্টায়।

আঙুলটা উঁচু হয়েই আছে ডাক্তারের। ডাক্তারখানায় ঢুকেই অম্বরকে বলে, দেবু, ললিতা বিষ খেয়েছে! চমকে ওঠে অম্বর। বলে, বিষ খেয়েছে! ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগজের পুরিয়া বার করে দেবু বলে, যান শীগ্‌গির গিয়ে এইটে আগে খাইয়ে দিন জল দিয়ে, তারপর আমি যাচ্ছি···পুরিয়া হাতে নিয়ে হতভম্বের মত একমিনিট অপেক্ষা করে অম্বর, জামার সব পকেটগুলো হাতড়ে কাগজপত্তরগুলো বার ক'রে দেখে নেয় একবার, তারপর ছুটতে ছুটতে চলে যায় সেখান থেকে।

রান্নাঘরে ললিতা একলা বসে কাপে ক'রে চা ঢালছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অম্বর গিয়ে হাজির···তুমি বিষ খেয়েছো? তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে অম্বর···আমি কি তাই বলেছি?···

কিছু বুঝতে না পেরে ললিতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ···কান্না জড়ানো গলায় অম্বর বলে, বেশ তো আমি না হয় কেউ নই, তা' বলে আমি তো তোমায় বিষ খেতে বলিনি?···যাক্ শীগ্‌গির এই ওষুধটা খেয়ে ফেল।···

ললিতা বলে, কে বল্লে আমি বিষ খেয়েছি?

অম্বর বলে, কে আবার বলবে? যে সব জানে সেই বলেছে···দেবু ডাক্তার তো আজকাল সব জানে, দেবু ডাক্তার বলেছে।···

আসলে সিদ্ধি খেয়ে খুব রাগ দুখ্যু প্রকাশ করে অম্বর গতরাত্রে চিঠি লিখেছিল ললিতাকে। তারপর নেশার ঘোরে কোথায় রেখেছে চিঠিখানা, সকালবেলা খুঁজে পায়নি,…তাই দেবু ডাক্তারের কাছে বিষ খাওয়ার কথা শুনে অম্বর ধরে নিয়েছে বয়-টয় কারুর মারফৎ যোগাড় করে ললিতা পড়েছে চিঠিটা, এবং এত দুখ্যু পেয়েছে যে সহ্য করতে পারেনি, বিষ খেয়ে ফেলেছে।…

স্টম্যাক্-পাম্প ইত্যাদি বিষ তোলার সব সরঞ্জাম এবং রকমারী ইন্‌জেকসন্ নিয়ে সোজা গট গট করে দেবু ডাক্তার, খুব জোরে ছুঁড়ে দেওয়া পাতিনেবুর মত গড়িয়ে এসেছে একেবার জুতোসুদ্ধু রান্নাঘরে। হেসে ফেলেছে দেবু ডাক্তার ‥গুড্ লাক্, বিষ খাওনি তাহ'লে ?…

চা ঢালা ছেড়ে, একটা কথাও না বলে, ললিতা চলে গেল দুম দুম করে শোবার ঘরের দিকে। চোখ মুছে অম্বর চলে গেল দোতালায় অফিস ঘরে। কিন্তু দেবুর কি উপায় আছে ? আবার নেবুর মত গড়িয়ে গড়িয়ে ললিতার পেছুনে পেছুনে গিয়ে ঠিক ঢুকেছে ললিতার ঘরে।

যে পাল্লায় পড়েছ দেবু ডাক্তার, তুমি এখন আর দেবু নও, তুমি এখন পাতিনেবু হয়ে গেছ…ললিতা যদি আর একটু কচলায় না, তাহ'লে আজীবনের মত তেতো অখাদ্য হয়ে যাবে।

ললিতা পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। দেবু ঘরে ঢুকতেই সুমুখ ফিরে দাঁড়ায়। বলে, আবার এলে যে ? আমি তো ডাকতে পাঠাইনি ? আর তাছাড়া কথা ছিল ডাকলেও আসবে না ?

দেবু বলে, অম্বরকে-তো পাঠিয়েছিলে ডাকতে।

দেবুর সুরোদ নেই অথচ ভিরকুটি ঠিক আছে। ওরে দেবু ডাক্তার, দেবাদিদেব যে মহাদেব তিনিও চিৎ হয়ে পড়েছিলেন ঐ মহামায়ার সুমুখে, তাঁর বুকের ওপরে উঠে নেচেছিলেন মহামায়া, ধেই ধেই করে ! ভাল চাস্ তো আমার কথা শোন্, ঐ প্যাণ্ট কোটসুদ্ধু হাত যোড় করে শুয়ে পড়্ মেঝের ওপর ; একেবারে নিসর্ত্ত আত্মসমর্পণ, যাকে ইংরেজীতে বলে unconditional surrender. তাই করে ফেল তুই…ও সব চালাকি করে, নিজের গরজের কথাটা ওরকম করে অপর পক্ষের ঘাড়ের

ওপর চাপাবার চেষ্টা করিসনি মিছিমিছি। ও সব পাকামি চলবে না এখানে, একেবারে প্রাণে মারা পড়ে যাবি শেষ পর্য্যন্ত।

শুনেছি এই গরজের ব্যাপারটা পরস্পর পরস্পরের গায়ে কেবলই ছোঁড়াছুঁড়ি করে প্রেমিক-প্রেমিকারা। বিশেষ করে তো মেয়েরা; ভালোবাসার ব্যাপারে ওরা নিজের গরজটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না, সব সময়েই ভাবটা এমনি, যে আমি একটা মুনি ঋষি প্যাটার্নের অনাসক্ত লোক, ও সব আমি পছন্দই করিনা কোনদিন। এবং সেই পুরুষই মন্ত্রসিদ্ধ যে মেয়েদের ঐ ভানকরা অনাসক্তিকে সত্য বলে মেনে নেবার ভালো করে অভিনয় করতে পারে।···হায় হায়, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরী? তুমি কি পাষাণ, যে কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন বাসনা নেই তোমার মধ্যে? অথচ তোমার জন্যে আমার যে একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা ···এই রকম কথা যেমনি বলতে পেরেছেন কাঁদ কাঁদ সুরে, তখনই দেখবেন অপর পক্ষ একেবারে ঝোলে ভেজা পাঁউরুটির মত নরম হয়ে এসেছে। এখানে প্রকৃতিকে তার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতেই হবে পুরুষের, তা' না হ'লে কোন আশা নেই সিদ্ধির।

দেবু ডাক্তার বোকা, তাই অম্বরকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিল বলে ললিতার গরজ প্রমাণ করতে চাইলে। আর কি রক্ষে আছে? চোখ মুখ লাল করে ললিতা বলে, আমি অম্বরদা'কে পাঠিয়েছিলুম তোমায় ডাকতে?···ব'য়ে গেছে আমার···আমার অত মাথা ব্যথা পড়েনি, যে তোমাকে ডাকতে পাঠাবো···তার আগে গলায় দড়ি জুটবে না একটা? আচ্ছা যাও, আর কোনদিন এসো না···আমি ডাকবোও না, আর তুমিও আসবে না।···

আবার বেরিয়ে যাচ্ছে ললিতা ঘর থেকে। দেবু আমতা আমতা করে বলে, তুমি বিষ খাবে না তো?

ললিতা বলে, সে জন্যে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ব'লে হুম হুম করে আবার ছুটে চলে পাঞ্জাব মেল, শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে।

বাবা···এ যেন ব্যাডমিণ্টন খেলছে ললিতা, দেবু ডাক্তারকে নিয়ে। এক একটা চাপ মারছে, আর ত্রাহি ত্রাহি বলে ডাক ছাড়ছে দেবু

ডাক্তার। অথচ মুরদ নেই, শুধু ভিরকুটি আছে···সাধ করে কি ওরকম অবস্থা হয়েছে ডাক্তার সাহেবের? সোজাসুজি বিলিতি ফ্যাসানে হাত যোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়না ললিতার সুমুখে? তা না আবার ফোঁস ফোঁস কচ্ছে···বিষ নেই, শুধু কুলোপানা চক্কর আছে দেখাবার।

যাক, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে দেবু ডাক্তারের। মেয়েপক্ষের পাকা-দেখা গতকাল শেষ হয়ে গেল। ভুবনমোহন মহানন্দে লেগে গেছেন বিয়ের যোগাড় করতে, দরাজ-হাতে খরচ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। ললিতার নিজের যা আছে তা থেকে অল্পই নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে, বাকী সব খরচ বাপমা-হারা শালীর বিয়েতে ভুবনমোহন নিজে থেকে করবার মনস্থ করেছেন। তা দিতে-থুতে মন্দ হবে না; বরপক্ষকে দেওয়ার ব্যাপারেই অন্ততঃ বারো হাজার টাকা লেগে যাবে, তাছাড়া ঘরখরচ তো আছেই। যা মাগ্‌গিগণ্ডার দিন পড়েছে আজকাল!

সুশোভনের দল কোমর বেঁধে লেগে গেছে। সেই শুধু-মুখে দেড় সের মাংস খানেওলা সমরদা ও তাঁর স্ত্রী নমিতা ছুঁক ছুঁক করে বেড়াচ্ছেন নেমন্তন্নর গন্ধ পেয়ে। সুশোভনের দল সমরদা'দের ভাব-সাব দেখে আপোসের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ওদের নিয়ে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ও ভুবনমোহন মিলে নেমন্তন্নর খাবারের ফর্দ্দ করে ফেলেছেন। আজকাল আর কিছু করবার জো নেই, খেতে গেলে; খাওয়াতে গেলেও পুলিসের ভয়। তবে থানার লোকজন হাতে আছে ভুবনমোহনের এই যা ভরসা।

পাতা, নুন, নেবু, শাকভাজা, পটলভাজা দিয়েই দু'খানা করে সাদা ময়দার লুচী। তারপর রাধাবল্লভী একখানা করে, তারপর দু'খানা করে চপ, দুটো করে কাট্‌লেটের পর পোলাও পড়বে পাতে। মাছের মাথা দিয়ে ডাল, একটা ছ্যাঁচড়া, আলুপটলের ডালনা, ধোঁকার ডালনা, ছানার ডালনা, তারপর দু'রকম মাছ, চিংড়ী মাছের মালাইকারী, মাছের ফ্রাই, মাংস, দু'রকমের চাটনী,···

ইতোমধ্যে আপনাদের নিশ্চয়ই মুখে জল এসে পড়েছে? অত খাবারের কথা শুনলে কলকাতা শহরের ভাঙা টিউবওয়েলগুলোর মুখেই

জল এসে পড়বে ঝরঝর করে, সেখানে আপনি আমি তো কোন ছার! তা' নেমন্তন্ন রইল আপনাদের, মেয়েপুরুষে ঝেঁটিয়ে আসবেন সবাই। আসবেন, আর পকেট ভরে, আঁচলে বেঁধে, নিয়ে আসবেন নবদম্পতীর জন্যে আপনাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্ব্বাদ। উপঢৌকন আনবার প্রয়োজন হবে না, কেন না ঢেঁকুর উঠবে না, অর্থাৎ কারণটা আপনারাও বুঝছেন, আর আমিও বুঝছি। নেমন্তন্নর কথাটা অমনি বলতে হয় বললুম, না হলে দেশসুদ্ধু লোককে সত্যি সত্যি পাত পেতে খাওয়ানো, একি সম্ভব? অর্থাৎ সোজা কথায় বললে এই বলতে হয় যে, আপনাদের নেমন্তন্ন খাবার কল্পনা করতে বলছি। বড় নিষ্ঠুর কথা সন্দেহ নেই, ঠিক খৃষ্টপূর্ব্বর পুরুষ রুগীদের মত বাষট্টি বছরের খৃষ্টপূর্ব্বকে ষোলো বছরের তরুণী ভেবে নেবার মতই কঠিন ও ক্লেশদায়ক, কিন্তু কি করবো বলুন, উপায় নেই। কেন ছেলেমানুষী করছেন? দেশসুদ্ধু সবাইকে সত্যি সত্যি খাওয়াতে হবে এ যে একেবারে আবদেরে গোপালের মত কথা!

দোলের আগের দিন বিয়ে, অতএব রঙ আবীর নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। বরযাত্রীদের একেবারে নাইয়ে দেওয়া হয়েছে রঙ দিয়ে। ললিতাকে আর দেবু ডাক্তারকে রঙে চুবিয়ে দিয়েছেন ভুবনমোহন নিজে। তেল-আবীর মাখিয়ে দিয়েছেন দু'জনের মুখে। হুকুম দিয়েছেন, ঐ অবস্থায় বিয়ে হবে। বলেছেন, দোলের বিয়ে ঠিক দোলের বিয়ের মতই করতে হবে, ও সব রঙটঙ ধুয়ে ফেলা চলবেনা একেবারেই।

সব কাপড়চোপড়ে লাল রঙ, মুখে ঘন করে তেল-আবীর মেখে বর-কনে বসেছে পিঁড়ির ওপর। ভুবনমোহন নিজেও প্রচুর রঙ মেখে সম্প্রদান করতে বসেছেন। ফুলের মালা দিয়ে হাত জড়াবার সময় ভুবনমোহন বল্লেন, ও কি আঙুলটা এখনও উঁচু করে রয়েছ? ঢিলে করো আঙুলটা, মালা জড়াচ্ছি যে হাতে।···

আবীর-মাখা মুখে খুব ধবধবে দাঁত বার করে হি হি করে হেসে ফেল্লে ললিতা।

—তেইশ—

খৃষ্টপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যখন কোন কাজ থাকে না, অর্থাৎ অজস্র সময় থাকে হাতে, ঘরে বসে মনে মনে নাম জপ করেন খৃষ্টপূর্ব্ব: লীলা, লীলা, লীলা। সময় সময় সুমুখে কাগজ থাকলে বসে বসে লীলার নাম লেখেন, এবং এই সেদিন থেকে নামের পরে একটা করে জিজ্ঞাসা চিহ্ন লিখতে আরম্ভ করেছেন। খৃষ্টপূর্ব্বর চোখে পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎটা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা চিহ্নের রূপ ধরে উঠছে। সেদিন বারাসাতে বেড়াতে গিয়ে পাড়াগাঁয়ের বন-জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো ফণিমনশার গাছ বার বার জিজ্ঞাসা নিয়ে চোখ টিপেছে খৃষ্টপূর্ব্বকে। সেদিন ফেরবার সময় এক বাণ্ডিল সিঁদুর কিনে নিয়ে এসেছেন বাজার থেকে, চায়ের একটা প্লেটে নারকোল তেল দিয়ে গুলেছেন সিঁদুর খুব ঘন করে, তারপর আজ থেকে জিজ্ঞাসা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম বলে আয়নার সুমুখে গিয়ে সমস্ত কপাল জুড়ে ঘন করে এঁকেছেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ফুটকিটা ভুরুর মধ্যিখানে এসে পড়েছে।

সমিতিতে দু'জন সদস্য জুটে গেছে পত্রপাঠ। দু'জনেই খৃষ্টপূর্ব্বর মত হতাশ প্রেমিক, অম্বর ও প্রণতি। ওদের চোখেও দুনিয়াটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের রূপ ধারণ করেছে···কিছুই বুঝতে পারলে না বেচারীরা। কত প্রাণপাত করলে দু'জনে ললিতার পেছুনে, তবু যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রয়ে গেল। দু'জনের মনে পরস্পারের জন্যে মমতা জেগেছে ইদানীং, অর্থাৎ সহানুভূতি জেগেছে। রিক্সা উলটে দু'জন আরোহী কাদায় পড়ে গেলে পরস্পরের জন্যে যেমন বেদনা বোধ জন্মায়, অনেকটা সেই রকমের।

কি, কে, কেন, কবে, কোথায়···এই পাঁচটা কথার বীজমন্ত্র। কপালে সিঁদুর দিয়ে প্রতিদিন বড় করে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকতে হবে, আর ঐ পাঁচটা কথার বীজমন্ত্র জপতে হবে। কপালে সিঁদুর এঁকে খৃষ্টপূর্ব্ব বেশ সপ্রতিভের মত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন পথে-ঘাটে, এবং সকলেই

কপালের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে ঐ চিহ্নের সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে অবিশ্রাম। খৃষ্টপূর্ব্ব সকলকে তত্ত্বটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন।

নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নানা রকম চিহ্ন অঙ্কিত করে থাকেন কপালে। কেউ ত্রিশূলের মত, কেউ শুধু ফোঁটা, কেউ নাকে রসকলি ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন সিঁদুর দিয়ে কপালে এঁকে ঘুরে বেড়ায়নি পথে-ঘাটে; অতএব ভিড় জমে যাচ্ছে খৃষ্টপূর্ব্বর আশেপাশে। সবাই কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নটাকে দেখছে, অনেকে জিজ্ঞেসও করে ফেলছে মুখ ফুটে...এতচিহ্ন থাকতে কপালে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কেন মশাই? কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতীক ওটা?

সেদিন বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি বন্ধুকে বোঝাচ্ছেন খৃষ্টপূর্ব্ব...অনেক লোক আশেপাশে সামনে পেছুনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, ব্যাপারটা খুব সোজা। এটা পাঁচ কথার বীজমন্ত্র—কি, কে, কেন, কবে, কোথায়। এই জপ করলেই পরম-ব্রহ্মে পৌঁছে যাওয়া যাবে। জ্ঞানমার্গে তো অবতারবাদ নেই, ওখানে ব্যাপারটা প্রায় নিরীশ্বরবাদের মত। জ্ঞানমার্গের সেই চরম সত্যের প্রতীক হ'ল এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ব'লে, নিজের কপালের দিকে আঙুল দেখান খৃষ্টপূর্ব্ব।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন সুমুখে এসে বলে, এই মন্ত্র পাঁচটা একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন আমাদের।...

একটু যেন অস্থির হয়ে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব। বলেন, এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে? এ তো একেবারে জলের মত সোজা। এই ধরুন না, আমি যদি বলি কি, আপনি কি সোজাসুজি উত্তর দিতে পারবেন? আপনি বলবেন কি কি? বা কিসের কি? বা কি ব্যাপারে কি? তেমনি যদি বলি কে? উত্তর দিন দেখি সোজাসুজি? কিছুতেই পারবেন না। অমনি বলবেন কই কে? বা কোথায় কে? তেমনি বাকী ঐ তিনটে কবে, কেন, কোথায়। স্বাধীনভাবে উত্তর দেওয়া ওর কোনটার বেলাতেই সম্ভব নয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, হেড-অফিস একেবারে

বিগড়ে গেছে, এবং ঐ কথা শুনে অন্য সকলে হো হো করে হাসতে লাগল।

খৃষ্টপূর্ব্ব হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভিড় ক্রমশঃ বেশ বেড়ে উঠছে। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করেন খৃষ্টপূর্ব্ব। বলেন, আচ্ছা আসুন আর একটু এগিয়ে যাই, এবারে এক একটা বীজমন্ত্রের সঙ্গে একটা করে অন্য কথা জুড়ে দিয়ে দেখা যাক্ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় কিনা। আচ্ছা ধরুন, আমি জিজ্ঞেস করলুম কি খান? আপনি বললেন, কলা খাই। আমি বললুম কি কলা? আপনি হয়তো বললেন, মর্ত্তমান কলা। আমি বললুম, কি রকম? আপনি বলবেন, বেশ ভালো। তারপর আমি যদি বলি, খেতে ভালো না দেখাতে ভালো? তখন কথাটা দাঁড়াবে এই যে, যে কলা খাওয়া যায় তা দেখানো যায় না, আর যে কলা দেখানো যায় তা খাওয়া যায় না; অমনি আর আপনি উত্তর দিতে পারবেন না, কলা খেয়ে চুপ করে থাকবেন!···

চতুর্দ্দিকে কম্যুনিষ্টের ভয়। মোড়ের ওপর ভিড় দেখে পুলিসের মাথায় টনক নড়ে উঠলো। একজন সাব-ইনস্পেক্টার ভিড় ঠেলে খৃষ্টপূর্ব্বর কাছে গিয়ে হাজির। খৃষ্টপূর্ব্ব তখন 'কবে'র মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণ করছেন।—কবে আসবে? কাল আসবো···কাল কেন? আজ নয় বোলে ···আজ নয় কেন? কাল বোলে···দেখছেন তো কোন কথাটারই উত্তর দেওয়া যাচ্ছেনা, কানামাছির খেলা চলেছে। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ লীলার কথা মনে পড়ে যায় খৃষ্টপূর্ব্বর, আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসে একটা গভীর ভাবসমাধি। একেবারে নিশ্চল হয়ে গেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব···যেন জমে পাথর হয়ে গেছেন বউবাজারের মোড়ে। আবার সুরু হয়েছে সেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বারে বারে ঘাড় নাড়া। একে মাথায় সিঁদুরের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, তার ওপরে অকারণে কাউকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে দাঁত মুখ খিঁচোতে দেখলে মরা মানুষ যে সেও হেসে ফেলবে। খুব হাসি-টিপ্পনী চলেছে ভিড়ের মধ্যে।

সাব-ইনস্পেক্টর পেছুন থেকে হাত ধরে খৃষ্টপূর্ব্বর। একবার চমকে উঠে পেছুন ফিরে তাকিয়ে খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, মেয়ে-পুলিস! আশে-পাশের সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

পুলিস সাব-ইনস্‌পেক্টার আকস্মিক নারীত্বের জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলনা, অতএব সকলের সুমুখে লজ্জা পেতে হ'ল তাকে। খৃষ্টপূর্ব্বর হাতটায় ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, এখানে কি হচ্ছে? আপনার নাম কি?

খৃষ্টপূর্ব্ব একটা ঢোঁক গিলে বল্লেন, আমার? আমার নাম লীলা।···

জোরে ধমক দিয়ে ওঠে সাব-ইনস্‌পেক্টার: ফাজলামির জায়গা পাননি? আপনার নাম লীলা? তারপর উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয়: যান, চলে যান এখান থেকে, রাস্তায় ভিড় জমাবেন না। ভিড় করলে থানায় যেতে হবে এক্ষুনি। থানার নাম শুনে এক এক করে যে যার পাতলা হতে আরম্ভ করলে। সাব-ইনস্‌পেক্টার খৃষ্টপূর্ব্বকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কপালে আঁকা ও কিসের চিহ্ন?

ভাবের ঘোর তখনো কাটেনি ভালো করে। প্রশ্নের উত্তরে খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন: কি, কে, কেন, কবে, কোথায়?···

আবার একটা ঝাঁকানি দেয় মেয়ে-পুলিস। ও সব কি বকছেন আবোলতাবোল? যান বাড়ী চলে যান এক্ষুনি···এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

অর্থাৎ এতক্ষণে ঠিক চিনে নিয়েছে সাব-ইনস্‌পেক্টার। এতক্ষণে বুঝেছে যে, সত্যি সত্যিই লোকটার মাথা খারাপ। আগে ভেবেছিল কম্যুনিষ্ট, ভেক ধরে রাস্তায় মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে মাথা বিগড়ে দিচ্ছে জনসাধারণের, কিন্তু এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের কাজে চলে গেল মেয়ে-পুলিস। খৃষ্টপূর্ব্ব উল্টো-মুখে এগিয়ে চলেন আধুনিকা হোটেলের দিকে। মনে মনে ইষ্ট-মন্ত্র জপ করতে করতে চলেন: লীলা, লীলা, লীলা।···

তারপরের দিন বিকেলবেলা। চায়ের কাপে পুরো-কাপ ঘন করে সিঁদুর গুলে সেই কাপটা হাতে করে পথ হাঁটছেন খৃষ্টপূর্ব্ব। কপালে যথারীতি জিজ্ঞাসার চিহ্ন আঁকা আছে। ফুটপাথের পাশে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা মটর গাড়ী।

গাড়ীর ভেতরে সুশান্ত। খৃষ্টপূর্ব্বকে জিজ্ঞেস করে, রমেশদা, কোথায় চলেছেন? খৃষ্টপূর্ব্ব চমকে উঠে যেন গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে

এলেন। হেসে বলেন, লীলার বাড়ী যাচ্ছি। সুশান্ত বলে, ভেতরে আসুন পৌঁছে দেব। তারপর কাপ হাতে গাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েন খৃষ্টপূর্ব্ব। সুশান্ত জিজ্ঞেস করে এ সিঁদুর কি হবে? আপনার কপালে ও আবার কি এঁকেছেন? খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, লীলা বেড়াতে গিয়েছিল গিরিডিতে, শুনলুম কাল ফিরে এসেছে। আজ তাই যাচ্ছি ওর কপালে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দেব।···

তারপর সুশান্তর প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা চিহ্নের তত্ত্বকথা সব বুঝিয়ে দেন সুশান্তকে।···

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, তা লীলা দেবী কি সম্মত হয়েছেন আপনার সমিতির সভ্য হতে? তিনি কপালে চিহ্নটা আঁকতে রাজী হবেন তো?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, না, লীলা রাজী হবে না।

সুশান্ত বলে, তবে?

খৃষ্টপূর্ব্ব চুপ করে ভাবেন খানিকক্ষণ। তারপর কি একটা কথা মনে হয়ে তাঁর চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ হেসে ফেলে বলেন, একটা উপায় আছে, তুমি একটু চলনা আমার সঙ্গে লীলার কাছে।

সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়ে যায়। বলে, আমি গিয়ে কি করবো?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, যদি লীলা রাজী না হয় চিহ্নটার ব্যাপারে, তাহ'লে তাকে একটু চেপে ধরবে? আমি একলা তো পেরে উঠবো না।

হা হা করে হেসে ওঠে সুশান্ত। মেয়েমানুষকে চেপে ধরবো! এ আপনি কি বলছেন রমেশদা? তাছাড়া কি হবে অনিচ্ছায় লীলা দেবীকে ঐ চিহ্ন পরিয়ে? একি ঘোড়াকে নাল পরাতে যাচ্ছেন, যে চেপে-চুপে ধরে জোর করে পরিয়ে দেবেন?···

খৃষ্টপূর্ব্ব ঘাড় নাড়েন···না না সুশান্ত কদর্থ কোরোনা ব্যাপারটার। ঘোড়াকে নাল পরানো কেন হতে যাবে? শিশু কৃষ্ণকে চেপে ধরে যশোদা কি কাজল পরাতেন না তার চোখে? ঐখানে ঐ বাৎসল্য রসের খেলা। মধুর আর ব্যৎসল্য দুই মিশে গেছে যে গঙ্গা-যমুনার স্রোত, তাইতো জেগে উঠেছে ভূমার রূপ, ঐ জিজ্ঞাসা চিহ্ন!···

সুশান্তর মনে হ'ল, এই পাগল লোকটার মাথায় এখন খেয়াল

চেপেছে, এখন ওকে লীলা দেবীর কাছে না যেতে দেওয়াই ভালো। সেখানে গিয়ে কি আবার কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে বসবে কে জানে! সেই মর্ম্মে উপদেশ দিলে খৃষ্টপূর্ব্বকে…ওরকম জোর-জবরদস্তি করতে যাবেন না। তার চেয়ে বরং আজকে ছেড়ে দিন…আগে অমনি গিয়ে জিজ্ঞাসা সমিতির তত্ত্বকথা ভালো করে বুঝিয়ে দিন লীলা দেবীকে, তারপর একবার বুঝে নিলে জিনিসটাকে, তিনি নিজেই সানন্দে গ্রহণ করবেন ওটা।

খুব গভীরভাবে কি যেন ভাবতে লাগলেন খৃষ্টপূর্ব্ব। তারপর বললেন, সেই ভালো, তোমার কথাই থাক। আগে বুঝোই জিনিসটা ভালো করে, কেমন? গিরিডি থেকে আসার পর একদিনও দেখা হয়নি তো…তারপর আবার একবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন রমেশ ঘোষাল। পরক্ষণেই কি যেন একটা মনে পড়ে গেল তাঁর। হেসে বল্লেন, আচ্ছা সুশান্ত মানুষ কি অণ্ডজ হতে পারতো না? অর্থাৎ মেয়েরা যদি ডিম প্রসব করতো?

খুব আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুশান্ত, অথচ হা হা করে হেসে ওঠে। প্রশ্ন করে, মানুষ অণ্ডজ হতে পারতো, সে কিরকম? আর তাহ'লে কি সুবিধে হতো মানুষের?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে কোনদিন ঠিক করে বুঝতে পারবেনা। তা' পারলে জীবনে একটানা এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য থাকতোনা কখনো; এবং বুঝতে পারেনা বলেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ভুমার চিরন্তনী রূপ ধারণ করেছে। তারপর উচ্ছ্বাসের স্রোতে একেবারে ভেসে গেলেন খৃষ্টপূর্ব্ব…এই দেখনা লীলা আর আমি, দু'জন দু'জনকে কিছুতেই বুঝতে পারলুম না একটুও…অথচ ঐ দ্বৈত ভাবটা স্বীকার না করলে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ভাবের গলা টিপে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। না না সুশান্ত তুমি বুঝছোনা,—হয় আমি সত্যি, নয় লীলা সত্যি, দু'জন কিছুতেই সত্যি নই…অথচ কেন এরকম হ'ল? অদ্বৈত যে, তার ঠিক পরিচয়টা কি? কি তার রূপ? কবে, কোথায় সৃষ্টি হ'ল ঐ রূপ, ঐ সত্ত্বা? তারপর খৃষ্টপূর্ব্ব হঠাৎ যেন ফিরে আসেন নিজের কাছে, জোরে হেসে ওঠেন নিজের মনে। বলেন, এই দেখ ঘুরে-

ফিরে ঠিক সেই বুড়ো শিবতলা,—সেই কি, কে, কেন, কবে, কোথায় এসে পড়েছে আবার !···

বাধা দিয়ে সুশান্ত বলে, কিন্তু এতে মানুষের অণ্ডজ হবার কি প্রয়োজন ?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, অণ্ডজ ? না সেটা অন্য কারণে। এমন যদি ব্যবস্থা হতো যে পাখীর মতো নারীও ডিম্ব প্রসব করতো, এবং এক-মাসের বেশী গর্ভধারণ করতো না, অর্থাৎ একমাসের ভেতরেই ডিমগুলো প্রসব করে ফেলতো···

খৃষ্টপূর্ব্বর অদ্ভুত কল্পনা শুনে আবার হা হা করে হেসে ওঠে সুশান্ত। বলে, বেশতো তাহ'লে কি হতো তাই বলুন ?

খৃষ্টপূর্ব্ব ঘাড় নাড়েন···তুমি বুঝছো না সুশান্ত অনেক সুবিধে হতো তাহ'লে। এই ধর না, স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারে না। এই নিয়ে যত মাধুর্য্য, আবার তত সংঘাত ও অসঙ্গতি, যাকে ইংরেজীতে তোমরা বলো maladjustment বা incompatability. এর চেয়ে এমন ব্যবস্থা যদি হতে পারতো যে প্রত্যেকটা মেয়ে একমাস করে পুরুষ বা মেয়ে থাকবে, অর্থাৎ একত্রিশ দিনের দিন পুরুষ হয়ে যাবে মেয়ে, আর মেয়ে যে সে পুরুষ হয়ে যাবে, তাহ'লে পরস্পর পরস্পরকে হয়তো অনেক বেশী বুঝতে পারতো। অর্থাৎ তিরিশ দিন অন্তর যদি লীলা হয়ে যেত রমেশ ঘোষাল, আর রমেশ হয়ে যেত লীলা, তাহ'লে আমার ভালোবাসা আর তার ভালোবাসা আমরা দু'জনে অনেক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতুম।

সুশান্ত হাসে। তারপর বলে, কিন্তু লীলা দেবী বদলে গিয়ে যদি ভোজপুরী দারোয়ান হয়ে যেতেন, আর আপনি হয়ে যেতেন মেসের ঝি, তাহ'লে কিন্তু খুব মুস্কিল হতে পারতো।

খৃষ্টপূর্ব্ব অস্থির হয়ে ওঠেন···না না সে বিষয়ে কড়া কণ্ট্রোল রাখতে হতো বৈকি···স্বামী-স্ত্রী, ও প্রেমিক-প্রেমিকাদের বেলায় লোক বদলাবার কোন উপায়ই রাখা হতো না। তারপর আর একটা আইনের খুব প্রয়োজন হতো, মানুষের ডিমগুলো যেন মানুষে সেদ্ধ বা ওমলেট করে খেয়ে না ফেলতে পারে।

সুশান্ত গাড়ী করে জরুরী কাজে বেরিয়েছিল, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্বর পাল্লায় পড়লে কি কোন কাজ করবার উপায় থাকে? হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সুশান্ত হিসেব করে দেখলো প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়ীতে বসে বসে খৃষ্টপূর্ব্বর সঙ্গে গল্প করছে সে। খৃষ্টপূর্ব্ব অনুরোধ করলেন, আমায় একটু ইডেন বাগানে নামিয়ে দিয়ে যাবে?

সুশান্ত বলে, ইডেন বাগানে গিয়ে কি করবেন আবার?

খৃষ্টপূর্ব্ব হেসে উত্তর করেন, যাই গাছপালাকে চিহ্নটা পরিয়ে দিয়ে আসিগে। এখানে তো পথে-ঘাটে গাছপালার দেখা মেলাই মুস্কিল।

সুশান্তর জরুরী কাজ ছিল, অতএব খৃষ্টপূর্ব্বর হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে। ইডেন বাগানের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় খৃষ্টপূর্ব্বকে নাবিয়ে দিলে সুশান্ত।

গাড়ী থেকে নাববার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, এসো তোমাকে পরিয়ে দিই চিহ্নটা। মহা মুস্কিলে পড়লো সুশান্ত। কাজে যাচ্ছে এখন, এই সময় যদি কপালে সিঁদুরের জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকে, তাহ'লে কাজকর্ম্ম তো একেবারে শিকেয় গিয়ে উঠবে। যে দেখবে সেই ভাববে পাগল, পাছে আঁচড়ে-কামড়ে দেয় বলে সবাই ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে চতুর্দ্দিকে।

ব্যাপারটা এড়িয়ে যায় সুশান্ত···আমার জন্যে ভাবছেন কেন? আমি তো পরবোই, তবে পাঁজী-পুঁথি দেখে একটা শুভদিনে দীক্ষা নেবো আপনার কাছে।···

দীক্ষা কথাটায় খুসী হয়ে খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো। তবে দীক্ষা জিনিসটা সস্ত্রীক নিতে হয়।

সুশান্ত বলে, নিশ্চয়ই। আমি আজই গিয়ে সুলতাকে বলবো ···সুশান্ত তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে দিলে, আর খৃষ্টপূর্ব্ব গিয়ে ঢুকলেন ইডেন বাগানে।

সন্ধ্যেবেলা,···আগেকার ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের দিকে বেশ লোকজন রয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে হাতে সিঁদুরের কাপ নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব। লোকজন অবাক হয়ে দেখছে। খৃষ্টপূর্ব্ব মনে মনে নাম জপছেন : লীলা, লীলা, লীলা।

তারপর এসে পড়লেন জনবিরল বৃক্ষবহুল অংশটায়। এক একটা পা ফেলছেন ও মনে হচ্ছে এক পায়ে বুঝি তিনি রমেশ, আর অন্য পায়ে লীলা। এক পায়ের পর আবার এক পা, একবার রমেশ, একবার লীলা। নিজের মনেই হাসতে হাসতে বলেন. দুই নয়, দুই নয় শুধু একজন, হয় লীলা নয় রমেশ, হয় রমেশ নয় লীলা। তারপর আবার নাম জপছেন খৃষ্টপূর্ব্ব : লীলা, লীলা, লীলা।

দু'চারজন কৌতূহলী লোক পেছু নিয়েছে। কপালে জিজ্ঞাসা চিহ্ন, হাতে এক পেয়ালা সিঁদুর, তার ওপরে নাচবার মত তালে তালে পা ফেলে চলেছে ঐ বুড়ো লোকটা। এরকম দৃশ্য তো প্রায় চোখে পড়ে না, অতএব যারা পেছু নিয়েছে তাদের দোষ কি ?

বিশ্বের সব গান, সব নাচ, সেই আসন্নপ্রায় সন্ধ্যেবেলা খৃষ্টপূর্ব্বকে জড়িয়ে ধরেছে প্রিয়ার মত। পশ্চিম আকাশের রক্তরাগের শেষ ইঙ্গিত এসে পড়েছে গাছগুলোর মাথায় মাথায়, তলায় তলায় আসন পেতেছে ক্রম-ঘনায়মান অন্ধকার।

এ্যাডামের পাঁজরার হাড় থেকে সৃষ্ট হয়েছিল আদিম মানবী··· ঐ সুমুখের গাছটার পাশে ওরা যেন দাঁড়িয়ে হাসছে, 'প্যারাডাইস লষ্টের' সেই উলঙ্গ নর-নারী। সব গান, সব আলো, সব যৌবন যেন ঘিরে ধরেছে খৃষ্টপূর্ব্বকে। ওরা দুই নয় এক, একজনের পাঁজরার হাড় নিয়ে আর একজনকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। দুই নয় এক, এ্যাডাম আর ইভ, রমেশ ও লীলা।···

এই যে এসো তোমাদের কপালে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দিই··· এ্যাডাম আর ইভের কাছে এগিয়ে গেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব···দু'জনের কপালে এঁকে দিয়েছেন চিহ্নটা। ইভকে বলেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অজ্ঞান এসেছিল, তাই পেয়েছিলে লজ্জা, তাই ডুমুরের পাতা দিয়ে শরীর ঢেকেছিলে। তোমায় দু'জনেই ঠকিয়েছিল, শয়তান আর ভগবান। বিবসনা, আর কোনদিন শরীর ঢেকোনা।···

আবার বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব···পৃথিবীতে বস্ত্র নেই কোথাও, যান্ত্রিক সভ্যতাকে এবার নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দাও।···

পেছুনের লোকগুলো দেখলে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির ওপরে

পাশাপাশি সিঁদুর দিয়ে দুটো জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব। কিন্তু ঐ যে পেছুনের লোকগুলো, চিরদিন পেছুনেই থাকবে ওরা সবাই। ওদের কপালে কি খৃষ্টপূর্ব্বর চোখ আছে যে এ্যাডাম ইভকে দেখতে পাবে? ইভের দিকে তাকিয়ে খৃষ্টপূর্ব্ব আবৃত্তি করলেন:

"তব স্তনহার হতে নভোস্থলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা॥"—

তারপর ইভকে আবার জিজ্ঞেস করেন খৃষ্টপূর্ব্ব···কে বেশী ভালোবাসো তোমরা?—তুমি না ও?

কেউ উত্তর দিতে পারে না কথাটার কেমন করে দেবে? ওরা তো দুই নয়, এক; হয় এ্যাডাম না হয় ইভ, হয় রমেশ না হয় লীলা। তবে কেমন করে উত্তর দেবে ও প্রশ্নের? ঐ দুটো উলঙ্গ নর-নারী মিলিয়ে গেল রমেশ ঘোষালের সুমুখে, তাদের জায়গায় জেগে উঠলো গাছের গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকা সেই দুটো জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আবার নাম জপেন খৃষ্টপূর্ব্ব: লীলা, লীলা, লীলা।

আবার এগিয়ে চলেন রমেশ ঘোষাল, আবার সেই এক পায়ে লীলা, এক পায়ে রমেশ। তারপর আর একটা গাছের কাছে। গাছের গায়ে লিখে বেড়াচ্ছেন খৃষ্টপূর্ব্ব। প্রথমে লিখেছেন লীলা, তারপর আঁকছেন সেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে গাছের তলায় তলায়, আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে কেমন যেন একটু নিদ্রালু তন্ময়তা।

পাগল মনে করে পেছনের লোকগুলো ফিরে চলে গেছে খৃষ্টপূর্ব্বর কাছ থেকে, একলা এগিয়ে চলেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব এক পায়ের পর আর এক পা···এক পায়ে রমেশ ঘোষাল, অন্য পায়ে লীলা। মাথার ওপর একটা কালো রঙের পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল: লীলা, লীলা, লীলা।

ঝোপের পাশে একটা বড় নিমগাছ। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছে এবারও লীলার নাম লিখেছেন খৃষ্টপূর্ব্ব। তারপর আঁকছেন সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা।

ঝোপটার ওপাশে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে আধো-আলো আধো-অন্ধকারে রূপেন কবিতা শোনাচ্ছে লীলাকে। ওরা সেদিন দু'জনে বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে ইডেন বাগানে গিয়ে পৌঁচেছে। মৌমাছির মত গুনগুন করে কবিতা শোনাচ্ছে রূপেন :

কোথা কে রচিছে উর্ণনাভের জাল,
রবি শশী তাহে বন্দী, আমি ও তুমি ;
আজ ভালোবাসি, হিম হয়ে যাবো কাল,
হিম হয়ে যাবে তুমি মোরে চুমি চুমি···
হিমালয় কাল আগুন হইয়া যাবে,
নাই অবকাশ, কোথা অবকাশ পাবে ;
প্রিয়ার বক্ষ মুকুলের মরুভূমি···।

শেষের লাইনটা জোরে জোরে আবৃত্তি করে রূপেন : প্রিয়ার বক্ষ মুকুলের মরুভূমি···সিঁদুরের পেয়ালাটা খৃষ্টপূর্ব্বর হাত থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি···ওদিকে একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখেন খৃষ্টপূর্ব্ব, তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে যান ওদের বেঞ্চির পেছুনে। খৃষ্টপূর্ব্বর দিকে পেছন ফিরে ওরা বসে আছে বেঞ্চির ওপর।

খৃষ্টপূর্ব্বর পায়ের তলায় শুকনো পাতা আর্ত্তনাদ করেছে, ওরা শুনতে পায়নি সে শব্দ। অস্ত-গগনের দিকে মুখ করে চুপ করে তন্ময় হয়ে বসে আছে ওরা। বেশ ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, একটু দূরে আর একটা ঝোপের কাছে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। মাথার ওপর আকাশে একটা বড় তারা যেন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টিতে।···

তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে লীলা কথা বলে, না রূপেন বাবু আমার খোঁজা আজও শেষ হয়নি। যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন ভেবেছিলুম ভালোবাসা এসেছিল আমাদের জীবনে। কিন্তু তারপর··· আবার মনে হ'ল সেটা ভুল কথা, ভালোবাসা আসেনি আমাদের কাছে। তখন থেকেই, স্বামী বেঁচে থাকতেই, আবার আরম্ভ করেছিলুম খোঁজা।

অস্থির হয়ে রূপেন বলে, আর কতদিন খুঁজবে লীলা ?

অস্তগগনের দিকে ফেরানো মুখে হয়তো মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে লীলার···কে জানে খোঁজা হয়তো আজীবনই চলবে। আমার মনে হয় মানুষের জীবনে সত্যি ভালোবাসা কখনো পাওয়া যায় না, অনন্ত অন্বেষণ, eternal quest-ই হ'ল, পরমার্থ। তাছাড়া কতদিন খুঁজবো, এ নিয়ে আপনার কতটুকু দরকার? খুঁজে হয়তো আপনাকে পাবোনা, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত কানামাছির খেলায় রমেশ ঘোষালই জয়ী হবে।···

আরও অস্থির হয়ে ওঠে রূপেন,—রমেশ ঘোষাল? এ তুমি কি বলছ লীলা? ঐ চরিত্রহীন লোকটার নাম মুখে আনতে তোমার ঘেন্না করে না? আমার কথাটা শুনবে কি?

আর কি উপায় আছে খৃষ্টপূর্ব্বর? কাপে যতটুকু সিঁদুর ছিল সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন রূপেনের মাথার ওপরে। মাথায় হাত দিয়ে বলে ওঠে রূপেন—একি, মাথায় কি পড়লো?

আর কি চুপ করে থাকতে পারেন খৃষ্টপূর্ব্ব? বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে ফেল্লেন: কি, কে, কেন, কবে, কোথায়? কে কে, বলে চমকে উঠে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ওরা দু'জনে। আবার বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব,—রমেশ ঘোষালের জয়!···

অন্ধকারে এবারে চিনতে পারলে ওরা। রূপেন আবার হাত দিয়ে দেখে মাথায়, আঙুলে কি যেন চটচট কচ্ছে, তারপর দেখে সেই চটচটে পদার্থ কপাল বেয়ে এসে জামা কাপড়ে গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কি·· লীলা কাছে এসে ভালো করে দেখে বলে, কি যেন কালো কালো দেখতে।···

খৃষ্টপূর্ব্ব বল্লেন, সিঁদুর দিয়েছি।

রেগে ওঠে রূপেন···আপনি দিয়েছেন বুঝি? ও বুঝেছি, ঐ হাতের বাটি থেকে ঢেলেছেন···কিন্তু কেন ঢেলেছেন সিঁদুর?

খৃষ্টপূর্ব্ব বলেন, সিঁদুর দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বলে। বলেই হা হা করে হেসে ওঠেন খৃষ্টপূর্ব্ব। চরিত্রহীনের সঙ্গে সতী-সাবিত্রীর বিয়ে হয়ে গেল। তারপর লীলাকে বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব, দেখ লীলা ও যেমন যণ্ডা, দেখো যেন আমায় মেরে না ফেলে ঘুষি মেরে···রক্ত বেরোলে তুমি সাক্ষী থেকো কিন্তু।···

আস্তিন-টাস্তিন গুটিয়ে ফেলেছিল রূপেন, কিন্তু লীলা বাঁধতে দেয়নি ঝগড়া। শেষে গায়ে-মাথায় একগাদা সিঁদুর নিয়ে একখানা ট্যাক্সি করে চলে গেল রূপেন খুব রাগ করে। খৃষ্টপূর্ব্বর সঙ্গে একটা কথাও না বলে লীলা চলে গেল ট্রাম ডিপোতে।

খৃষ্টপূর্ব্ব একলা বেরিয়ে পড়লেন হাইকোর্টের দিকে। একটা গাধা দাঁড়িয়ে ছিল ল্যাম্প-পোষ্টের পাশে। কাপে যতটুকু সিঁদুর লেগেছিল তাই দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকলেন তার কপালে।

হাইকোর্টের গাধাও ছটফট করে···অঙ্কনপর্ব্বের মধ্যে দু'একবার পেছুনে সরে গেল গাধাটা।

আঁকা শেষ হলে খৃষ্টপূর্ব্ব গাধাকে সম্বোধন করে বললেন, একই চিহ্ন পড়েছে রমেশের কপালে আর তোর কপালে। কিন্তু কেন? তুই গাধা কেন, আর আমি রমেশ কেন? রমেশটাও কি গাধা?

—চব্বিশ—

ইলিসিয়াম হোটেলে বেলার বেয়াড়া অসুখ করেছে, ডাক্তার দেখে বলেছে আক্কেল দাঁত উঠছে। বাঁ-দিকের মাড়ি ফুলে উঠেছে, অসহ্য যন্ত্রণা, সেই তাড়সে দু'তিনদিন স্পষ্ট জ্বর ফটেছে গায়ে। টেলিফোন করে সুলতাকে নিজের কাছে আনিয়েছে বেলা, আজ দু'দিন থেকে সুলতা রয়েছে বেলার হোটেলে। ডাক্তার বলেছে, যে ওষুধ চলছে তাতে না কমলে শেষ পর্য্যন্ত অপারেসান করতে হবে মাড়িতে।

সেদিন জ্বরটা ছেড়ে গেছে, যন্ত্রণাটাও অনেকটা কম, সুলতার রান্না খিচুড়ি খেয়েছে একটু। বিকেলবেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় চৌরঙ্গীর দিকের বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জনে। চৌরঙ্গীর রাস্তার ওপারে ধূ ধূ করছে গড়ের মাঠ, চৈত্র-শেষের খর রোদ্দুর যেন একটু ঝিমিয়ে এসেছে বিকেলবেলার দিকটা। কালীঘাট টালিগঞ্জ-গামী বাস ও ট্রাম গাড়ীগুলোর সর্ব্বাঙ্গে মানুষে ঝুলতে ঝুলতে

যাচ্ছে বাদুড়ের মত···পাঁচটায় অফিসে ছুটি হয়েছে সব, অফিসের কেরাণীকুল যে যার বাড়ী ছুটে যাচ্ছে যত শীগগির সম্ভব।

বেলা আর সুলতা দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে বারান্দায়, রেলিংএর ওপর হেলান দিয়ে; হঠাৎ দেখা গেল একজন পথচারী ভদ্রলোক মুখ উঁচু করে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ থেকে নেবে পথ পেরুচ্ছেন। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে এই জন্যে বললুম যে, একটা 'এই এই' রব উঠলো, ভদ্রলোক সেই কলরবে ও ক্যাঁচ করে মোটরের ব্রেক কষার শব্দে চমকে উঠে নিজের কাছে ফিরে এলেন, এবং বুঝলেন যে ছাপ্পান্ন পুরুষের পুণ্যবলে তিনি এক্ষুনি মোটর চাপা-পড়া থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছেন। সুলতা, বেলা দাঁড়িয়ে আছে তিনতলার বারান্দায়, অতএব রাস্তায় সৌন্দর্য্যপিপাসু ও মৃত্যুমুখ থেকে সদ্য-অব্যাহতিপ্রাপ্ত ঐ ভদ্রলোককে ঘিরে অন্যান্য দু'চারজন লোক কি বলাবলি করছে, তা তারা ঠিক শুনতে পেলে না। কিন্তু ভদ্রলোক খুব লজ্জা পেলেন। কে একজন বল্লে, কি মশাই রাস্তা পেরুচ্ছেন অথচ আকাশের দিকে চোখ করে চলেছেন? এক্ষুনি গিয়েছিলেন যে নিম-তলায়! একজন খানসামার মত উর্দ্দি-পরা লোক, একবার মুখ উঁচু করে বেলাদের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েমানুষ দেখছে, বলে হা হা করে হেসে উঠলো। পরে বললে, মাথায় পাকা চুল, অথচ এত মেয়ে দেখার সখ?···আরে বাবা আগে প্রাণ, না আগে মেয়েমানুষ? কে একজন উপদেশ দেয়: যান যান কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিন গে, পুনর্জ্জন্ম হয়ে গেল···এরকমভাবে যে মানুষ বাঁচতে পারে এ কল্পনাও করা যায় না!···

খুব হাসি পড়ে গেল তেতালার বারান্দায়। বেলা বলে, বৌদির জন্যে ভদ্রলোক একেবারে যমের বাড়ী চলে গিয়েছিলেন আর একটু হলে। হেসে সুলতা বলে, আমার জন্যে কেন হবে?···তোমার জন্যে; আমি তো আর তোমার মত অত সুন্দর নই? বেলা কথাটাকে অন্য-দিকে মোচড় দেয়···যার জন্যেই হোক ভদ্রলোকের বোধ হয় এতক্ষণ আক্কেল দাঁত উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রচুর হাসির মধ্যে অনেকদিন আগেকার একটা গান এসে পড়ে ওদের মধ্যে: "চোখে যদি লাগে

ভালো কেন চাইবো না।" সুলতা ওকালতি করে, ভালো লাগলে চেয়ে দেখবার অধিকার সবারই আছে, ভদ্রলোককে দোষ দিচ্ছ কেন…তুমি দেখ না? তোমার কাউকে দেখতে ভালো লাগলে তুমি কি ছেড়ে দাও? বেলা ন্যাকা সেজে বসে। বলে, আচ্ছা বৌদি, কারুর যদি কাউকে ভালোবাসতে ভালো লাগে, তাহ'লে তারও তো অধিকার আছে ভালো-বাসবার? সুলতা ঘাড় নেড়ে বলে, নিশ্চয়, নিশ্চয় আছে। ভালোবাসার অধিকার সকলেরই আছে। বেলা বলে, তোমায় যদি কেউ এসে বলে ভালোবাসি, তাহ'লে তুমি কি কর? সুলতা হেসে বলে, আমায় কেউ বলবে না ও কথা। তবে যদি সত্যিই এসে বলে কেউ, তার ভালো-বাসাকে সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নেবো, বন্ধু হিসেবে তাকে গ্রহণ করবো জীবনে। বেলা বলে, তারপর ভালোবাসা পেয়ে, সে যদি পরে সব চেয়ে বসে? যাঃ, বলে হি হি করে হেসে ওঠে সুলতা…সব বলতে কি বলছ তুমি? সব মানে তো শরীরটা? যে জিনিসটা আমার নয়, তা কেমন করে দিয়ে দেবো আমি? বেলা আবার ন্যাকা সাজে…তুমি তোমার স্বামীর ভাগ দিতে পার কাউকে? কোথায় বুকের ভেতরটায় কিসের যেন একটা ধাক্কা লাগে সুলতার। সে হেসে বলে, না, ও জিনিসের কাউকে ভাগ দেওয়া যায় না। তবে স্বামীর দিকের প্রয়োজন হ'লে হয়তো তাও পারে সুলতা। বেলা জিজ্ঞেস করে তার মানে? সুলতা বলে যদি বুঝি কাউকে ভাগ দিলে স্বামী তাতে সুখী হবে, অর্থাৎ যদি বুঝতে পারি যে স্বামী আমার ভালোবাসায় সুখী নয়, পরিতৃপ্ত নয়, তা'হলে হয়তো তাও করতে পারি আমি। শেষের কথাগুলোর কাছে গলাটা যেন একটু কেঁপে ওঠে সুলতার।

আবার গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায় দু'জনে। আবার সেই বাদুড়-ঝোলা ট্রাম বাস চলেছে কালীঘাটের দিকে। সুলতা বলে, অফিসের সময় ঐ রকম ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যাবার অর্থ বুঝতে পারি, দেরি হয়ে গেলে জরিমানা হতে পারে, চাকরি যেতে পারে। কিন্তু বাড়ী ফেরবার সময় কেন যে সকলের একসঙ্গে এত তাড়াহুড়ো এটা বুঝে ওটা দায়।…

বেলা হাসে, জানো তো মানুষের ছেলেবেলায় মা মা করে দিন কাটে, আর বুড়ো বয়েসে কাটে ওগো ওগো করে। দু'বেলাই

ব্যাপারটা এক, অর্থাৎ মানুষ ছেলেবেলায় যতখানি অসহায় আবার বুড়ো বয়েসেও ঠিক ততখানি অসহায়। তবে সহায় যিনি তাঁর রূপটাই শুধু আলাদা, ছেলে বয়েসে মা আর বুড়ো বয়েসে স্ত্রী। ঐ ট্রাম-বাসের আরোহীদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ এক কথাই খাটে, সকালে চাকরি যাবার ভয়, বিকেলেও তাই, কেবল বড় সাহেব আলাদা। সকালে অফিসের হয়তো স্যুট-পরা বড় সাহেব, আর বিকেলে বাড়ীর বড় সাহেব শাড়ী-পরা···বেলার কথার ধরনে সুলতা জোরে হেসে ওঠে। প্রশ্ন করে, তার মানে ? বেলা বলে, জানো বৌদি আমার একজন মাসতুতো ভাই আছেন কলকাতায়, অমরদা। মধ্যবিত্ত অবস্থা, মিনতি বৌদির সঙ্গে বিয়ে হবার সাত আট বছর পরে একসময় অমরদা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে তাঁদের বাড়ীতে। কিছুতেই আসতে দেবেন না, প্রায় এক নাগাড় একমাস ছিলুম ওঁদের কাছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওরকম ভালোবাসা আমি কমই দেখেছি জীবনে। অমরদা কাজ করতেন একটা মার্চেন্ট অফিসে, সাড়ে ন'টায় খেয়ে বেরিয়ে যেতেন, কিন্তু ভাবসাব দেখলে বেশ মনে হ'ত ঐ যে ক'ঘণ্টার জন্যে।বৌদিকে ছেড়ে অফিসে যেতে হচ্ছে তাতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি থাকতে থাকতে বৌদির কোলের মেয়েটার অসুখ করেছিল, পেটে ব্যথা না কি হয়ে সারারাত্তির কেঁদেছে, দাদাই মেয়েটাকে কোলে করে বসে আছেন, আর বৌদি বেশ ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে প্রায় সারা-রাত্তির। সকালে ঠিকের ঝি আসবার আগে দাদাই উঠে উনুনে আগুন দিতেন, তারপর চা তৈরী করে বৌদির ঘুম ভাঙাতেন রোজ সকালে। এক একদিন অফিস পালিয়ে বাড়ী এসে বৌদির খাবার তদারক করে যেতেন। তারপর অফিসের ছুটি হবার পর প্রথম ট্রামে বাড়ী ফেরা চাইই, কেন না বৌদি চুল বাঁধবে, সেখানে বসে থাকা চাই তার কাছে, বৌদির মেজাজ ভালো থাকলে একটু ফষ্টি-নষ্টি করা চাই, তেলা খোঁপাটা হাত দিয়ে একটু চটকে দেওয়া চাই হঠাৎ পেছুন থেকে। বৌদি কুঁচো চিংড়ী খেতে ভালোবাসতো, অফিস থেকে আসবার সময় খুঁজে-পেতে চাট্টি কুঁচো চিংড়ী আনা চাই প্রায়ই। না হয়তো অন্য কিছু, একটু তরি-তরকারী···নিদেন ছোট একটা ভাঁড়ে একটু রাবড়ী, বৌদির

জন্যে। বৌদি বিকেলবেলা যা খাবার করবে দাদার জন্যে, তার অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা বৌদির খাওয়া চাই সুমুখে বসে···যদি একটা রসগোল্লা থাকে তাহ'লে সেটাকে বৌদি আগে কামড়ে নেবে আধখানা, তবে বাকীটুকু অমরদা খাবেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে। বৌদি মুখে রাগ করতো বটে, কিন্তু আমার মনে হয় মনে মনে প্রচুর আনন্দ পেতো। ফিতে, চিরুণী, কাঁটা নিয়ে গড়িমসি করতো বৌদি রোজ বিকেলবেলা চুল বাঁধবার আগে। সদর দরজায় অমরদা এসে ধাক্কা দিলে তবে আরম্ভ করতো চুল বাঁধা। মাঝে মাঝে আমি বেঁধে দিতুম চুল···কিন্তু দরজায় ধাক্কা না পড়লে আরম্ভ করবার জো নেই। অমরদা পাশে এসে বসতেন ঠিক নিয়ম মত। একদিন বল্লেন, হ্যাঁরে বেলা, তোর বৌদির চুলগুলো খুব সুন্দর না? আমি ঠোঁট দুটো মুখের মধ্যে টেনে হাসি চাপলুম। বললুম, হ্যাঁ, সত্যিই ভারী সুন্দর চুল। বৌদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: তোমার লজ্জা করে না একটু? অফিস থেকে এসে, যাওনা দু'দণ্ড বাইরে ঘরে নির্জ্জনে গিয়ে বোসোনা একটু, তা নয় রোজ চুল বাঁধবার সময় ঠিক এসে বসে থাকা চাই কাছে। এর পর কোন্ দিন বলবে এসো তোমার চুল বেঁধে দিই। অমরদা ভেংচিয়ে উঠলেন: হ্যাঁ, এসো তোমার চুল বেঁধে দিই···বলবে বৈকি ওকথা···বয়ে গেছে আমার মেয়েমানুষের চুল বেঁধে দিতে! আমি আর কত টানবো ঠোঁট দুটোকে মুখের মধ্যে মুড়ে। বৌদি ঝাঁঝিয়ে ওঠে: কালকে চিরুণী ফিতে কিনে দেবো, নিজের চুল বেঁধো পাশে বসে বসে···বিয়ে অনেক লোকেই করে বটে, কিন্তু তোমার মত উচ্ছন্ন আবার কেউ যায় না। ছি ছি করে হেসে ওঠে সুলতা। জিজ্ঞাসা করে, তারপর? বেলা বলে, তারপর আর কি? অফিস যাবার সময় ভাবসাব বুঝে আমি সরে যেতুম অন্য ঘরে। একদিন আড়ি পেতে দেখেছি, সেই আড়ালে বৌদির মাথায় পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন অমরদা। বললেন, দুধ আর কলা দিয়ে মেখে ভাত খেয়ো কিন্তু চাট্টি আজকে; কত রোগা হয়ে যাচ্ছ বলো দিকিন···তারপর আর সাহস হ'ল না, সরে গেলুম। তারপর জানিনা আরো কি সব আদর করে 'দুর্গা দুর্গা' বলে অফিসে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু চুপ ক'রে আবার বেলা

বলে, ভাদ্রমাসের পদ্মার মত ভালোবাসার এমন পরিপূর্ণ রূপ আমি কমই দেখেছি আজ পর্য্যন্ত…অন্য আর এক জায়গায় দেখেছি, সেটা হ'লো সুলতা বৌদির জীবনে।—যাও যাও, তুমি আর বাজে বোকোনা, আমার সাতজন্মেও ওরকম নয়, ব'লে বেলার মুখ চেপে ধরে লতা; লজ্জায় সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে হঠাৎ।

বেলা বলে, ট্রামে-বাসে বাদুড়ের মত ঝুলছে ঐ যে লোকগুলো, ওরা বোধ হয় সবাই এক একজন অমরদা। প্রত্যেক বাড়ীতে মিনতি বৌদি বোধ হয় কাঁটা চিরুণী নিয়ে গড়িমসি করছে চুল বাঁধবার আগে …দরজার ওপরে ধাক্কার শব্দ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে সবাই।

এবার সুলতার পালা…আচ্ছা ঠাকুরঝি, এত তো ভালোবাসার কথা বলো, ভালোবাসার ব্যাপার এত তো দেখেছো সব জায়গায় এত দরদ দিয়ে, কিন্তু সত্যি করে তোমার ভালোবাসার কথাটা একদিনও বললে না। এত মিথ্যে কথা বল কেন বলতো বন্ধুদের কাছে? একে তো বেলা কি বিদ্যুৎ তাই আজ পর্য্যন্ত বললেনা ঠিক করে, তারপর আমার সব কথা জেনে নিলে, অথচ নিজের কথাটা সত্যি করে একদিনও বল্লে না আমাকে। আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না, আজ বলতেই হবে তোমার ভালোবাসার কথা। খুব গম্ভীর হয়ে বেলা বলে, অভদ্রতার তো একটা সীমা আছে? এই আক্কেল দাঁতের ব্যথার ওপরে ভালোবাসার কথা কি করে জিজ্ঞেস করতে পারলে বৌদি? এ যেন খুব পেট কামড়াচ্ছে, বল্লুম, বৌদি ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে, তুমি অমনি গলে গিয়ে বল্লে, আহা মরে যাই, মরে যাই, এসো পেটে হাত বুলিয়ে দিই; তবে ততক্ষণ একটা সুন্দর করে গান গাও তো ভাই।

সুলতা কথাটায় মোটেই আমল দেয়না। বলে, ও সব ইয়ারকি অনেক শুনেছি, ও সব দিয়ে আর ভোলাতে পারবে না আজকে। আজ বলতেই হবে তোমার ভালোবাসার কথা। এত দিনে ভালোবাসোনি কখনো?

হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে আসে বেলা। সুলতার কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে বারান্দায় চেয়ারটার ওপরে।

সুলতা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা তোমায় কি কখনো ভালোবাসেনি কেউ?

বেলা চোখ নীচু ক'রে বলে, অন্ততঃ সাত জনের কাছ থেকে ভালোবাসার আভাস পেয়েছি এখন পর্য্যন্ত।···

লতা বলে, তবে?···ওর মধ্যে একজনকেও মনে ধরলো না? এমন খুঁতখুঁতে মন কেন তোমার?

বেলা হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, আমি কালো কুচ্ছিত নই তো? জোরে হেসে ওঠে লতা। বলে, ও আবার কি কথা? তুমি তো পরমা সুন্দরী ঠাকুরঝি, মিছি মিছি দর বাড়াচ্ছো কেন ভাই? বেলা উত্তর দেয়না ও প্রশ্নের। বলে, জানো বৌদি কি পুরুষের কি মেয়েমানুষের, রূপ বড় জঘন্য বালাই। যারা ভালোবাসলে তারা রূপকেই ভালোবাসলে, রূপ বাদ দিয়ে আমাকে কেউ চাইলে না। এই অনুভূতিই সব সময় পেয়ে এসেছি সব জায়গায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ওরা বারান্দায় বসে গল্প করছে দু'জনে···সুলতা অবাক হয়ে দেখলে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে বেলার মুখটা।

আজ বোধ হয় এতদিন পরে সত্যি কথাটা বলে ফেলবে বেলা; কেমন যেন গলা গলা একটা ভাব এসেছে ওর চোখে-মুখে। অনেক-দিন আগের গল্প বলে মেয়েটা। বলে, আমি আর বিদ্যুৎ হবার দু'বছর পরে হয় অমি, আমাদের ছোটভাই অমিতাভ। তারপর থেকে বাবা মা আলাদা আলাদা পৃথক ঘরে বাস করতে লাগলেন। সমস্ত ছেলেবেলাটা একদিকে টকটকে লালপেড়ে গরদের শাড়ী-পরা মার পূজারিণী রূপ, আর অন্যদিকে বাবার যোগাসনে ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি, এই দুয়ের মধ্যিখানে শুধু গীতা চণ্ডীর সুরে বেলার দিন কেটেছে গানের মত। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীতে হ'ত ঠাকুরের, সাধু-সন্ন্যাসীদের, অতিথি-অভ্যাগত, অনাথা-আতুরদের রাজসিক সেবা। বাবা বলতেন, আমাদের সকলের জীবনই ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকের জীবন···সৈনিকের জীবনে নিজের বলতে কিছু নেই, কোন সুখ দুঃখ নেই ব্যক্তিগত। তারপর আসতো গীতার শ্লোক: 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্' বাবা বুঝিয়ে দিতেন আমাকে।

আর মাকে…আমরা কেউ নই, আমরা শুধু নিমিত্ত, শুধু ধর্মযুদ্ধের অনাসক্ত সৈনিক আমরা।

একটা নিঃশ্বাস চাপে বেলা,—মাঝে মাঝে মা বিয়ের কথা তুলতেন, বলতেন, বিয়ে-থা ঘর-সংসার করবেনা ও ? বাবা হেসে বলতেন, আমি তো ওর বিয়ে দেবো না, ও নিজে থেকে ভালোবেসে বিয়ে করবে। সত্যি করে ভালোবাসতে হবে, দাম্পত্যজীবনে তবে উপলব্ধি করতে পারবে সত্যকে। স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা না হ'লে, ঘর-সংসার সন্তান সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। এবার সুলতার দিকে চোখ তোলে বেলা। একটা নিঃশ্বাস টেনে বলে, তাইতো আজো খুঁজে বেড়াচ্ছি বৌদি, পৃথিবীর সব জায়গায় ঘুরে এলুম আমাদের সঙ্ঘের কাজে, অথচ,…এখানে যেন গলাটা একটু জড়িয়ে যায় বেলার, অথচ ভালোবেসেছি বলে আজও এলোনা কোন অখণ্ড অনুভূতি।

সুলতা জিজ্ঞেস করে,—আর বিদ্যুৎ ঠাকুরঝি ? কেমন যেন চমকে ওঠে বেলা…দুবার ঢোঁক গিলে বলে…বিদ্যুৎ ? …তা' তার কথা আমি কেমন করে বলবো বল ? তার কথা সেই জানে…আমি শুধু আমার কথাই বলতে পারি। সুলতা একটু যেন ভাবে কি একটা কথা, বলে, তোমার দাদারও ঠিক ঐ রকম পূজো-আচ্চার ভেতরে দিন কেটেছে। আমার শাশুড়ী যখন বিধবা হন, তখন তোমার দাদা আড়াই বছরের। সেই থেকে তিনি বাড়ীতে থাকা ছেড়ে দিলেন। আমাদের কালী মন্দিরে পূজো আর সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছেলেবেলায় ঠিক তোমার মতই দিন কেটেছে তোমার দাদার।…

এইখানে যদি একটা খবর বলি অমনি আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সুলতার স্নান পূজো এ সব সারতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে সকালবেলা…সেই সময় একটা প্যাড টেনে নিয়ে বসে হিজিবিজি অনেক কথা লিখেছে বেলা, তার মধ্যে দু'একটা কথা বলছি। একবার লিখেছে, আমি সুশান্তকে ভালোবাসি, তারপর লিখেছে, সুশান্ত কি আমাকে ভালোবাসে ? তারপর ফনা তোলা জিজ্ঞাসা চিহ্ন…তারপর আবার লিখেছে, না, না সুশান্ত ভালোবাসেনা, সুশান্ত ভালোবাসতে জানে না…সুশান্ত অরসিক, তারপর লিখেছে একটা গান : "প্রেম জানে

না যে জন তারে কেন দেব মন,'...আবার একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন...
তারপর লিখেছে সংস্কৃত শ্লোক...'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।'

শুধু তাই নয়, আর একখানা কাগজে আছে সুশান্তর চিঠি—বেলা তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমার রূপকে নয় তোমাকে। তোমার জন্যে সব ছেড়ে দিতে পারি...এমনকি সুলতার ভালবাসাকেও।

দাঁতের ব্যাথায় বসে বসে লিখে ফেলেছে দু'খানা কাগজ। তারপর বোধ হয় সুলতার পায়ের শব্দ পেয়ে কাগজ দুটো মুড়ে বুকের মধ্যে পুরে ফেলেছে। সেই থেকে কাগজ দুটো রয়েছে সেমিজের মধ্যে যেখানে বুকটা ধ্বক ধ্বক করছে অবিশ্রাম। বেলার বুক ধ্বক ধ্বক করছে, আর তার ওপর লেগে রয়েছে ঐ কথাগুলো, তোমার জন্যে সব ছেড়ে দিতে পারি...এমন কি সুলতার ভালোবাসাকেও।

পৃথিবী সূর্য্য-প্রদক্ষিণ সেরে পয়লা বোশেখে এসে পৌচেছে। এবারে চৈত্র মাসের শেষের ক'দিন পাঁজিতে বড় নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ছিল, বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে। প্রথমে অশোক ষষ্ঠী, তারপর নীলের উপোস, তার পরের দিন বাসন্তী পূজোর মহাষ্টমী, আবার তার পরের দিন রামনবমী ও পয়লা বোশেখ একসঙ্গে। বেলার আক্কেল দাঁত সেরে গেছে, সুলতার সঙ্গে ও চলে এসেছে সুলতাদের বাড়ী। তারপর আরম্ভ হয়েছে বার-ব্রত উপোস। উপোসের ব্যাপারে বেলা সবাইকে হার মানিয়েছে...অনুনয়-বিনয় করে সুলতা, মনো, প্রতিমা আর আর সবাইকে মাঝে মাঝে জল খাইয়েছে বেলা, কিন্তু নিজে শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন পূর্ণ মাত্রায় মেনেছে এক নাগাড়ে ঐ ক'দিন ধরে। খুব উপোস করতে পারে বেলা, ওর স্বাস্থ্যটা খুব ভালো কিনা।

সুশান্ত ব্যবসা করে, বচ্ছর বচ্ছর পয়লা বোশেখের দিন ওর বাড়ীতে গণেশ পূজো ও হালখাতা হয়। মেয়েরা সকালবেলা গঙ্গা স্নান করে কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলো, তারপর বাড়ীতে গণেশ পূজো হবে। ছোট গণেশ মূর্ত্তি কিনে আনা হয়েছে, বেলা, সুলতা, মনো, প্রতিমা সবাই পূজোর আয়োজনে বসে গেছে। এর পরে বেলা উঠে রান্না করতে বসবে। নিজে থেকে যেচে বলেছে ও, আজ নতুন নতুন খাবার করে খাওয়াবে, সুশান্তকে আর সবাইকে। সবাইকেই

খাওয়াবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সুশান্তকে খাওয়াবে সেইটেই হ'ল বড় কথা। সারা বেলা সমস্ত মন-প্রাণ ঢালা অনন্ত শ্রদ্ধা, আগ্রহ, যত্ন দিয়ে রান্না করা, তারপর সুমুখে বসে শুকনো মুখে সেই রান্না, এটা খাও, ওটা খাও বলে খাওয়ানো, সে যে কি অমৃত, তা যে নারী ভালোবেসে রান্না করে খাওয়াতে চেয়েছে কোনদিন, সেই জানে।

ঘরের মধ্যে গণেশ পূজোর আয়োজন ঠিক করে রাখা রয়েছে, এখন ভট্‌চাযিয় মশাই এলেই হয়। সুশান্ত এবেলা দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে নেমত্যন্ন করেছে, তাদের মধ্যে দু'জন এসে পড়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে বসে গল্প করছে সুশান্ত। সদর দরজার কাছে পাড়ার ক'জন ছোট ছেলেমেয়ে জটলা করছে। সুমুখের বাড়ীতে রাত্তিরে তরজা হবে, দু'চারজন পাড়ার ছেলে ত্রিপল টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করছে। এমন সময় একি, একি, বলে একটা রব উঠলো।

যাঁরা আগে পূজো-আচ্ছা করতেন, তাঁদের নাম ছিল পুরোহিত। ধর্ম্মাচরণে সাহায্য করতেন বলে তাঁদের স্থান সকলের পুরোভাগে থাকত, তাঁরা ছিলেন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতায় পড়ে ক্রমশঃ ঐ পুরোহিতের দল সত্যি সত্যিই গো-ব্রাহ্মণের পর্য্যায়ে পড়ে গেছেন। এখন আর ওঁদের বেলায় পুরোহিত কথাটার কোন মর্য্যাদা নেই, এখন চন্দ্রবিন্দুব মত সবাব শেষে ওঁদের স্থান। এখন ওঁরা হয়ে পড়েছেন শুধু চাল-কলা বাঁধা ভট্‌চাযিয়।

ছেলেবেলায় একটা ছড়া শুনতুম: "একি দেখি আশ্চযিয়, সিগারেট খাচ্ছে ভট্‌চাযিয়"...এখানে হাস্যরস হ'ল এই কথায় যে ভট্‌চাযিয় সিগারেট খাচ্ছে। অর্থাৎ গরুতে যদি কোনদিন সিগারেট খায় তাতেও তত আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই, কিন্তু ভটচাযিয়কে সিগারেট খেতে দেখলে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বার কথা।

যাই হোক সদর দরজার সুমুখে ঐ একি একি রব শুনে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলো সুশান্তদের বৈঠকখানায়। সুশান্ত ঘর ছেড়ে সদর দরজার দিকে যেতেই দেখে ভট্‌চাযিয় মশাই বাড়ীতে ঢুকছেন।

একি একি ব'লে চীৎকার করে ওঠবারই কথা বটে, স্বর্গে দেবতারাও বোধ হয় একি একি বলে উঠলেন। ভটচার্য্যি মশাই এলেন, গায়ে ছেঁড়া

নামাবলীটা ঠিক আছে বটে, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, তবে পরনে হাফ্-প্যান্ট··· সেই অবস্থাতে খড়ম পরে খট্ খট্ করে হেঁটে এসেছেন সুলতাদের বুড়ো ভটচায্যি মশাই। গৃহিণীর কাপড়ের যা অবস্থা, তাতে আর সেটা পরা যায় না, অতএব ভটচায্যি মশাই তাঁর একটিমাত্র লাল-পেড়ে ধুতি গৃহিণীকে দিয়ে এসেছেন পয়লা বোশেখের দিনে। বড় ছেলে মাথায় ওঁরই মত, সে ফুটবল খেলে, তার হাফ-প্যাণ্টটা রাত্তিরে জলকাচা করে শুকিয়ে নিয়েছেন ভটচায্যি মশাই, এবং সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে নববর্ষকে হাফ্-প্যাণ্ট পরেই অভিনন্দন জানিয়েছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রচুর হাসির মধ্যে এসে সুলতাকে বললেন ভটচায্যি মশাই, ছেলেকে দেখে লজ্জা পেওনা লক্ষ্মী মাগো···জানো তো কাপড়ের অবস্থা···গণেশ ঠাকুরের হাফ্-প্যাণ্ট পরিয়ে পূজো নেবার ইচ্ছে হয়েছে।

আগামী কাল অর্থাৎ দোসরা বোশেখ মনো চলে যাবে শ্বশুর-বাড়ী। ছোট মেয়ের মত দু'দিন আগে থেকেই প্যান প্যান করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে মনো, চোখে মুখে ফোলা ফোলা ভাব। যাবার কথা মনে পড়তেই থেকে থেকে নাকের ডগা লাল হয়ে উঠছে, ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠছে থর থর করে, আর জল ছুটে আসছে দু'চোখ ভ'রে।

কিন্তু আর কি কাঁদবার জো আছে? একি দেখি আশ্চর্য্যি, হাফ্-প্যাণ্ট পরা ভটচায্যি···দেবতাদের জন-সংখ্যা এখনও তেত্রিশ কোটি কিনা বলা শক্ত, তাঁদের বহুদিন আদমসুমারী হয়নি। তবে যত কোটিই হোক তাঁদের সংখ্যা, সব দেবতার এবং পৃথিবীর সব নর-নারী, সব পশু-পাখীর এক সঙ্গে হাহা করে অন্ততঃ একঘণ্টা একটানা হাসবার কথা,—সুলতাদের ভটচায্যি মশাই-এর হাফ্-প্যাণ্ট পরা রূপ দেখে। সুশান্তর মনে হ'ল বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলকাতার সব মর্ম্মরমূর্ত্তিগুলো হাহা করে একসঙ্গে হাসছে উচ্ছ্বসিত অট্টহাসি।

সুলতা ট্রাঙ্ক থেকে সুশান্তর গরদের জোড়টা বার করে এনে ভটচায্যি মশাইকে দিয়ে বললে, এইটে নিন, এইটে পরে রোজ পূজো করবেন এবার থেকে।

তারপর সারাদিন হাহা করে হেসেছে মনো। এতে সকলেই

কাল চলে যাবে ব[illegible] খারাপ করেছিল, কারুর সঙ্গে কইছিল না মনো, [illegible]নাকের ডগা লাল করে কেবলই ছিল শুয়ে শুয়ে। কারুর [illegible]ছিল না ব্যাপারটা, এখন সবাই খুসী, মনে মনে সবাই ধ[illegible] ভটচায্যি মশাইকে।

তবু কালতো চলে যে[illegible] সে কথা কেমন করে ভুলে যাবে মনো? তাই হাসি[illegible]কে মাঝে মাঝে আসছে কান্না, কিন্তু বেলা, সুলতা, সুশান্ত প্রভৃতি কেউ আকাশে মেঘ জমতে দিচ্ছেনা। যে সুমুখে থাকছে, মনো[illegible] হতে দেখলেই বলছে কি সুন্দর [illegible]চ্ছিলো ভটচায্যি মশাই[illegible] মনো? তারপর চোখে জল নিয়েই আবার হা হা হা হা, হা[illegible] কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর, আবার ঝুঁকে পড়েছে কি[illegible] আবার বেঁকে যাচ্ছে শিরদাঁড়াটা।

* * * *

সন্ধ্যেবেলার দিকে সবাই এসে জুটেছে নেমত্যন্ন বাড়ীতে, সভ্যের [illegible]ভ্য সভ্যাগণ...খৃষ্টপূর্ব্ব, শুভ্রা, [illegible], অপরাজিতা, সতীশ, ললিতা [illegible]দবু ডাক্তার প্রভৃতি। সুলতা [illegible] এক এক করে সকলকে সাদরং সম্ভাষণ করে বেড়াচ্ছে। উৎসব[illegible] সমস্ত বাড়ীটা বাশীর মত বেজে উঠেছে আনন্দ-গানে।

সারাদিন রান্না ঘরে বেলা [illegible] নিয়ে খুব ব্যস্ত। আজকেও তার রামনবমীর উপোস। সবাইকে [illegible] খাইয়ে সে সেই রাত্তিরে জল খাবে। প্রতিমা, সুলতা, মনো সবাই অনেকে সাধ্য-সাধনা করেছে তাকে জল খাওয়াবার জন্যে, কিন্তু বেলা কারুর কথা শোনেনি, মুখ শুকিয়ে সারাদিন বসে রান্না করছে, একফোঁটাও জল দেয়নি মুখে। সকলকে, অর্থাৎ সুশান্তকে সুমুখে বসিয়ে পরিতৃপ্ত ক'রে খাইয়ে তবে সে জল খাবে, আজ বোধ হয় [illegible] মেয়েটা এই প্রতিজ্ঞাই করেছে মনে মনে।...

টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। সুলতা এসে বেলাকে বললে, ঠাকুরঝি, তোমায় টেলিফোনে [illegible]ছে।...

টেলিফোন শুনে এসে [illegible] এক দিকে ডেকে চুপি চুপি বেলা

বল্লে, বাবাকে পুনায় এ্যারেষ্ট ক...,—ব'লে আবার রান্নাঘ
ঢুকে গেল কাজ করতে।

কথাটা মৃদুগুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়লো স...র মধ্যে। শঙ্কার কেমন ে
একটা ছায়া পড়েছে সকলের মুখে। সবাই একত্র হয়ে ফিস ফিস ক
কি যেন বলাবলি করছে, শিবানন্দর গ্রেপ্তার হবার সম্বন্ধে। প্র
পনের মিনিট কেটে গেল ঐ রকম আলাপ-আলোচনায়।

তারপর কি একটা কথা জিজ্ঞেস করবে বলে সুলতা গেল রান্নাঘরে
দেখলে রান্নাঘরে বেলা নেই। বেলা...বেলা ঠাকুরঝি? সব ঘরগুলে
দেখে এলো সুলতা, দেখে কোথাও বেলা নেই। সুলতা সুশান্তকে ডেকে
চুপি চুপি খবরটা জানালে—কোথায় গেল বেলা ঠাকুরঝি? বাড়ীতে
তো নেইকো সে?

আর একবার সারা বাড়ীটা খুঁজে দেখলে সুশান্ত...বেলা নেই, বে
কোথায় চলে গেছে। তারপর কি একটা ভেবে নিলে চুপ করে
গেঞ্জী গায়ে ছিল, তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা প'রে নিলে সুশান্ত।

সুলতাকে বল্লে, আমি আসছি এক্ষুনি, বলে তৎক্ষণাৎ ঝড়ের ম
বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

সুশান্তর পেছন পেছন সুলতাও গেল সদরদরজা পর্য্যন্ত...সুশ
চলে গেল, সুলতা দেখতে পেলে, বাইরে ঘরে আসন করে খুষ্ট
একলা বসে আছেন, চোখ বুঁজে সোফাটার ওপর।

তাঁর কপালে সিঁদুরের সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা খুব যেন জ্বল জ্বল করে
উঠলো।...

—শেষ—